কমলাকান্তের দপ্তর।

(বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রথম খণ্ড

কাঁটালপাড়া।
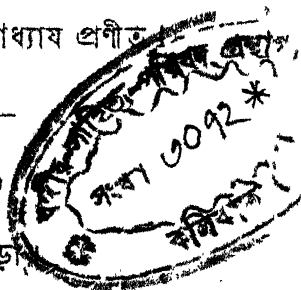
বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৭৫।

উৎসর্গ।

পণ্ডিতাগ্রগণ্য

শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহাশয়কে

এই গ্রন্থ

প্রণয়োপহার স্বরূপ

অর্পিত

হইল।

বিজ্ঞাপন।

কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত করা গেল। বঙ্গদর্শনে যে কয় সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে, তাহার মধ্যে "চন্দ্রালোকে" "মশক" এবং "স্ত্রীলোকের রূপ" এই তিন সংখ্যা আমার প্রণীত নহে; এই জন্য ঐ তিন সংখ্যা পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না।

বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের দপ্তর সমাপ্ত হয় নাই। এই জন্য এই গ্রন্থের নাম করণে "প্রথম খণ্ড" লেখা হইল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দুষ্প্রাপ্য

কমলাকান্তের দপ্তর

—০—০—

অনেকে কমলাকান্তকে পাগল বলিত। সে কখন কি বলিত, কি করিত, তাহার স্থিরতা ছিল না। লেখা পড়া না জানিত, এমত নহে। কিছু ইংরাজি কিছু সংস্কৃত জানিত। কিন্তু যে বিদ্যায় অর্থোপার্জ্জন হইল না, সে বিদ্যা কি বিদ্যা? আসল কথা এই, সাহেব সুবোর কাছে যাওয়া আসা চাই। কত বড় বড় মূর্খ, কেবল নাম দস্তখত করিতে পারে, —তাহারা তালুক মুলুক করিল—আমার মতে তাহারাই পণ্ডিত। আর কমলাকান্তের মত বিদ্বান্, যাহারা কেবল কতকগুলা বহি পড়িয়াছে, তাহারা আমার মতে গণ্ডমূর্খ।

কমলাকান্তের একবার চাকরি হইয়াছিল। একজন সাহেব তাহার ইংরাজি কথা শুনিয়া, ডাকিয়া লইয়া গিয়া একটি কেরাণীগিরি দিয়াছিলেন। কিন্তু কমলাকান্ত চাকরি রাখিতে পারিল না। আপিসে গিয়া, আপিসের কাজ করিত না। সরকারি বহিতে কবিতা লিখিত —আপিসের চিটীপত্রের উপরে সেক্ষপীয়র নামক কে লেখক আছে, তাহার বচন তুলিয়া লিখিয়া রাখিত; বিলবহির পাতায় পাতায় ছবি আঁকিয়া রাখিত। একবার সাহেব তাহাকে মাস্কাবারের পে বিল প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন। কমলাকান্ত বিলবহি লইয়া একটি চিত্র আঁকিল, যে কতকগুলি নাগা ফকির সাহেবের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছে, সাহেব দুই চারিটা পয়সা ছড়াইয়া ফেলিয়া দিতেছেন। নীচে লিখিয়া দিল "যথার্থ পে বিল।" অলঙ্কার স্বরূপ সাহেবের একটি

লাঙ্গুল আঁকিয়া দিয়াছিল—এবং হস্তে একটি মর্ত্তমান রম্ভা দেখা যাইতেছিল। সাহেব নূতন তর পে বিল দেখিয়া কমলাকান্তকে মানে মানে বিদায় দিলেন।

কমলাকান্তের চাকরি সেই পর্য্যন্ত। অর্থেরও বড় প্রয়োজন ছিল না। কমলাকান্ত কখন দারপরিগ্রহ করেন নাই। স্বয়ং যে-খানে হয়, দুইটি অন্ন এবং আধভরি আফিঙ্গ পাইলেই হইত। যেখানে, সেখানে পড়িয়া থাকিত। অনেক দিন আমার বাড়ীতে ছিল। আমি তাহাকে পাগল বলিয়া যত্ন করিতাম। কিন্তু আমিও তাহাকে রাখিতে পারিলাম না। সে কোথাও স্থায়ী হইত না। একদিন প্রাতে উঠিয়া ব্রহ্মচারীর মত গেরুয়া বস্ত্র পরিয়া, কোথায় চলিয়া গেল। কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহাকে পাইলাম না। সে এপর্য্যন্ত আর ফিরে নাই।

তাহার একটি দপ্তর ছিল। কমলাকান্তের কাছে ছেঁড়া কাগজ পড়িতে পাইত না; দেখিলেই তাহাতে কি মাথা মুণ্ড লিখিত কিছু বুঝিতে পারা যাইত না। কখন কখন আমাকে পড়িয়া শুনাইত—শুনিলে আমার নিদ্রা আসিত। কাগজগুলি একখানি মসীচিত্রিত, পুরাতন, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা থাকিত। গমন কালে, কমলাকান্ত আমাকে সেই দপ্তরটি দিয়া গেল। বলিয়া গেল, তোমাকে ইহা বখশিশ করিলাম।

এ অমূল্য রত্ন লইয়া আমি করিব? প্রথমে মনে করিলাম, অগ্নিদেবকে উপহার দিই। পরে লোকহিতৈষা আমার চিত্তে বড় প্রবল হইল। মনে করিলাম, যে যে লোকের উপকার না করে, তাহার বৃথায় জন্ম। এই দপ্তরটিতে অত্যুৎকৃষ্ট অনিদ্রার ঔষধ আছে —যিনি পড়িবেন তাঁহারই নিদ্রা আসিবে।

যাঁহারা অনিদ্রা রোগে পীড়িত তাঁহাদিগের উপকারার্থে আমি কমলাকান্তের রচনাগুলি প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রীভীষ্মদেব খোষ নবীশ

প্রথম সংখ্যা।

একা।

"কে গায় ওই ?"

বহুকাল বিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় ঐ মধুর গীতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন? এই সংগীত যে অতি সুন্দর, এমত নহে। পথিক পথ দিয়া, আপন মনে গায়িতে গায়িতে যাইতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি দেখিয়া, তাহার মনের আনন্দ উছলিয়া উঠিয়াছে। স্বভাবতঃ তাহার কণ্ঠ মধুর;—মধুর কণ্ঠে, এই মধুমাসে, আপনার মনের সুখের মাধুর্য্য বিকীর্ণ করিতে করিতে

যাইতেছে। তবে বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যের তন্ত্রীতে অঙ্গুলি স্পর্শের ন্যায়, ঐ গীতিধ্বনি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিল কেন?

কেন, কে বলিবে? রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—নদী সৈকতে কৌমুদী হাসিতেছে। অর্দ্ধাবৃতা সুন্দরীর নীল বসনের ন্যায় শীর্ণ শরীরা নীল সলিলা তরঙ্গিণী, সৈকত বেষ্টিত করিয়া চলিয়াছেন; রাজপথে, কেবল আনন্দ—বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, বিমল চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়া, আনন্দ করিতেছে। আমিই কেবল নিরানন্দ—তাই ঐ সংগীতে আমার হৃদয় যন্ত্র বাজিয়া উঠিল।

আমি একা—তাই এই সংগীতে আমার শরীর কণ্টকিত হইল। এই বহুজনাকীর্ণ নগরী মধ্যে, এই আনন্দময়, অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে, আমি একা। আমিও কেন ঐ অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে মিশিয়া, এই বিশাল

আনন্দতরঙ্গতাড়িত জলবুদ্বুদ সমূহের মধ্যে আর একটি বুদ্বুদ না হই? বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র; আমি বারি বিন্দু এ সমুদ্রে মিশাই না কেন?

তাহা জানি না—কেবল ইহাই জানি যে আমি একা। কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুষ্য জন্ম বৃথা। পুষ্প সুগন্ধী, কিন্তু যদি ঘ্রাণগ্রহণকর্ত্তা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধী হইত না—ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।

কিন্তু বারেক মাত্র শ্রুত ঐ সংগীত আমার কেন এত মধুর লাগিল তাহা বলি নাই। অনেক দিন আনন্দোত্থিত সংগীত শুনি নাই—অনেক দিন আনন্দানুভব করি নাই।

যৌবনে, যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্রমর্ম্মরে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রা রোহিণীর শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্যমুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ ছিল। পৃথিবী এখনও তাই আছে, সংসার এখনও তাই আছে, মনুষ্য চরিত্র এখনও তাই আছে। কিন্তু এ হৃদয় আর তাই নাই। তখন সংগীত শুনিয়া আনন্দ হইত। আজি এই সংগীত শুনিয়া সেই আনন্দ মনে পড়িল। যে অবস্থায়, যে সুখে, সেই আনন্দ অনুভূত করিতাম, সেই অবস্থা, সেই সুখ, মনে পড়িল। মুহূর্ত্ত জন্য আবার যৌবন ফিরিয়া পাইলাম। আবার তেমনি করিয়া, মনে মনে, সমবেত বন্ধুমণ্ডলী মধ্যে বসিলাম; আবার সেই অকারণসঞ্জাত উচ্চহাসি হাসিলাম, যে কথা নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া এখন বলি না, নিষ্প্রয়োজনেও চি-

ন্তের চাঞ্চল্য হেতু তখন বলিতাম, আবার সেই সকল বলিতে লাগিলাম; আবার অকৃত্রিম হৃদয়ে পরের প্রণয় অকৃত্রিম বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিলাম। ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মিল —তাই এ সংগীত এত মধুর লাগিল। শুধু তাই নয়। তখন সংগীত ভাল লাগিত,— এখন লাগে না—চিত্তের যে প্রফুল্লতার জন্য ভাল লাগিত, সে প্রফুল্লতা নাই বলিয়া ভাল লাগে না। আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গত যৌবনসুখ চিন্তা করিতেছিলাম— সেই সময়ে এই পূর্ব্বস্মৃতিসূচক সংগীত ক প্রবেশ করিল, তাই এত মধুর বোধ হইল

সে প্রফুল্লতা, সে সুখ, আর নাই কেন? সুখের সামগ্রী কি কমিয়াছে? অর্জ্জন এব ক্ষতি, উভয়ই সংসারের নিয়ম। কিন্তু ক্ষতি অপেক্ষা অর্জ্জন অধিক, ইহাও নিয়ম। তবে জীবনের পথ যতই অতিবাহিত করি—

সুখদ সামগ্রী সঞ্চয় করিবে। তবে বয়সে স্ফূর্ত্তি কমে কেন? পৃথিবী আর তেমন সুন্দরী দেখা যায় না কেন? আকাশের তারা আর তেমন জ্বলে না কেন? কোকিলকে স্বর না ভাবিয়া পাখী ভাবি কেন? আকাশের নীলিমায় আর সে উজ্জ্বলতা থাকে না কেন? যাহা তৃণপল্লবময়, কুসুমসুবাসিত, স্বচ্ছ কল্লোলিনী-শীকরসিক্ত, বসন্তপবনবিধূত বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহা বালুকাময়ী মরুভূমি বলিয়া বোধ হয় কেন? কেবল রঙ্গিল কাচ নাই বলিয়া। 'শা সেই রঙ্গিল কাচ। যৌবনে অর্জ্জিত সুখ , কিন্তু সুখের আশা অপরিমিতা। এখন অর্জ্জিত সুখ অধিক কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী আশা কোথায়? তখন জানিতাম না কিসে কি হয়, অনেক আশা করিতাম। এখন জানিয়াছি, এই সংসারচক্রে আরোহণ করিয়া, যেখানকার সেইখানে ফিরিয়া আসিতে হইবে;

যখন মনে ভাবিতেছি এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল আবর্ত্তন করিতেছি মাত্র। এখন বুঝিয়াছি, যে সংসার সমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে আমাকে প্রহত করিয়া আবার আমাকে কূলে ফেলিয়া যাইবে। এখন জানিয়াছি যে, এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্ম্মলা নদীতে আবর্ত্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে; মনুষ্যহৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে। এখন জানিয়াছি যে বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে মৌক্তিক নাই। এখন বুঝিতে পারিয়াছি, যে কাচও হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল,

পিত্তলও সুবর্ণের ন্যায় ভাস্বর, পঙ্কও চন্দনের ন্যায় স্নিগ্ধ, কাংস্যও রজতের ন্যায় মধুরনাদী। —কিন্তু কি বলিতেছিলাম ভুলিয়া গেলাম। সেই গীতধ্বনি! উহা ভাল লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু আর দ্বিতীয়বার শুনিতে চাহি না: উহা যেমন মনুষ্যকণ্ঠজাত সংগীত, তেমনি সংসারের এক সংগীত আছে। সংসাররসে রসিকেরাই তাহা শুনিতে পায়। সেই সংগীত শুনিবার জন্য আমার চিত্ত আকুল! সে সংগীত আর কি শুনিব না? শুনিব, কিন্তু নানা বাদ্যধ্বনিসংম্মিলিত, বহুকণ্ঠপ্রসূত সেই পূর্ব্বশ্রুত সংসারসংগীত আর শুনিব না। সে গায়কেরা আর নাই—সে বয়স নাই, সে আশা নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যাহা শুনিতেছি, তাহা অধিকতর প্রীতিকর। অনন্যসহায় একমাত্র গীতধ্বনিতে কর্ণবিবর পরিপূরিত হইতেছে। প্রীতি সংসারে সর্ব্ব-

্যাপিনী—প্রীতিই ঈশ্বর। প্রীতিই আমার
র্ণে এক্ষণকার সংসারসংগীত। অনন্তকাল
সেই মহাসঙ্গীত সহিত মনুষ্যহৃদয়তন্ত্রী বা-
জিতে থাকুক! মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার
প্রীতি থাকে তবে আমি অন্য সুখ চাই না।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

২য় সংখ্যা।

মনুষ্য ফল।

আফিমের একটু বেশী মাত্রা চড়াইলে, আমার বোধ হয়, মনুষ্য সকল ফল বিশেষ—মায়া বৃন্তে সংসার বৃক্ষে ঝুলিয়া রহিয়াছে, পাকিলেই পড়িয়া যাইবে। সকলগুলি পা-কিতে পায় না—কতক অকালে ঝড়ে পড়িয়া যায়। কোনটি পোকায় খায়, কোনটিকে পাখীতে ঠোক্রায়। কোনটি শুকাইয়া ঝ-

রিয়া পড়ে। কোনটি সুপক্ক হইয়া, আহরিত হইলে, গঙ্গাজলে ধৌত হইয়া দেবসেবায় বা ব্রাহ্মণভোজনে লাগে—তাহাদিগেরই ফলজন্ম বা মনুষ্যজন্ম সার্থক। কোনটি সু-পক্ক হইয়া, বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়িয়া মাটীতে পড়িয়া থাকে, শৃগালে খায়। তাহাদিগের মনুষ্যজন্ম বা ফলজন্ম বৃথা। কতকগুলি তিক্ত, কটু বা কষায়,—কিন্তু তাহাতে অমূল্য ঔষধ প্রস্তুত হয়। কতকগুলি বিষময়—যে খায় সেই মরে। আর কতকগুলি মাকাল জাতীয়—কেবল দেখিতে সুন্দর।

কখন কখন ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিতে পাই, যে পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের মনুষ্য পৃথক্ জাতীয় ফল। আমাদের দেশের এক্ষণ-কার বড়মানুষদিগকে মনুষ্যজাতি মধ্যে কাঁটাল বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি খাসা খাজা কাঁটাল, কতকগুলির বড় আটা, কতকগুলি

কেবল ভুতুড়িসার, গোরুর খাদ্য। কতকগুলি ইচোঁড়ে পাকে, কতকগুলি কেবল ইচোঁড়ই থাকে, কখন পাকে না। কতকগুলি পাকিলে পাকিতে পারে, কিন্তু পাকিতে পায় না, পৃথিবীর রাক্ষস রাক্ষসীরা ইচোঁড়েই পাড়িয়া দাল্না রাঁধিয়া খাইয়া ফেলে।* যদি পাকিল ত বড় শৃগালের দৌরাত্ম্য। যদি গাছ ঘেরা থাকে, ত ভালই। যদি কাঁটাল উচুডালে ফলিয়া থাকে, ভালই; নহিলে শৃগালেরা কাঁটাল কোন মতে উদরসাৎ করিবেন। শৃগালেরা কেহ, দেওয়ান, কেহ কারকুন, কেহ নাএব, কেহ গোমস্তা, কেহ মোছায়েব, কেহ কেবল আশীর্ব্বাদক। যদি এ সকলের হাত এড়াইয়া, পাকা কাঁটাল ঘরে গেল, তবে মাছি ভন্ ভন্ করিতে আরম্ভ করিল।

---

*পাকের রীতি সধবার একাদশীতে সবিস্তারে লিখিত আছে।

মাছিরা কাঁটাল চায় না, তাহারা কেবল একটু একটু রসের প্রত্যাশাপন্ন। এ মাছিটি কন্যাভার গ্রস্ত, উহাকে এক ফোঁটা রস দাও,—ওটির মাতৃদায়, একটু রস দাও। এটি একখানি পুস্তক লিখিয়াছে, একটু রস দাও;—সেটি পেটের দায়ে একখানি সম্বাদপত্র করিয়াছে, উহাকেও একটু দাও। এ মাছিটি কাঁটালের পিসীর ভাশুরপুত্রের শ্যালার শ্যালীপুত্র—খাইতে পায়না, কিছু রস দাও;—সে মাছিটির টোলে পৌনে চৌদ্দটি ছাত্র পড়ে, কিছু রস দাও। আবার এদিকে কাঁটাল ঘরে রাখাও ভাল না—পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া উঠে। আমার বিবেচনায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া, উত্তম নির্জ্জল দুগ্ধের ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া, কমলাকান্তের ন্যায় সুব্রাহ্মণকে ভোজন করানই ভাল।

এ দেশের সিবিল সর্ব্বিসের সাহেবদিগকে

আমি মনুষ্যজাতি মধ্যে আম্রফল মনে করি। এ দেশে আম ছিল না, সাগর পার হইতে কোন মহাত্মা এই উপাদেয় ফল এ দেশে আনিয়াছেন। আম্র দেখিতে রাঙ্গা২, ঝাঁকা আলো করিয়া বসে। কাঁচায় বড় টক— পাকিলে বড় সুমিষ্ট। কে বলিবে যে লরেন্স্, রিকেট্‌স্, ফ্রিয়র, গ্রাণ্ট, ডাম্পিয়র, ফলের-মধ্যে সুমিষ্ট ফল নহে? তবে, কতকগুলা আম এমন কদর্য্য, যে পাকিলেও টক যায় না। কিন্তু দেখিতে বড়২ রাঙ্গা২ হয়, বিক্রেতা ফাঁকি দিয়া পঁচিশ টাকা শ বিক্রয় করিয়া যায়। কতকগুলি আম কাঁচামিটে আছে— ভরসা করি পাকিলেও মিষ্ট থাকিবে। কতকগুলা জাঁতে পাকা। ব্যাপারীর বড় দরকার— অমুক বাড়ীতে পাঁচশত ফজরির প্রয়োজন— গাছ-পাকা আম নাই— কাঁচা ভাঙ্গিয়া জাঁতে পাকা-ইয়া দিল। লোকে "ইণ্ডিয়ান মুসলমান্‌স্"

পড়িয়া—বিষ্ণু,—আমের চাকলা খাইয়া ধন্যং করিতে লাগিল।

আম্র, ব্রাহ্মণভোজনে লাগে বটে, কিন্তু সকল পাতে সমান পড়ে না। অমুক জেলায় ব্রাহ্মণেরা হাত গুটাইয়া বসিয়া আছে,ওদিকে টক আম পড়িয়াছে। যেদিকে ভাল আম পড়িয়াছে—সেদিকে বড় হুস হাস্ শব্দ শুনি-তেছি—কর্ম্মকর্ত্তা ক্ষীরে কুলাইতে পারেন না।

সকলে আম্র খাইতে জানে না। সদ্য গাছ হইতে পাড়িয়া এ ফল খাইতে নাই। ইহা কিয়ৎক্ষণ সেলাম জলে ফেলিয়া ঠাণ্ডা করিও—যদি যোটে তবে সে জলে একটু খোসামোদ বরফ দিও—বড় শীতল হইবে। তার পরে ছুরি চালাইয়া সচ্ছন্দে খাইতে পার।

স্ত্রীলোকদিগকে লৌকিক কথায় কলা গা-ছের সহিত তুলনা করিয়া থাকে। কিন্তু

সে গাছের কথা। কদলী ফলের সঙ্গে ভুবনমোহিনী জাতির আমি সৌসাদৃশ্য দেখি না। স্ত্রীলোক কি কাঁদি কাঁদি ফলে? যাহার ভাগ্যে ফলে ফলুক—কমলাকান্তের ভাগ্যে ত নয়। কদলীর সঙ্গে কামিনীগণের এই পর্য্যন্ত সাদৃশ্য আছে যে, উভয়েই বানরপ্রিয়। কামিনীগণের এ গুণ থাকিলেও কদলীর সঙ্গে তাঁহাদিগের তুলনা করিতে পারি না। পক্ষান্তরে কতকগুলি কটুভাষী আছেন, তাঁহারা ফলের মধ্যে মাকাল ফলকেই যুবতীগণের অনুরূপ বলেন। যে বলে সে দুর্ম্মুখ—আমি ইঁহাদিগর ভৃত্য স্বরূপ; আমি তাহা বলিব না।

আমি বলি, রমণীমণ্ডলী এ সংসারের নারিকেল। নারিকেলও কাঁদি কাঁদি ফলে বটে, কিন্তু (ব্যবসায়ী নহিলে) কেহ কখন কাঁদি কাঁদি পাড়ে না। কেহ কখন দ্বাদশীর

পারণার অনুরোধে, অথবা বৈশাখ মাসে ব্রাহ্মণসেবার জন্য একটি আধটী পাড়ে। কাঁদি কাঁদি পাড়িয়া খাওয়ার অপরাধে যদি কেহ অপরাধী থাকে, তবে সে কুলীন ব্রাহ্মণেরা। কমলাকান্ত কখন সে অপরাধে অপরাধী নহে।

বৃক্ষের নারিকেলের ন্যায় সংসারের নারিকেলের বয়োভেদে নানাবস্থা। করকচি বেলা উভয়েই বড় স্নিগ্ধকর—নারিকেলের জলে উদর স্নিগ্ধ হয়—কিশোরীর অকৃত্রিম বিলাসলক্ষণশূন্য প্রণয়ে হৃদয় স্নিগ্ধ হয়। কিন্তু দুই নারিকেলের ডাবই ভাল। তখন দেখিতে কেমন উজ্জ্বল শ্যাম—কেমন জ্যোতিঃপুঞ্জ, রৌদ্র তাহা হইতে প্রতিহত হইতেছে—যেন সে নবীন শ্যাম শোভায় জগতের রৌদ্র শীতল হইতেছে। গাছের উপর কাঁদি কাঁদি নারিকেল, আর গবাক্ষপথে কাঁদি কাঁদি

যুবতী, আমার চক্ষে একই দেখায়—উভয়ই চতুর্দ্দিক্ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু দেখ—দেখিয়া ভুলিও না—এই চৈত্র মাসের রৌদ্র, গাছ হইতে পাড়িয়া ডাব কাটিও না—বড় তপ্ত। সংসারশিক্ষাশূন্যা কামিনীকে সহসা হৃদয়ে গ্রহণ করিও না—তোমার কলিজা পুড়িয়া যাইবে। আম্রের ন্যায়, ডাবকেও বরফ জলে রাখিয়া শীতল করিও—বরফ না যোটে পুকুরের পাঁকে পুঁতিয়া রাখিয়া ঠাণ্ডা করিও—মিষ্ট কথায় আয়ত্ত না করিতে পার, কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর আজ্ঞা, কড়া কথায় করিও।

নারিকেলের চারিটি সামগ্রী—জল, শস্য, মালা আর ছোবড়া। নারিকেলের জলের সঙ্গে স্ত্রীলোকের স্নেহের আমি সাদৃশ্য দেখি। উভয়ই বড় স্নিগ্ধকর। যখন তুমি সংসারের রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে,

গৃহের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম কামনা কর, তখন এই শীতল জল পান করিও—সকল যন্ত্রণা ভুলিবে। তোমার দারিদ্র চৈত্রে, বা বন্ধুবিয়োগ বৈশাখে—তোমার যৌবন মধ্যাহ্নে বা রোগতপ্ত বৈকালে, আর কিসে তোমার হৃদয় শীতল হইবে? মাতার আদর, স্ত্রীর প্রেম, কন্যার ভক্তি, ইহার অপেক্ষা জীবনের সন্তাপে আর কি সুখের আছে? গ্রীষ্মের তাপে ডাবের জলের মত আর কি আছে?

তবে, ঝুনো হইলে জল একটু ঝাল হইয়া যায়। রামার মা ঝুনো হইলে পর, রামার বাপ ঝালের চোটে বাড়ী ছাড়িয়াছিল। এই জন্য নারিকেলের মধ্যে ডাবেরই আদর।

নারিকেলের শস্য, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি। করকচি বেলায় বড় থাকে না; ডাবের অবস্থায় বড় সুমিষ্ট; বড় কোমল; ঝুনোর বেলায় বড় কঠিন, দন্তস্ফুট করে কার সাধ্য? তখন

ইহাকে গৃহিণীপনা বলে। গৃহিণীপনা রসাল বটে, কিন্তু দাঁত বসে না। একদিকে, কন্যা বসিয়া আছেন, মায়ের অলঙ্কারের বাক্স হইতে কিয়দংশ সংগ্রহ করিবেন,—কিন্তু ঝুনোর শস্য এমনি কঠিন, যে মেয়ের দাঁত বসিল না—ঝুনো, দয়া করিয়া একটি মাকড়ি বাহির করিয়া দিল। হয় ত পুত্র বসিয়া আছেন, মায়ের নগদ পুঁজির উপর দাঁত বসাইবেন,—ঝুনো, দয়া করিয়া নগদ সাতসিকা বাহির করিয়া দিল। স্বামী, প্রাচীন বয়সে একটি ব্যবসা ফাঁদিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু শেষ বয়সে হাত খালি—টাকা নহিলে ব্যবসায় হয় না—ঝুনোর পুঁজির উপর দৃষ্টি। দুইচারিটি প্রবৃত্তিরূপ দন্ত ফুটাইয়া দিলেন—বুড়া বয়সের দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। শেষ যদি দাঁত বসিল, নারিকেল জীর্ণ করিবার সাধ্য কি?

যত দিন না টাকা ফিরাইয়া দেন, ততদিন অজীর্ণ রোগে রাত্রে নিদ্রা হয় না।

তার পরে মালা—এটি স্ত্রীলোকের বিদ্যা—কখন আধখানা বৈ পূরা দেখিতে পাইলাম না। নারিকেলের মালা বড় কাজে লাগে না; স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নয়। মেরি সমরবিল্ বিজ্ঞান লিখিয়াছেন, জেন অষ্টেন উপন্যাস লিখিয়াছেন—মন্দ হয় নাই, কিন্তু দুই মালার মাপে।

ছোবড়া, স্ত্রীলোকের রূপ। ছোবড়া যেমন নারিকেলের বাহ্যিক অংশ, রূপও স্ত্রীলোকের বাহ্যিক অংশ। দুই বড় অসার;—পরিত্যাগ করাই ভাল। তবে ছোবড়ায় একটি কাজ হয়—উত্তম রজ্জু প্রস্তুত হয়, তাহাতে জাহাজ বাঁধা যায়। স্ত্রীলোকের রূপের কাছিতেও অনেক জাহাজ বাঁধা গিয়াছে। তোমরা যেমন নারিকেলের কাছিতে

জগন্নাথের রথ টান, স্ত্রীলোকেরা রূপের কাছিতে কত ভারি ভারি মনোরথ টানে। যখন রথ টানা বারণের আইন হইবে,—তখন তাহাতে এ রথ টানা নিষেধের জন্য যেন একটা ধারা থাকে—তাহা হইলে অনেক নরহত্যা নিবারণ হইবে। আমি জানি না, নারিকেলের রজ্জু গলায় বাঁধিয়া কেহ কখন প্রাণত্যাগ করিয়াছে কি না, কিন্তু রমণীর রূপরজ্জু গলায় বাঁধিয়া কতলোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে?

বৃক্ষের নারিকেল এবং সংসারের নারিকেলের সঙ্গে, আমার বিবাদ এই যে আমি হতভাগা, দুইয়ের একেকেও আহরণ করিতে পারিলাম না। অন্য ফল আকর্ষী দিয়া পাড়া যায় কিন্তু নারিকেল গাছে না উঠিলে পাড়া যায় না। গাছে উঠিতে গেলেও হয় নিজের

পায়ে দড়ি বাঁধিতে হইবে, না হয় ডোমের খোসামোদ করিতে হইবে।*

ডোমের খোসামোদ করিতেও রাজি আছি। কিন্তু আমার ভাগ্যদোষে কপালে নারিকেল যোটে না। আমি যেমন মানুষ, তেমনি গাছে তেমনি রূপগুণের আকর্ষী দিয়া নারিকেল পাড়িতে পারি। পারি, কিন্তু ভয় পাছে নারিকেল ঘাড়ে পড়ে। এমন অনেক শ্যামী, বামী, রামী, কামিনী আছে, যে কমলাকান্তকেও স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু পরের মেয়ে ঘাড়ে করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে, এ দীন অসমর্থ। অতএব এ যাত্রা, কমলাকান্ত ভক্তিভাবে, নারিকেল ফলটি বিশ্বেশ্বরকে দিলেন। তিনি এঁকে শ্মশানবাসী,

---

* কমলাকান্ত বোধ হয় পুরোহিতকে ডোম বলিতেছে, কেননা পুরোহিতেই বিবাহ দেয়। উঃ কি পাষণ্ড!—
ভীষ্মদেব।

তাহাতে আবার বিষপান করিয়াছেন—ছাই ডাব নারিকেলে তাঁহার কি করিবে?

এদেশে একজাতি লোক সম্প্রতি দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের আমি শিমুল ফুল ভাবি। যখন ফুল ফুটে তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা—বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা, গাছ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু আমার চক্ষে নেড়া গাছে অত রাঙ্গা ভাল দেখায় না। একটু একটু পাতা ঢাকা থাকিলে ভাল দেখাইত; পাতার মধ্য হইতে যে অল্প২ রাঙ্গা দেখা যায় সেই সুন্দর। ফুলে গন্ধমাত্র নাই—কোমলতা মাত্র নাই, কিন্তু তবু ফুল বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা। যদি ফুল ঘুচিয়া, ফল ধরিল, তখন মনে করিলাম এইবার কিছু লাভ হইবে। কিন্তু তাহা বড় ঘটে না। কালক্রমে চৈত্র মাস আসিলে রৌদ্রের তাপে, অন্তর্লঘু ফল, ফট করিয়া ফাটিয়া উঠে;

তাহার ভিতর হইতে খানিক তুলা বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় ছড়িয়া পড়ে!

অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ সংসারের ধুতুরা ফল। বড় বড় লম্বা লম্বা সমাসে, বড় বড় বচনে, তাঁহাদিগের অতি সুদীর্ঘ কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হয়, ফলের বেলা কণ্টকময় ধুতুরা। আমি অনেক দিন হইতে মানস করিয়াছি যে কুক্কুট মাংস ভোজন করিয়া হিন্দু জন্ম পবিত্র করিব—কিন্তু এই অধম ধুতুরা গুলার কাঁটার জ্বালায়, পারিলাম না। গুণের মধ্যে এই, যে এই ধুতুরায় মাদকের মাদকতা বৃদ্ধি করে। যে গাঁজাখোরের গাঁজায় নেশা হয় না, তাহার গাঁজার সঙ্গে দুইটা ধুতুরার বীচি সাজিয়া দেয় —যে সিদ্ধিখোরের সিদ্ধিতে নেশা না হয়, তাহার সিদ্ধির সঙ্গে দুইটা ধুতুরার বীচি বাটিয়া দেয়। বোধ হয় এই হিসাবেই, বঙ্গীয় লেখকেরা আপনাপন প্রবন্ধমধ্যে অধ্যাপক

দিগের নিকট দুই চারিটা বচন লইয়া গাঁথিয়া দেন। প্রবন্ধ গাঁজার মধ্যে সেই বচন ধুতূরার বীচিতে পাঠকের নেশা জমাইয়া তুলে। এই নেশায় বঙ্গদেশ আজি কালি মাতিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশের লেখকদিগকে আমি তেঁতুল বলিয়া গণি। নিজের সম্পত্তি খোলা আর সিটে, কিন্তু দুগ্ধকেও স্পর্শ করিলে দধি করিয়া তোলেন। গুণের মধ্যে কেবল অম্ল-গুণ—তাও নিকৃষ্ট অম্ল। তবে এক গুণ মানি—ইঁহারা সাক্ষাৎ কাষ্ঠাবতার। তেঁতুল কাঠ নীরস বটে, কিন্তু সমালোচনার আগুনে পোড়েন ভাল। সত্য কথা বলিতে কি, তেঁতুলের মত কুসামগ্রী আমি সংসারে দেখিতে পাই না। যেই কিয়ৎপরিমাণে খায়, তাহারই অজীর্ণ হয়, সেই অম্ল উদ্গার করে। যেই অধিক পরিমাণে খায়, সেই অম্লপিত্তরোগে

চিররুগ্ন। যাঁহারা সাহেব হইয়াছেন, টেবিলে বসিয়া, গ্যাসের আলোতে, বা আর্গাণ্ড জ্বালিয়া, ফয়জু খানসামার হাতের পাক, কাঁটা চামচে ধরিয়া খাইতে শিখিয়াছেন—তাঁহারা এক দায় এড়াইয়াছেন—তেঁতুলের অম্লের বড় ধার ধারিতে হয় না—আগা গোড়া তেঁতুলের মাছ দিয়া ভাত মারিতে হয় না। কিন্তু যাঁহাদিগকে চালা ঘরে বসিয়া, মুঙ্গেরে পাতর কোলে করিয়া, পদী পিসীর রান্না খাইতে হয়, তাঁহাদের কি যন্ত্রণা! পদী পিসী কুলীনের মেয়ে, প্রাতঃস্নান করে, নামাবলী গায়ে দেয়, হাতে তুলসীর মালা, কিন্তু রাঁধিবার বেলা কলাইয়ের দাল, আর তেঁতুলের মাছ ছাড়া আর কিছুই রাঁধিতে জানেন না। ফয়জু জাতিতে নেড়ে, কিন্তু রাঁধে অমৃত!'

আর একটি মনুষ্যফলের কথা বলা হইলেই আমি ক্ষান্ত হই। দেশী হাকিমেরা

কোন্ ফল বল দেখি? যিনি রাগ করেন ক-
রুন, আমি স্পষ্ট কথা বলিব, ইহারা পৃথিবীর
কুষ্মাণ্ড। যদি চালে তুলিয়া দিলে, তবেই
ইঁহারা উচুতে ফলিলেন—নহিলে মাটীতে
গড়াগড়ি যান। যেখানে ইচ্ছা সেখানে তু-
লিয়া দাও, একটু ঝড় বাতাসেই লতা ছিঁড়িয়া
ভূমে গড়াগড়ি। অনেকগুলি রূপেও কুষ্মাণ্ড,
গুণেও কুষ্মাণ্ড।—তবে কুষ্মাণ্ড এখন দুই
প্রকার হইতেছে—দেশী কুমড়া ও বিলাতি
কুমড়া। বিলাতি কুমড়া বলিলে এমত বু
ঝায় না, যে এই কুমড়াগুলি বিলাত হইতে
আসিয়াছে। যেমন দেশী মুচির তৈয়ারি
জুতাকে ইংরাজি জুতা বলে, ইঁহারাও সেই
রূপ বিলাতি। বিলাতি কুমড়ায় যে গৌরব
অধিক, ইহা বলা বাহুল্য। সংসারোদ্যানে
আরও অনেক ফল ফলে তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা
অকর্ম্মণ্য কদর্য্য—

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

তৃতীয় সংখ্যা।

ইউটিলিটি*

বা

দর্শন স্বয়।

১। হিতবাদ দর্শন।

বেস্থাম এই দর্শনের সৃষ্টি করিয়া ইউ-রোপে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। বলিতে কি, এখনকার ইউরোপের চিন্তাপ্র-

---

* "ইউটিলিটি" শব্দের অর্থ কি? ইহার কি বাঙ্গালা নাই? আমি নিজে ইংরেজি জানি না—কমলাকান্তও কিছু বলিয়া দেয় নাই—অতএব অগত্যা আমার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমার পুত্র, ডেক্সনারী দেখিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে—"ইউ" শব্দে তুমি বা তোমবা; "টিল্" শব্দে চাষ করা, "ইট্" শব্দে খাওয়া, ".ই" অর্থে কি তাহা সে বলিতে পারিল না. কিন্তু বোধ করি কমলাকান্ত, "ইউ-টিল-ইট-ই" পদে ইহাই অভিপ্রেত করিয়াছেন, যে "তোমরা চাষ করিয়াই খাও।" কি পাষণ্ড! সকলকেই চাসা বলিল! ঈদৃশ দুর্বৃত্ত দশানন লম্বোদর গজাননের রচনা পাঠ কবাতেও পাপ আছে। বোধ হয় আমার পুত্রটি ইংরেজি লেখা পড়ায় ভাল হইয়াছে, নচেৎ এরূপ দুরূহ শব্দের সদর্থ করিতে পারিত না।—শ্রীভীষ্মদেব খোষ নবীশ।

গামী, অর্দ্ধেক বেন্থাম অর্দ্ধেক কোমৃতের মতানুসারিণী। চিত্তমধ্যে এই দুই মতের সমুচিত সামঞ্জস্যই আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা।

বেন্থামের পর, ডুমন, মিল, অষ্টিন প্রভৃতি তাঁহার মতের সম্প্রসারণ করিয়াছেন। ঐ মতই এক্ষণে মান্য এবং গ্রাহ্য। যাঁহারা ইহা মানেন না, হিতবাদীরা বলেন, তাঁহারা হিতবাদ দর্শন সম্যক্ বুঝিতে পারেন না।

এই মতের সার কথা এই যে যাহা হিতকর, তাহাই অনুষ্ঠেয় ও কর্ত্তব্য। যাহা অহিতকর, তাহা বর্জ্জনীয় এবং অকর্ত্তব্য। হিতাহিত ফলোৎপাদকতা ভিন্ন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের—অর্থাৎ পুণ্য পাপের—অন্য লক্ষণ নাই।

এই সকল দার্শনিকেরা কখন বঙ্গদেশে আইসেন নাই—আসিলে তাঁহাদের প্রণীত হিতবাদ শাস্ত্র এরূপ অসম্পূর্ণ থাকিত না। বাঙ্গালির মত হিতবাদী পৃথিবীতে আর কোন

জাতি নাই। এ শাস্ত্র বাঙ্গালির নিকট কার্য্যে পরিণত। যাহাতে হিত বা উপকার নাই, এমত কার্য্য আমরা কখন করি না, বা করিতে সম্মত হই না।

ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের সঙ্গে বাঙ্গালি হিতবাদীদিগের বিলক্ষণ ঐক্য আছে—কিন্তু কয়েকটি প্রধান বিষয়ে অনৈক্য আছে। সেই অনৈক্য স্থল সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতেছি।

প্রথম, ইউরোপীয়েরা বাঙ্গালির ন্যায় বলিয়া থাকেন, যাহা হিতকর তাহাই কর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহারা আরও বলেন, যে এই হিত অর্থে জগতের হিত বুঝিতে হইবে। আমরা বলি হিত অর্থে আপনার হিত বুঝিতে হইবে। যাহাতে আপনার হিত হয়, তাহাই পুণ্য, যাঁহাতে নিজের অহিত তাহাই পাপ।

দ্বিতীয়। ইউরোপীয়েরা বলেন, এই "হিত" অর্থে যাহা আশু হিতকর, তাহা বু-

যায় না, যাহা চরমে হিতকর তাহাই বুঝিতে হইবে। শুভাশুভ ফলানুসন্ধানে, অনন্তকাল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পুণ্য পাপ নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। আমরা বলি তাহা নহে; আমি যত দিন বাঁচিব, কেবল ততদিনের মধ্যে যাহা ঘটিতে পারে তাহাই আমার আলোচ্য। আমি মরিয়া গেলে হিতাহিতের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ?

আমাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায়ের লোক আছেন, তাঁহারা বলেন, যে আমি যতদিন বাঁচিব ততদিনের কথাই বা কেন ভাবিব? দেখিতেছি, একটা কর্ম্ম করিলে, অদ্য সুখী হইব, এক বৎসর পরে তন্নিবন্ধন অসুখী হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এক বৎসর আমি বাঁচিব কি না, তাহা কে বলিতে পারে? অদ্যকার সুখ নিশ্চিত, ভাবী দুঃখ অনিশ্চিত। অতএব যাহাতে আশু সুখ তাহাই হিতকর, এবং কর্ত্তব্য।

তৃতীয়, ইউরোপীয়েরা বলেন, যে কোন কার্য্যের জগদ্ব্যাপী এবং অনন্তকাল স্থায়ী ফলাফল সচরাচর লোকে আপন বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারে না; অতএব, কার্য্যের ফলাফল বিজ্ঞেরা যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা গ্রাহ্য। বাঙ্গালি বলেন, বিজ্ঞ, আমি এবং আমার পূর্ব্বপুরুষেরা। আমাদের তুল্য বিজ্ঞ কে? অতএব আমার নিজের মত এবং স্বর্গীয় মহাশয়দিগের মত ভিন্ন আর কোন মত গ্রাহ্য করিব না। কেবল দুইটা বিষয়ে পূর্ব্বপুরুষদিগের মত অগ্রাহ্য—আহারে, এবং পরিচ্ছদে। বুট পেণ্টুলন পরিব, মদ্য মাংস খাইব। আর যদি ইংরাজি না শিখিয়া একটু ইংরাজি ছড়াইতে পারি তাহা ছড়াইব। তদ্ভিন্ন পূর্ব্বপুরুষদিগের মতেই চলিব।

আমি এই হিতবাদ মতে অমত করি না; বরং আমি ইহার অনুমোদক, তবে, আপ-

নারা জানেন কি না বলিতে পারি না, আমি একজন সুযোগ্য দার্শনিক। আমি এই হিত-বাদ দর্শন অবলম্বন করিয়া, কিছু ভাঙ্গিয়া, কিছু গড়িয়া, একটী নূতন দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করি-য়াছি। প্রকৃত পক্ষে, তাহা বাঙ্গালায় প্রচ-লিত হিতবাদ দর্শনের নূতন ব্যাখ্যা মাত্র। তাহার স্থূল মর্ম্ম আমি সংক্ষেপতঃ লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রাচীন প্রথানুসারে দর্শনটী সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছে। এবং আমি স্বয়ংই সূত্রের ভাষ্য করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়াছি। বাঙ্গালাতেই সূত্রগুলি লিখিত হইয়াছে। আমি যে অসংস্কৃতজ্ঞ, এমত কেহ মনে করিবেন না। তবে সংস্কৃতে সূত্রগুলি কয়জন বুঝিতে পারিবে? অতএব, সাধারণ পাঠকের প্রতি অনুকূল হইয়া বাঙ্গা-লাতেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছি। সে সূত্র গ্রন্থের সারাংশ এই;—

২। উদর দর্শন।

১। জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বর বিশেষকে উদর বলে।

ভাষ্য।

"বৃহৎ"—অর্থাৎ নাসিকা কর্ণাদি ক্ষুদ্র গহ্বরকে উদর বলা যায় না। বলিলে, বিশেষ প্রত্যবায় আছে।

"জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বর"—জীবশরীরস্থ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, নহিলে পর্ব্বতগুহা প্রভৃতিকে উদর বলিয়া পরিচয় দিয়া কেহ তাহার পূর্ত্তির প্রত্যাশা করিতে পারেন।

"গহ্বর"—যদিও জীবশরীরস্থ গহ্বর বিশেষই উদর শব্দে বাচ্য, তথাপি, অবস্থা বিশেষে অঞ্জলি প্রভৃতিও উদর মধ্যে গণ্য। কোন স্থানে উদর পুরাইতে হয়. কোন স্থানে অঞ্জলি পুরাইতে হয়।

২। উদরের ত্রিবিধ পূর্ত্তিই পরম পুরুষার্থ।

ভাষ্য।

সাংখ্যেরও এই মত। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, এবং আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ উদর পূর্ত্তি।

"আধিভৌতিক"—অন্ন ব্যঞ্জন সন্দেশ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভৌতিক সামগ্রীর দ্বারা উদরের যে পূর্ত্তি হয়, তাহাই আধিভৌতিক পূর্ত্তি।

"আধ্যাত্মিক"—ঋষি প্রভৃতি অনাহারে বা বায়ু ভক্ষণের দ্বারা যে উদর পূর্ত্তি করেন, তাহাকে আধ্যাত্মিক পূর্ত্তি বলা যায়। অথবা, যাঁহারা দাতার বাক্যে লুব্ধ হইয়া, আশায় বদ্ধ হইয়া কালযাপন করেন, তাঁহাদিগেরও আধ্যাত্মিক উদরপূর্ত্তি হয়।

"আধিদৈবিক"—দৈবানুকম্পায় প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি দ্বারা যাঁহাদের উদর পুরিয়া উঠে, তাঁহাদিগের আধিদৈবিক উদরপূর্ত্তি।

৩। এতন্মধ্যে আধিভৌতিক পূর্ত্তিই বিহিত।

ভাষ্য।

"বিহিত"—বিহিত শব্দের দ্বারা অন্যান্য পূর্ত্তির প্রতিষেধ হইল, কি না ভবিষ্যৎ ভাষ্যকারেরা মীমাংসা করিবেন।

এক্ষণে সিদ্ধ হইল যে, উদরনামক মহা গহ্বরে লুচি সন্দেশ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের প্রবেশই পুরুষার্থ।

অতএব এপর্ব্বের মধ্যে কি প্রকার ভূত প্রবেশ করান যাইতে পারে, তাহা নির্ব্বাচন করা যাইতেছে।

৪। বিদ্যা, বুদ্ধি, পরিশ্রম, উপাসনা, বল, এবং প্রতারণা, এই ষড়্‌বিধ পুরুষার্থের উপায়, পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভাষ্য।

"বিদ্যা।" বিদ্যা কি, তাহা অবধারণ করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন, লিখিতে ও পড়িতে শিখাকে বিদ্যা বলে। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যার জন্য লিখিতে বা পড়িতে শিখার প্রয়োজন নাই, গ্রন্থ লিখিতে সম্বাদ পত্রাদিতে লিখিতে জানিলেই হইল। কেহ কেহ তাহাতে আপত্তি করেন, যে লিখিতে জানে না সে পত্রাদিতে লিখিবে কি প্রকারে? আমার বিবেচনায় এরূপ তর্ক নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কুম্ভীরশাবক ডিম্ব ভেদ করিবামাত্র জলে গিয়া সাঁতার দেয়—অথচ কখন সাঁতার শিখে নাই। সেইরূপ বিদ্যা বাঙ্গালির স্বতঃসিদ্ধ, তজ্জন্য লেখা পড়া শিখিবার প্রয়োজন নাই।

"বুদ্ধি"—যে আশ্চর্য্য শক্তি দ্বারা তুলাকে লৌহ, লৌহকে তুলা বিবেচনা হয় সেই শক্তিকে বুদ্ধি বলে। কৃপণের সঞ্চিত ধনরাশির ন্যায় ইহা আমরা স্বয়ং সর্ব্বদা

দেখিতে পাই, কিন্তু পরের কখন দেখিতে পাই না। পৃথিবীর সকল সামগ্রীর অপেক্ষা বোধ হয় জগতে ইহারই আধিক্য। কেন না কখন কেহ বলিল না যে ইহা আমি অল্প পরিমাণে পাইয়াছি।

"পরিশ্রম"—উপযুক্ত সময়ে ঈষদুষ্ণ অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন, তৎপরে নিদ্রা, বায়ু সেবন, তামাকুর ধূমপান, গৃহিণীর সহিত প্রিয় সম্ভাষণ, ইত্যাদি গুরুতর কার্য্য সম্পাদনের নাম পরিশ্রম।

"উপাসনা।" কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে হয় তাহার গুণানুবাদ নয় দোষকীর্ত্তন করিতে হয়। কোন ক্ষমতাশালী প্রধান ব্যক্তি সম্বন্ধে এরূপ কথা হইলে, যদি তিনি প্রকৃত দোষযুক্ত ব্যক্তি হয়েন, তবে তাঁহার দোষকীর্ত্তন করাকে নিন্দা বলে। আর তিনি যদি দোষী না হয়েন, তবে তাঁহার দোষকীর্ত্তনকে স্পষ্টবক্তৃত্ব অথবা রসিকতা বলে। গুণ পক্ষে, তিনি যদি গুণহীন হয়েন, তবে তাঁহার গুণকীর্ত্তনকে স্বামিনিষ্ঠতা বলে।* আর যদি তিনি যথার্থ গুণবান হয়েন, তবে তাঁহার গুণকীর্ত্তনকে উপাসনা বলে।

"বল"—দীর্ঘচ্ছন্দ বাক্য—মুখ চক্ষুর আরক্তভাব—ঘোরতর ডাক, হাঁক,—মুখ হইতে অনর্গল, হিন্দী, ই-

রেজি এবং নিষ্ঠীবনের বৃষ্টি,—দূর হইতে ভঙ্গী দ্বারা কিল, চড়, ঘুষা, এবং লাথি প্রদর্শন ও সার্দ্ধ তিমায় প্রকার অন্যান্য অঙ্গ ভঙ্গী—এবং বিপক্ষের কোন প্রকার উদ্যম দেখিলে অকালে পলায়ন, ইত্যাদিকে "বল" বলে।

বল ষড়্বিধ,—যথা

মৌখিক—অভিসম্পাত, গালি নিন্দা প্রভৃতি।

হাস্ত—কিল, চড, প্রদর্শন প্রভৃতি।

পাদ,—পলায়নাদি

চাক্ষুষ—রোদনাদি। যথা চানক্যপণ্ডিত,—"বালানাং রোদনং বলং" ইত্যাদি।

ত্বাচ—প্রহার সহিষ্ণুতা ইত্যাদি।

মানস—দ্বেষ, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতি।

"প্রতারণা"—নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের পৃথিবীমধ্যে প্রতারক বলিয়া জানিও,

এক, পণ্যাজীব। প্রমাণ—দোকানদার জিনিস বেচিয়া, আবার মূল্য চাহিয়া থাকে। মূল্যদাতা মাত্রেরই মত যে তিনি ক্রয় কালীন প্রতারিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয়, চিকিৎসক। প্রমাণ—রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইলে পরে যদি চিকিৎসক বেতন চায়, তবে রোগী

প্রায় সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, যে আমি নিজে আরাম হইয়াছি ; এবেটা অনর্থক ফাঁকি দিয়া টাকা লইতেছে।

তৃতীয়, ধর্ম্মোপদেষ্টা এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি। ইহারা চিরপ্রথিত প্রতারক, ইহাদিগের নাম "ভণ্ড।" ইহারা যে প্রতারক তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, ইহারা অর্থাদির কামনা করেন না।

ইত্যাদি।

৫। এই ষড়্‌বিধ উপায়ের দ্বারা উদর-পূর্ত্তি বা পুরুষার্থ অসাধ্য।

ভাষ্য।

এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্ব পণ্ডিতদিগের মত খণ্ডন করা যাইতেছে। বিদ্যাদি ষড়্‌বিধ উপায়ের দ্বারা যে উদরপূর্ত্তি হইতে পারে না, ক্রমে তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

"বিদ্যা"—বিদ্যাতে যদি উদরপূর্ত্তি হইত তবে বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের অন্নাভাব কেন?

"বুদ্ধি"—বুদ্ধিতে যদি উদরপূর্ত্তি হইত, তবে গর্দ্দভ মোট বহিবে কেন?

"পরিশ্রম"—পরিশ্রমে যদি হইত, তবে বাঙ্গালি-বাবুরা কেরাণী কেন?

"উপাসনা"—উপাসনায় যদি হইত তবে সাহেব-গণ কমলাকান্তকে অনুগ্রহ করেন না কেন? আমি ত মন্দ পে বিল লিখি নাই।

"বল"—বলে যদি হইত, তবে আমরা পড়িয়া মার খাই কেন?

"প্রতারণা"—প্রতারণায় যদি হইত, তবে মদের দোকান কখন২ ফেল হয় কেন?

৬। উদরপূর্ত্তি বা পুরুষার্থ কেবল হিত সাধনের দ্বারা সাধ্য।

ভাষ্য।

উদাহরণ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা লোকের কাণে মন্ত্র দিয়া তাহাদের হিতসাধন করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় জাতিগণ অনেক বন্যজাতির হিতসাধন করিয়াছেন, এবং রুসেরা এক্ষণে মধ্য আসিয়ার হিতসাধনে নিযুক্ত আছেন। বিচারকগণ বিচার করিয়া দেশের হিতসাধন করিতেছেন। অনেকে সুবিক্রেয় এবং অবিক্রেয় পুস্তক ও পত্রাদি প্রণয়ন দ্বারা দেশের হিতসাধন করিতেছেন। এ সকলের

প্রচুর পরিমাণে উদরপূর্ত্তি অর্থাৎ পুরুষার্থলাভ হইতেছে।

৭। অতএব সকলে দেশের হিতসাধন কর।

ভাষ্য।

এই শেষ সূত্রের দ্বারা হিতবাদ দর্শন, এবং উদর দর্শনের একতা প্রতিপাদিত হইল। সুতরাং এই স্থলে কমলাকান্ত সূত্র গ্রন্থের সমাপ্তি হইল। ভরসা করি, ইহা ভারতবর্ষের সপ্তম দর্শনশাস্ত্র বলিয়া আদৃত হইবে।

কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

চতুর্থ সংখ্যা।

পতঙ্গ

বাবুর বৈঠকখানায় সেজ্ জ্বলিতেছে—পাশে আমি, মোসায়েবি ধরণে বসিয়া আছি। বাবু দলাদলির গল্প করিতেছেন,—আমি আফিম চড়াইয়া ঝিমাইতেছি। দলাদলিতে চটিয়া, মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিয়াছি। নাচার! বিধিলিপি! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অনাদি ক্রিয়া পরম্পরার একটি ফল এই যে, ঊনবিংশ

শতাব্দীতে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্যরাত্রে নসীরাম বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিবেন। সুতরাং আমার সাধ্য কি যে তাহার অন্যথা করি।

ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিলাম যে একটা পতঙ্গ আসিয়া, ফানুষের চারি পাশে শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। "চোঁও-ও-ও" "বোঁ-ও-ও" করিয়া শব্দ করিতেছে। আফিমের ঝোঁকে মনে করিলাম, পতঙ্গের ভাষা কি বুঝিতে পারি না? কিছুক্ষণ কাণ পাতিয়া শুনিলাম—কিছু বুঝিতে পারিলাম না। মনে মনে পতঙ্গকে বলিলাম, "তুমি কি ও চোঁ বোঁ করিয়া বলিতেছ, আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।" তখন হঠাৎ আফিম প্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ প্রাপ্ত হইলাম—শুনিলাম, পতঙ্গ বলিল, "আমি আলোর সঙ্গে কথা কহিতেছি—তুমি চুপ কর।" আমি তখন

চুপ করিয়া পতঙ্গের কথা শুনিতে লাগিলাম। পতঙ্গ বলিতেছে—

দেখ, আলো মহাশয়, তুমি সেকালে ভাল ছিলে—পিতলের পিলসুজের উপর মেটে প্রদীপে শোভা পাইতে—আমরা স্বচ্ছন্দে পুড়িয়া মরিতাম। এখন আবার সেজের ভিতর ঢুকিয়াছ—আমরা চারিদিকে ঘুরে বেড়াই—প্রবেশ করিবার পথ পাই না, পুড়িয়া মরিতে পাই না।

দেখ, পুড়িয়া মরিতে আমাদের রাইট আছে—আমাদের চিরকালের হক্। আমরা পতঙ্গজাতি, পূর্ব্বাপর আলোতে পুড়িয়া মরিয়া আসিতেছি—কখন কোন আলো আমাদের বারণ করে নাই। তেলের আলো, বাতির আলো, কাঠের আলো, কোন আলো কখন বারণ করে নাই। তুমি কাচ মুড়ি দিয়া আছ

কেন প্রভু? আমরা গরিব পতঙ্গ—আমাদের উপর সহমরণ নিষেধের আইন জারি কেন? আমরা কি হিন্দুর মেয়ে, যে পুড়িয়া মরিতে পাব না?

দেখ, হিন্দুর মেয়ের সঙ্গে আমাদের অ-নেক প্রভেদ। হিন্দুর মেয়ের আশা ভরসা থাকিতে কখন পুড়িয়া মরিতে চাহে না—আগে বিধবা হয়, তবে পুড়িয়া মরিতে বসে। আমরাই কেবল সকল সময়ে আত্মবিসর্জ্জনে ইচ্ছুক। আমাদের সঙ্গে স্ত্রীজাতির তুলনা?

আমাদিগের ন্যায়, স্ত্রীজাতিও রূপের শিখা জ্বলিতে দেখিলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে বটে। ফ-লও এক,—আমরাও পুড়িয়া মরি, তাহারাও পুড়িয়া মরে। কিন্তু, দেখ, সেই দাহতেই তাদের সুখ,—আমাদের কি সুখ? আমরা কেবল পুড়িবার জন্য পুড়ি, মরিবার জন্য

মরি। স্ত্রীজাতিতে পারে? তবে আমাদের সঙ্গে তাহাদের তুলনা কেন?

শুন, যদি জ্বলন্ত রূপে শরীর না ঢালিলাম তবে এ শরীর কেন? অন্য জীবে কি ভাবে, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা পতঙ্গজাতি, আমরা ভাবিয়া পাই না, কেন এ শরীর?—লইয়া কি করিব?—নিত্য নিত্য কুসুমের মধু চুম্বন করি, নিত্য নিত্য বিশ্বপ্রফুল্লকর সূর্য্যকিরণে বিচরণ করি—তাহাতে কি সুখ? ফুলের সেই একই গন্ধ, মধুর সেই একই মিষ্টতা, সূর্য্যের সেই একপ্রকারই প্রতিভা। এমন অসার, পুরাতন, বৈচিত্র্যশূন্য জগতে থাকিতে আছে! কাচের বাহিরে আইস, জ্বলন্ত রূপশিখায় গা ঢালিব।

দেখ, আমার ভিক্ষাটি বড় ছোট—আমার প্রাণ, তোমাকে দিয়া যাইব, লইবে না? দিবে ত গ্রহণ করিব না। তবে ক্ষতি কি? তুমি

রূপ, পোড়াইতে জন্মিয়াছ, আমি পতঙ্গ, পু-ড়িতে জন্মিয়াছি; আইস, যার যে কাজ করিয়া যাই। তুমি হাসিতে থাক, আমি পুড়ি।

তুমি বিশ্বধ্বংসক্ষম—তোমাকে রোধিতে পারে জগতে এমন কিছুই নাই—তুমি কাচের ভিতর লুকাইয়াছ কেন? তুমি জগতের গতির কারণ—কার ভয়ে তুমি ডোমের ভিতর লুকা-ইয়াছ? কোন্ ডোমে এ ডোম গড়িয়াছে? কোন্ ডোমে তোমাকে এ ডোমের ভিতর পুরিয়াছে? তুমি যে বিশ্বব্যাপী, কাচ ভাঙ্গিয়া আমায় দেখা দিতে পার না?

তুমি কি? তা আমি জানি না—আমি জানি না—কেবল জানি যে তুমি আমার বাস-নার বস্তু—আমার জাগ্রতের ধ্যান—নিদ্রার স্বপন—জীবনের আশা—মরণের আশ্রয়। তোমাকে কখন জানিতে পারিব না—জানিতে চাহিও না—যেদিন জানিব, সেইদিন আমার

সুখ যাইবে। কাম্যবস্তুর স্বরূপ জানিলে কাহার সুখ থাকে?

তোমাকে কি পাইব না? কত দিন তুমি কাচের ভিতর থাকিবে? আমি কাচ ভাঙ্গিতে পারিব না? ভাল থাক—আমি ছাড়িব না—আবার আসিতেছি—বোঁ—ও—ও

পতঙ্গ উড়িয়া গেল।

নসীরাম বাবু ডাকিল, "কমলাকান্ত!" আমার চমক হইল—চাহিয়া দেখিলাম—বুঝি বড় ঢুলিয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু চাহিয়া দেখিয়া নসীরামকে চিনিতে পারিলাম না—দেখিলাম, মনে হইল একটা বৃহৎ পতঙ্গ বালিশ ঠেসান দিয়া তামাকু টানিতেছে। সে কথা কহিতে লাগিল—আমার বোধ হইতে লাগিল যে সে চোঁ বোঁ করিয়া কি বলিতেছে। এখন হইতে আমার বোধ হইতে লাগিল, যে

মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে—সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে—সকলেই মনে করে সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে—কেহ মরে, কেহ কাচে বাঁধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞান বহ্নি, ধন বহ্নি, মান বহ্নি, রূপ বহ্নি, ধর্ম্ম বহ্নি, ইন্দ্রিয় বহ্নি, সংসার বহ্নিময়। আবার সংসার কাচময়। যে আলো দেখিয়া মোহিত হই—মোহিত হইয়া যাহাতে ঝাঁপ দিতে যাই—কই তাহাত পাই না—আবার ফিরিয়া বোঁ করিয়া চলিয়া যাই—আবার আসিয়া ফিরিয়া বেড়াই। কাচ না থাকিলে, সংসার এত দিন পুড়িয়া যাইত। যদি সকল ধর্ম্মবিৎ চৈতন্য দেবের ন্যায় ধর্ম্ম মানসপ্রত্যক্ষে দেখিতে পাইত, তবে কয়জন বাঁচিত? অনেকে জ্ঞান বহ্নির আবরণ কাচে ঠেকিয়া রক্ষা পায়, সক্রেতিস, গেলিলিও তাহাতে পুড়িয়া

মরিল। রূপবহ্নি, ধনবহ্নি, মান বহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে,—আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয় তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতকার মান বহ্নি সৃজন করিয়া দুর্য্যোধন পতঙ্গকে পোড়াইলেন;—জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞান বহ্নিজাত দাহের গীত "Paradise Lost"। ধর্ম্মবহ্নির অদ্বিতীয় কবি সেণ্টপল। ভোগবহ্নির পতঙ্গ "আণ্টনি, ক্লিওপেত্রা;" রূপবহ্নির, রোমিও ও জুলিয়েট; ঈর্ষ্যাবহ্নির ওথেলো। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়বহ্নি জ্বলিতেছে। স্নেহ বহ্নিতে সীতাপতঙ্গের দাহ জন্য রামায়ণের সৃষ্টি।

বহ্নি কি আমরা জানি না। রূপ, তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি, এসকল কথার অর্থ নাই। এখানে দর্শন হারি মানে, বিজ্ঞান হারি মানে।

ধর্ম্মপুস্তক হারি মানে, কাব্য গ্রন্থ হারি মানে। ঈশ্বর কি, ধর্ম্ম কি, জ্ঞান কি, স্নেহ কি, তাহা কি? কিছু জানি না। তবু সেই অলৌকিক, অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না ত কি?

দেখ ভাই, পতঙ্গের দল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোন ফল নাই। পার, আগুনে পড়িয়া পুড়িয়া মর। না পার, চল, "বোঁ" করিয়া চলিয়া যাই।

কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

পঞ্চম সংখ্যা।

আমার মন।

আমার মন কোথায় গেল? কে লইল? কই, যেখানে আমার মন ছিল সেখানে ত নাই। যেখানে রাখিয়াছিলাম, সেখানে নাই। কে চুরি করিল? কই, সাত পৃথিবী খুঁজিয়া

ত আমার "মনোচোর" কাহাকে পাইলাম না? তবে কে চুরি করিল?

একজন বন্ধু বলিলেন, দেখ পাকশালা খুঁজিয়া দেখ, সেখানে তোমার মন পড়িয়া থাকিতে পারে। মানি, পাকের ঘরে আমার মন পড়িয়া থাকিত। যেখানে পোলাও, কাবাব, কোফ্তার সুগন্ধ, যেখানে ডেকচী সমারূঢ়া অন্নপূর্ণার মৃদু মৃদু ফুটফুট বুটবুট টকবকো ধ্বনি, সেইখানে আমার মন পড়িয়া থাকিত। যেখানে ইলিস মৎস্য, সঘৃত অভিষেকের পর ঝোলগঙ্গায় স্নান করিয়া, মৃণ্ময়, কাংস্যময়, কাচময়, বা রজতময় সিংহাসনে উপবেশন করেন, সেইখানেই আমার মন প্রণত হইয়া পড়িয়া থাকে, ভক্তিরসে অভিভূত হইয়া, সেই তীর্থস্থান আর ছাড়িতে চায় না। যেখানে ছাগনন্দন, দ্বিতীয় দধীচির ন্যায়, পরোপকারার্থ আপন অস্থি সমর্পণ করেন, যেখানে মাংস

সংযুক্ত সেই অস্থিতে কোরমা রূপ বজ্র নির্ম্মিত হইয়া, ক্ষুধারূপ বৃত্রাসুর বধের জন্য প্রস্তুত থাকে, আমার মন সেইখানেই, ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য বসিয়া থাকে। যেখানে, পাচকরূপী বিষ্ণুকর্ত্তৃক, লুচিরূপ সুদর্শন চক্র পরিত্যক্ত হয়, আমার মন সেই খানেই গিয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়া দাঁড়ায়। অথবা যে আকাশে লুচি চন্দ্রের উদয় হয়, সেই খানেই আমার মন রাহু গিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে চায়। অন্যে যাহাকে বলে বলুক, আমি লুচিকেই অখণ্ড মণ্ডলাকার বলিয়া থাকি। যেখানে সন্দেশ রূপী শালগ্রামের বিরাজ, আমার মন সেই খানেই পূজক। হালদার দিগের বাড়ীর রামমণি দেখিতে অতি কুৎসিতা, এবং তাহার বয়ঃক্রম ষাট্ বৎসর, কিন্তু রাঁধে ভাল, এবং পরিবেশনে মুক্তহস্তা বলিয়া, আমার মন তাহার সঙ্গে প্রসক্তি করিতে চাহিয়াছিল। কে-

বল রামমণির সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হওয়ায় এটি ঘটে নাই।

সুহৃদের প্রবর্ত্তনায়, পাকশালায় মনের সন্ধান করিলাম, সেখানে পাইলাম না। পলান্ন কোফ্‌তা প্রভৃতি অধিষ্টাতৃদেবগণ জিজ্ঞাসায় বলিলেন, তাঁহারা কেহ আমার মন চুরি করেন নাই। দেখিলাম, সূপকার, মাথায় গামছা বাঁধিয়া পাক করিতেছেন—তাঁহাকে যুক্তকরে বলিলাম, "হে প্রভো! এই যে আকা, উনান, বা চুলার শ্রেণী, ইহাই তোমার যমুনা, এতন্মধ্যস্থ তরঙ্গোৎক্ষেপী অগ্নি, সেই যমুনার গদ্গদনাদী বারি রাশি; তুমিই কলিকালে শ্রীনন্দনন্দন; এই হাঁড়ির শোঁশোঁ শব্দ তোমার বংশীরব; আর তোমার যে মাথায় গামছা বাঁধা উহা চূড়ার টালনি; তোমার হাতে যে ভাতের কাটি, ঐ পাচন বাড়ি; তুমি অনেক গোরু রক্ষা কর, অতএব হে রাখালরাজ! ভ-

ক্তকে সদয় হইয়া বল, আমার মন কোথা? তুমি কি চুরি করিয়াছ?” রাখালরাজ বলিলেন, “আমি তোমার মনোহরণ করি নাই, দেখ আমার খিচুড়ির হাঁড়ি আঁকিয়া গিয়াছে।”

বন্ধু বলিলেন, একবার প্রসন্ন গোয়ালিনীর নিকট সন্ধান জান। প্রসন্ন সম্বন্ধে আমার একটু নিন্দা ছিল বটে, কিন্তু সত্য বলিতেছি যে তাহার সঙ্গে আমার কোন দূষ্য প্রণয় ছিল না। তবে প্রসন্ন দেখিতে শুনিতে মোটা-সোটা গোলগাল, বয়সে চল্লিশের নীচে, দাঁতে মিসি, হাসিভরা মুখ, কপালের একটি ছোট উল্‌কী টিপের মত দেখাইত; সে, রসের হাসি পথে ছড়াইতে ছড়াইতে যাইত, আমি তাহা কুড়াইয়া লইতাম, এই জন্য লোকে আমার নিন্দা করিত। পূজারি বামণের জ্বালায় বাগানে ফুল ফুটিতে পায় না—আর নিন্দকের জ্বালায় প্রসন্নের কাছে আমার মুখ ফুটিতে পায় না—

নচেৎ গব্যরসে ও কাব্যরসে বিলক্ষণ বিনিময় চলিত। ইতাতে আমার নিজের জন্য আমি যত দুঃখিত হই না হই, প্রসন্নের জন্য আমি একটু দুঃখিত। কেন না প্রসন্ন সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা। একথাও আমি মুখ ফুটিয়া বলিতে পাই না। বলিয়াছিলাম বলিয়া, পাড়ার এ-কটি ত্রিপণ্ড ছেলে ইহার বিপরীত অর্থ করিয়া-ছিল। সে বলিল, যে প্রসন্ন আছেন, এজন্য সৎ বা সতী বটে; তিনি সাধুঘোষের স্ত্রী, এজন্য সাধ্বী; এবং বিধবাবস্থাতেও পতিছাড়া নহেন, এজন্য ঘোরতর পতিব্রতা। বলা বাহুল্য যে, যে অশিষ্ট বালক এই ঘৃণিত অর্থ মুখে আনিয়াছিল, তাহার শিক্ষার্থ, তাহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে আমার কলঙ্ক গেল না।

যখন লিখিতে বসিয়াছি, তখন স্পষ্ট কথা বলা ভাল—আমি প্রসন্নের একটু অনুরাগী

বটে। তাহার অনেক কারণ আছে—প্রথমতঃ প্রসন্ন যে দুগ্ধ দেয় তাহা নির্জ্জল, এবং দামে সস্তা; দ্বিতীয়, সে কখন কখন ক্ষীর সর, নবনীত আমাকে বিনামূল্যে দিয়া যায়; তৃতীয়, সে একদিন আমাকে কহিয়াছিল, "দাদাঠাকুর, তোমার দপ্তরে ও কিসের কাগজ?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "শুন্‌বি?" সে বলিল "শুনিব।" আমি তাহাকে কয়েকটি প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলাম—সে বসিয়া শুনিল। এত গুণে কোন্ লিপিব্যবসায়ী ব্যক্তি বশীভূত না হয়? প্রসন্নের গুণের কথা আর অধিক কি বলিব—সে আমার অনুরোধে আফিম্ ধরিয়াছিল।

এই সকল গুণে, আমার মন কখন কখন প্রসন্নের ঘরের জানেলার নীচে ঘুরিয়া বেড়াইত, ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কেবল তাহার ঘরের জানেলার নীচে নয়, তাহার

গোহালঘরের আগড়ের পাশেও উঁকি মারিত। প্রসন্নের প্রতি আমার যেরূপ অনুরাগ, তাহার মঙ্গলা নামে গাইয়ের প্রতিও তদ্রূপ। এক জন ক্ষীর সর নবনীতের আকর, দ্বিতীয়, তাহার দানকর্ত্রী। গঙ্গা বিষ্ণুপদ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভগীরথ তাঁহাকে আনিয়াছেন; মঙ্গলা আমার বিষ্ণুপদ; প্রসন্ন আমার ভগীরথ; আমি দুই জনকেই সমান ভালবাসি। প্রসন্ন এবং তাহার গাই, উভয়েই সুন্দরী; উভয়েই স্থূলাঙ্গী, লাবণ্যময়ী, এবং ঘটোধ্নী। একজন গব্যরস সৃজন করেন, আর একজন হাস্যরস সৃজন করেন। আমি উভয়েরই নিকট বিনামূল্যে বিক্রীত!

কিন্তু আজি কালি সন্ধান করিয়া দেখিলাম, প্রসন্নের গবাক্ষতলে, অথবা তাহার গোহালঘরে আমার মন নাই। আমার মন কোথা গেল?

ছিল না—এখনও নাই। কিছুতে আমার মন নাই—আমার মন কোথা গেল?

বুঝিয়াছি। লঘুচেতাদিগের মনের বন্ধন চাই; নহিলে মন উড়িয়া যায়। আমি কখন কিছুতে মন বাঁধি নাই—এজন্য কিছুতেই মন নাই। এ সংসারে আমরা কি করিতে আসি, তাহা ঠিক বলিতে পারি না—কিন্তু বোধ হয় কেবল মন বাঁধা দিতেই আসি। আমি চির-কাল আপনার রহিলাম—পরের হইলাম না, এই জন্যই পৃথিবীতে আমার সুখ নাই। যাহারা স্বভাবতঃ নিতান্ত আত্মপ্রিয়, তাহারাও বিবাহ করিয়া, সংসারী হইয়া, স্ত্রী পুত্রের নিকট আত্মসমর্পণ করে, এজন্য তাহারা সুখী। নচেৎ তাহারা কিছুতেই সুখী হইত না। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি, পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই। ধন, যশঃ,

ইন্দ্রিয়াদিলব্ধ সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে। এসকল প্রথম বারে যে পরিমাণে সুখদায়ক হয়, দ্বিতীয়বারে সে পরিমাণে হয় না, তৃতীয় বারে আরও অল্পসুখদায়ক হয়, ক্রমে অভ্যাসে তাহায় কিছুই সুখ থাকে না। সুখ থাকে না, কিন্তু দুইটি অসুখের কারণ জন্মে; প্রথম, অভ্যস্ত বস্তুর ভাবে সুখ না হউক, অভাবে গুরুতর অসুখ হয়; এবং অপরিতোষণীয়া আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধিতে যন্ত্রণা হয়। অতএব পৃথিবীতে যে সকল বিষয় কাম্য বস্তু বলিয়া চিরপরিচিত, তাহা সকলই অতৃপ্তিকর, এবং দুঃখের মূল। সকল স্থানেই যশের অনুগামিনী নিন্দা, ইন্দ্রিয়সুখের অনুগামী রোগ; ধনের সঙ্গে ক্ষতি ও মনস্তাপ; কান্ত বপু জরাগ্রস্ত বা ব্যাধিদুষ্ট হয়; সুনামেও মিথ্যা কলঙ্ক রটে; ধন, পত্নীজারেও ভোগ করে; মান সম্ভ্রম, মেঘমালার ন্যায় শরতের পর আর

থাকে না। বিদ্যা, তৃপ্তিদায়িনী নহে, কেবল অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে লইয়া যায়; এ সংসারের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা কখন নিবারণ করে না; স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে বিদ্যা কখন সক্ষম হয় না। কখন শুনিয়াছ কেহ বলিয়াছে, আমি ধনোপার্জ্জন করিয়া সুখী হইয়াছি, বা যশস্বী হইয়া সুখী হইয়াছি? যেই এই কয় ছত্র পড়িবে, সেই বেশ করিয়া স্মরণ করিয়া দেখুক, কখন এমন শুনিয়াছে কি না। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কেহ এমত কথা কখন শুনে নাই। ইহার অপেক্ষা ধন মানাদির অকার্য্যকারিতার গুরুতর প্রমাণ আর কি পাওয়া যাইতে পারে? বিস্ময়ের বিষয় এই, যে এমন অকাট্য প্রমাণ থাকিতেও মনুষ্য মাত্রেই তাহার জন্য প্রাণপাত করে। এ কেবল কুশিক্ষার গুণ। মাতৃস্তন্যদুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ধন মানাদির সর্ব্বসারবত্তায় বিশ্বাস শিশুর হৃদয়ে

প্রবেশ করিতে থাকে—শিশু দেখে রাত্রিদিন, পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী গুরু ভৃত্য প্রতিবেশী শত্রুমিত্র সকলেই প্রাণপণে হা অর্থ, হা যশ, হা মান, হা অন্ন, হারূপ করিয়া বেড়াইতেছে। সুতরাং শিশু কথা ফুটিবার আগেই সেই পথে গমন করিতে শিখে। কবে মনুষ্য নিত্য সুখের একমাত্র মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে? যত বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, দার্শনিক, সংসার তত্ত্ববিৎ, যে কেহ আস্ফালন কর, সকলে মিলিয়া দেখ, পরসুখবর্দ্ধন ভিন্ন মনুষ্যের অন্য সুখের মূল আছে কি না? নাই। আমি মরিয়া ছাই হইব, আমার নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবে, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, একদিন মনুষ্যমাত্রে আমার এই কথা, বুঝিবে, যে মনুষ্যের স্থায়ী সুখের অন্য মূল নাই!!! এখন যেমন লোকে, উন্মত্ত হইয়া ধন মান ভোগাদির প্রতি ধাবিত হয়, একদিন মনুষ্যজাতি সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া

পরের সুখের প্রতি ধাবমান হইবে। আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার এ আশা একদিন ফলিবে! ফলিবে, কিন্তু কত দিনে! হায়, কে বলিবে, কত দিনে!

কথাটি প্রাচীন। সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে, শাক্যসিংহ এই কথা কত প্রকারে বলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর, শত সহস্র লোকশিক্ষক শত সহস্রবার এই শিক্ষা শিখাইয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই লোকে শিখে না—কিছুতেই আত্মাদরের ইন্দ্রজাল কাটাইয়া উঠিতে পারে না। আবার আমাদের দেশ ইংরেজি মুলুক হইয়া এবিষয়ে বড় গণ্ডগোল বাঁধিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজি শাসন, ইংরেজি সভ্যতা, ও ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে "মেটিরিয়েল্ প্রস্পেরিটির"* উপর অনুরাগ আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ

---

* বাহ্য সম্পদ।

করিয়াছে। ইংরেজ জাতি বাহ্য সম্পদ বড় ভাল বাসেন—ইংরেজি সভ্যতার এইটি প্রধান চিহ্ন—তাঁহারা আসিয়া এদেশের বাহ্য সম্পদ সাধনেই নিযুক্ত—আমরা তাহাই ভাল বাসিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেব মূর্ত্তি সকল মন্দিরচ্যুত হইয়াছে —সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত কেবল বাহ্য সম্পদের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। দেখ কত বাণিজ্য বাড়িতেছে—দেখ কেমন রেইলও-য়েতে হিন্দুভূমি জালনিবদ্ধ হইয়া উঠিল—দেখিতেছ, টেলিগ্রাফ কেমন বস্তু! দেখিতেছি, কিন্তু কমলাকান্তের জিজ্ঞাসা এই যে, তোমার রেইলওয়ে টেলিগ্রাফে আমার কতটুকু মনের সুখ বাড়িবে? আমার এই হারাণ মন খুঁজিয়া আনিয়া দিতে পারিবে? কাহারও মনের আগুন নিবাইতে পারিবে? ঐ যে কৃপণ ধনতৃষায় মরিতেছে, উহার তৃষা নিবারণ করিবে? অপ-

মানিতের অপমান ফিরাইতে পারিবে? রূপোন্মত্তের ক্রোড়ে রূপসীকে তুলিয়া বসাইতে পারিবে? না পারে, তবে তোমার রেইলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি উপাড়িয়া জলে ফেলিয়া দাও — কমলাকান্ত শর্ম্মা তাতে ক্ষতি বিবেচনা করিবেন না।

কি ইংরেজি কি বাঙ্গালা যে সম্বাদ পত্র, সাময়িক পত্র, স্পীচ, ডিবেট, লেক্চর, যাহা কিছু পড়ি বা শুনি, তাহাতে এই বাহ্য সম্পদ্ ভিন্ন আর কোন বিষয়ের কোন কথা দেখিতে পাই না। হর হর বম্ বম্! বাহ্য সম্পদের পূজা কর। হর হর বম্ বম্! টাকার রাশির উপর টাকা ঢাল! টাকা ভক্তি, টাকা মুক্তি, টাকা নতি, টাকা গতি! টাকা ধর্ম্ম, টাকা অর্থ, টাকা কাম, টাকা মোক্ষ! ও পথে যাইও না, দেশের টাকা কমিবে, ও পথে যাও, দেশের টাকা বাড়িবে! বম বম হর হর! টাকা বাড়াও

টাকা বাড়াও, রেইলওয়ে টেলিগ্রাফ অর্থ-প্রসূতী, ও মন্দিরে প্রণাম কর! যাতে টাকা বাড়ে এমন কর! শূন্য হইতে টাকা বৃষ্টি হইতে থাকুক্! টাকার ঝনঝনিতে ভারতবর্ষ পুরিয়া যাউক্! মন? মন, আবার কি? টাকা ছাড়া মন কি? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই; টাঁকশালে আমাদের মন ভাঙ্গে গড়ে। টাকাই বাহ্য সম্পদ। হর হর বম বম! বাহ্য সম্পদের পূজা কর। এ পূজার তাম্রশ্মশ্রুধারী ইং-রেজ নামে ঋষিগণ পুরোহিত; এডাম স্মিথ পুরাণ এবং মিল তন্ত্র হইতে এ পূজার মন্ত্র পড়িতে হয়; এ উৎসবে ইংরেজি সম্বাদপত্র সকল ঢাক ঢোল, বাঙ্গালা সম্বাদপত্র কাঁশীদার; শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য, এবং হৃদয় ইহাতে ছাগবলি। এ পূজার ফল, ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত নরক। তবে, আইস সবে মিলিয়া বাহ্য সম্প-

দের পূজা করি। আইস, যশোগঙ্গার জলে ধৌত করিয়া, বঞ্চনা বিল্বদলে মিষ্টকথা চন্দন মাখাইয়া, এই মহাদেবের পূজা করি। বল, হর হর বম্ বম্! বাহ্য সম্পদের পূজা করি। বাজা ভাই ঢাক ঢোল;—ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্, ছ্যাড় ছ্যাড়া ছ্যাড় ছ্যাড়! বাজা ভাই কাঁশীদার,—ট্যাং ট্যাং ট্যাং নাট্যাং নাট্যাং! আসুন পুরোহিত মহাশয়! মন্ত্র বলুন! আমাদের এই বহুকালের পুরাতন ঘৃত টুকু লইয়া স্বধা স্বাহা বলিয়া আগুনে ঢালুন্। কোথা ভাই ইউটিলিটেরিয়েন কামার! পাঁটা হাড়িকাটে ফেলিয়াছি; একবার বাবা পঞ্চানন্দের* নাম করিয়া, এক কোপে প্যাচার কর! হর হর বম্ বম্! কমলাকান্ত দাঁড়াইয়া আছে, মুড়িটি দিও! তোমরা স্বচ্ছন্দে পূজা কর!

* পঞ্চানন নাম প্রসিদ্ধ নহে—পঞ্চানন্দই প্রসিদ্ধ। মদ্য, মাংস, গাড়িজুড়ি, পোযাক, এবং বেশ্যা—এই পাঁচটি আনন্দে এই নূতন পঞ্চানন্দ।

পূজা কর, ক্ষতি নাই, কিন্তু আমাকে গোটাকত কথা বুঝাইয়া দাও। তোমার বাহ্য সম্পদে কয় জন অভদ্র ভদ্র হইয়াছে? কয়জন অশিষ্ট শিষ্ট হইয়াছে? কয়জন অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক হইয়াছে? কয়জন অপবিত্র পবিত্র হইয়াছে? একজনও না? যদি না হইয়া থাকে তবে তোমার এ ছাই আমরা চাহি না—আমি হুকুম দিতেছি, এছাই ভারতবর্ষ হইতে উঠাইয়া দাও।

তোমাদের কথা আমি বুঝি। উদর নামে বৃহৎ গহ্বর, ইহা প্রত্যহ বুজান চাই; নহিলে নয়। তোমরা বল যে, এই গর্ত্ত, যাহাতে সকলেরই ভাল করিয়া বুজে আমরা সেই চেষ্টায় আছি। আমি বলি সে মঙ্গলের কথা বটে, কিন্তু উহার অত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই। গর্ত্ত বুজাইতে তোমরা এমনই ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছ, যে আর সকল কথা ভুলিয়া

গেলে। বরং গর্ত্তের এক কোণ খালি থাকে, সেও ভাল, তবু আর আর দিকে একটু মন দেওয়া উচিত। গর্ত্ত বুজান হইতে মনের সুখ একটা স্বতন্ত্র সামগ্রী; তাহার বৃদ্ধির কি কোন উপায় হইতে পারে না? তোমরা এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় বৃদ্ধির জন্য কি একটা কিছু কল হয় না? একটু বুদ্ধি খাটাইয়া দেখ, নহিলে সকল বেকল হইয়া যাইবে।

আমি কেবল চিরকাল গর্ত্ত বুজাইয়া আসিয়াছি—কখন পরের জন্য ভাবি নাই। এই জন্য সকল হারাইয়া বসিয়াছি—সংসারে আমার সুখ নাই; পৃথিবীতে আমার থাকিবার আর প্রয়োজন দেখিনা। পরের বোঝা কেন ঘাড়ে করিব, এই ভাবিয়া সংসারী হইনাই। তাহার ফল এই যে কিছুতেই আমার মন নাই। আমি সুখী নহি। কেন হইবে?

আমি পরের জন্য দায়ী হই নাই, সুখে আমার অধিকার কি?

সুখে আমার অধিকার নাই কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে তোমরা বিবাহ করিয়াছ বলিয়া সুখী হইয়াছ। যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে তোমাদের আত্মপ্রিয়তা লুপ্ত না হইয়া থাকে, যদি বিবাহ নিবন্ধন তোমাদের চিত্ত মার্জ্জিত না হইয়া থাকে, যদি আত্মপরিবারকে ভালবাসিয়া তাবৎ মনুষ্যজাতিকে ভাল বাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ; কেবল ভূতের বোঝা বহিতেছ। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বা পুত্রমুখ নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যদি বিবাহবন্ধে মনুষ্য চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল তবে বিবাহে প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়াদি অভ্যাসের বশ; অভ্যাসে এ সকল একেবারে শান্ত থাকিতে পারে। বরং মনুষ্যজাতি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী

হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে প্রীতি শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে কমলাকান্ত যুক্তকরে সকলের নিকট নিবেদন করিতেছে, তোমরা কেহ কমলাকান্তের একটি বিবাহ দিতে পার?

সপ্তম সংখ্যা।*

বসন্তের কোকিল।

তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণ বাতাস বহে,এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। আর যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাক বাপু? যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে

* ষষ্ঠ সংখ্যা ভিন্ন লেখক প্রণীত—এজন্য পরিত্যক্ত হইল।

কাক চিল ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা মাজা কালো কালো নন্দদুলালি ধরণের শরীরখানি কোথায় থাকে? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত বর্ষার কেহ নও।

রাগ করিও না—তোমার মত আমাদের মাঝখানে অনেকে আছেন। যখন নশী বাবুর তালুকের খাজানা আসে, তখন মানুষ কোকিলে তাঁহার গৃহকুঞ্জ পুরিয়া যায়—কত টিকি, ফোঁটা, তেড়ি, চসমার হাট লাগিয়া যায়,—কত কবিতা, শ্লোক, গীত, হেটো ইংরেজি, মেটো ইংরেজি, চোরা ইংরেজি, ছেঁড়া ইংরেজি, যশুরে ইংরেজিতে নশী বাবুর বৈঠকখানা পারাবতকাকলিসংকুল গৃহসৌধবৎ বিকৃত হইয়া উঠে। যখন তাঁহার বাড়ীতে নাচ, গান, যাত্রা, পর্ব্ব উপস্থিত হয়, তখন দলে দলে মানুষ কোকিল আসিয়া, তাঁহার ঘর বাড়ী আঁধার করিয়া তুলে—কেহ খায়, কেহ

গায়, কেহ হাসে, কেহ কাশে, কেহ তামাক পোড়ায়, কেহ হাসিয়া বেড়ায়, কেহ মাত্রা চড়ায়, কেহ টেবিলের নীচে গড়ায়। যখন নশী বাবু বাগানে যান, তখন মানুষ কোকিল, তাঁহার সঙ্গে পিপীড়ার সারি দেয়। আর যে রাত্রে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতে ছিল, আর নশী বাবুর পুত্রটির অকালে মৃত্যু হইল, তখন তিনি একটি লোক পাইলেন্ না। কাহারও "অসুখ," এজন্য আসিতে পারিলেন না; কাহারও বড় সুখ—একটি নাতি হইয়াছে, এজন্য আসিতে পারিলেন না, কাহারও সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কেহ সমস্ত রাত্রি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, এজন্য আসিতে পারিলেন না। আসল কথা, সেদিন বর্ষা, বসন্ত নহে—বসন্তের কোকিল সেদিন আসিবে কেন?

তা ভাই, বসন্তের কোকিল, তোমার দোষ

নাই, তুমি ডাক। ঐ অশোকের ডালে বসিয়া রাঙ্গা ফুলের রাশির মধ্যে কাল শরীর, জ্বলন্ত আগুনের মধ্যগত কালো বেগুনের মত, লুকাইয়া রাখিয়া, একবার তোমার ঐ পঞ্চম স্বরে, কু—উ বলিয়া ডাক। তোমার ঐ কু—উ রবটি আমি বড় ভালবাসি। তুমি নিজে কালো—পরান্নপ্রতিপালিত, তোমার চক্ষে সকলই "কু"—তবে যত পার, ঐ পঞ্চম স্বরে ডাকিয়া বল "কু—উ!" যখন এ পৃথিবীতলে এমন কিছু সুন্দর সামগ্রী দেখিবে, যে তাহাতে তোমার দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষ্যার উদয় হয়, তখনই সম্বাদপত্রের ন্যায় উচ্চ ডালে বসিয়া ডাকিয়া বলিও, "কু—উ"—কেন না তুমি সৌন্দর্য্যশূন্য, পরান্নপ্রতিপালিত। যখনই দেখিবে, লতা সন্ধ্যার বাতাস পাইয়া, উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত পুষ্প স্তবক লইয়া দুলিয়া উঠিল, অমনি সুগন্ধের তরঙ্গ ছুটিল—তখনই ডাকিয়া বলিও

"কু—উঃ।" যখনই দেখিবে, অসংখ্য গন্ধরাজ এক কালে ফুটিয়া আপনাদিগের গন্ধে আপনারা বিভোর হইয়া, এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে, তখনই তোমার সেই ডাল হইতে ডাকিয়া বলিও, "কু—উঃ।" যখন দেখিবে বকুলের অতি ঘনবিন্যস্ত মধুরশ্যামল স্নিগ্ধোজ্জ্বল পত্ররাশির শোভা আর গাছে ধরে না—পূর্ণযৌবনা সুন্দরীর লাবণ্যের ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, ভাঙ্গিয়া গলিয়া, উছলিয়া উঠিতেছে, তাহার অসংখ্য প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধে আকাশ মাতিয়া উঠিতেছে—তখন তাহারই আশ্রয়ে বসিয়া সেই পাতার স্পর্শে অঙ্গ শীতল করিয়া, সেই গন্ধে দেহ পবিত্র করিয়া, সেই বকুলকুঞ্জ হইতে ডাকিও, এ "কু—উঃ।" যখন দেখিবে শুভ্রমুখী, শুদ্ধশরীরা, সুন্দরী নবমল্লিকা সন্ধ্যা শিশিরে সিক্ত হইয়া, আলোক প্রাখর্য্যের হ্রাস

দেখিয়া, ধীরে ধীরে মুখখানি খুলিতে সাহস করিতেছে—স্তরে স্তরে অসংখ্য অকলঙ্ক দল-রাজি বিকসিত করিবার উপক্রম করিতেছে —যখন দেখিবে যে ভ্রমর সেরূপ দেখিয়া—"আদরেতে আগুসারি"—কণ্ঠভরা গুণগুণ মধু ঢালিয়া দিতেছে—তখন, হে কালামুখ! আবার "কু-উঃ" বলিয়া ডাকিয়া মনের জ্বালা নিবাইও। আর যখনই গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণস্থ দাড়িম্বশাখায় বসিয়া, দেখিবে সেই গৃহপুষ্প-রূপিণী কন্যাগণে, সেই লতার দোলনি, সেই গন্ধরাজের প্রস্ফুটতা, সেই বকুলের রূপোচ্ছ্বাস সেই মল্লিকার অমলতা, একাধারে মিলিত করিয়াছে, তখনই তাহাদের মুখের উপর, ঐ পঞ্চমস্বরে, গৃহপ্রাচীর প্রতিধ্বনিত করিয়া, সবাইকে ডাকিয়া বলিও, এত রূপ, এত সুখ, এত পবিত্রতা—এ "কু-উঃ!" ঐটি তোমার জিত—ঐ পঞ্চমস্বর! নহিলে তোমার ও কুউ

কেহ শুনিত না। এ পৃথিবীতে গ্লাডষ্টোন ডিস্রেলি প্রভৃতির ন্যায়,—তুমি কেবল গলাবাজিতে জিতিয়া গেলে—নহিলে অত কালো চলিত না; তোমার চেয়ে হাঁড়িচাঁচা ভাল। গলাবাজির এত গুণ না থাকিলে, যিনি "Juventus Mundi" লিখিয়াছেন তিনি রাজমন্ত্রী হইবেন কেন? আর জন ষ্টুয়ার্ট মিল পার্লিমেণ্টে স্থান পাইলেন না কেন?

তবে, কোকিল, তুমি প্রকৃতির মহা পার্লিমেণ্টে দাঁড়াইয়া,নক্ষত্রময় নীলচন্দ্রাতপমণ্ডিত, গিরিনদী নগর, কুঞ্জাদি বেঞ্চে সুসজ্জিত, ঐ মহাসভা গৃহে, তোমার এ মধুর পঞ্চমস্বরে—কু-উঃ বলিয়া ডাক—সিংহাসন হইতে হষ্টিংস্ পর্য্যন্ত সকলেই কাঁপিয়া উঠুক। "কু—উঃ!" ভাল, ভাই; ও কলকণ্ঠে কু বলিলে কু মানিব, সু বলিলে সু মানিব। কু বৈকি? সব কু। লতায় কণ্টক আছে, কুসুমে কীট আছে, গন্ধে

বিষ আছে; পত্র শুষ্ক হয়, রূপ বিকৃত হয়, স্ত্রীজাতি বঞ্চনা জানে। কু-উঃ বটে—তুমি গাও। কিন্তু তুমি ঐ পঞ্চমস্বরে কু বলিলেই কু মানিব—নচেৎ কুঁকড়ো বাবাজি "কু ক্কু কু কু" বলিয়া আমার সুখের প্রভাত নিদ্রাকে কু বলিলে আমি মানিব না। তার গলা নাই। গলাবাজিতে সংসার শাসিত হয় বটে, কিন্তু কেবল চেঁচাইলে হয় না; যদি শব্দ মন্ত্রে সংসার জয় করিবে, তবে যেন তোমার স্বরে পঞ্চম লাগে—বে পরদা বা কড়িমধ্যমের কাজ নয়। সর্ জেমস্ ম্যাকিণ্টশ, তাঁহার বক্তৃতায় ফিলজফির* কড়িমধ্যম মিশাইয়া হারিয়া গেলেন—আর মেকলে রেটরিকেরা পঞ্চম লাগাইয়া জিতিয়া গেলেন। ভারতচন্দ্র আদিরস পঞ্চমে ধরিয়া জিতিয়া গিয়াছেন—কবিকঙ্কণের ষড়্জধ্বনি কে শুনে? দেখ লো-

* দর্শন। † অলঙ্কার।

কের বৃদ্ধ পিতা মাতার বেস্থরো বকাবকিতে কোন ফল দর্শে? আর যখন বাবুর গৃহিণী বাবুর স্থর বাঁধিয়া দিবার জন্য বাবুর কাণ টিপিয়া ধরিয়া পঞ্চমে গলার আওয়াজ দেন, তখন বাবু পিড়িং পিড়িং বলেন, কি না?

তবে তোমার স্বরকে পঞ্চমস্বর কেন বলে তাহা বুঝি না। যাহা মিষ্ট, তাহাই পঞ্চম? তুইটি পঞ্চম মিষ্ট বটে,—স্থরের পঞ্চম, আর আল্‌তা পরা ছোট পায়ের গুজ্‌রী পঞ্চম। তবে, স্থর, পঞ্চমে উঠিলেই মিষ্ট; পায়ের পঞ্চম, পা হইতে নামাইলেই মিষ্ট। তবে যদি কেহ কন্যে বউয়ের লাতি খাইয়া থাকেন, তিনি বলিলে বলিতে পারেন, পায়ের পঞ্চম ভর্ত্তার মাথা পর্য্যন্ত উঠিলেও মিষ্ট।

কোন্‌ স্বর পঞ্চম, কোন্‌ স্বর সপ্তম, কে মধ্যম, কে গান্ধার, আমাকে কে বুঝাইয়া দিবে? এটি হাতীর ডাক, ওটি ঘোড়ার ডাক,

সেটি ময়ূরের কেকা, ওটি বানরের কিচিমিচি, এ বলিলে ত কিছু বুঝিতে পারি না। আমি আফিংখোর—বেসুরো শুনি, বেসুরো বুঝি, বেসুরো লিখি—ধৈবত গান্ধার নিষাদ পঞ্চমের কি ধার ধারি? যদি কেহ পাখোয়াজ তানপুরা দাড়ী দাঁত লইয়া, আমাকে সপ্ত স্বর বুঝাইতে আসে, তবে তাহার গর্জ্জন শুনিয়া মঙ্গলা গাইয়ের সদ্যপ্রসূত বৎসের ধ্বনি আমার মনে পড়ে—তাহার পীতাবশিষ্ট নির্জ্জল দুগ্ধের অনুধ্যানে মন ব্যস্ত হয়—সুর বুঝা হয় না। আমি গায়কের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, যেন তিনি জন্মান্তরে মঙ্গলার বৎস হন।

এখন আয় পাখি! তোতে আমাতে একবার পঞ্চম গাই। তুইও যে আমিও সে—সমান দুঃখের দুঃখী, সমান সুখের সুখী। তুই এই পুষ্পকাননে, বৃক্ষে বৃক্ষে আপনার

আনন্দে গাইয়া বেড়াস্—আমিও এই সংসার কাননে, গৃহে গৃহে, আপনার আনন্দে এই দপ্তর লিখিয়া বেড়াই—আয় ভাই, তোতে আমাতে মিলে মিশে পঞ্চম গাই। তোরও কেহ নাই—আনন্দ আছে, আমারও কেহ নাই—আনন্দ আছে, তোর পুঁজিপাটা, ঐ গলা; আমার পুঁজিপাটা, এই আফিঙ্গের ডেলা; তুই এ সংসারে পঞ্চমস্বর ভালবাসিস্—আমিও তাই; তুই পঞ্চমস্বরে কারে ডাকিস্? আমিই বা কারে? বল্ দেখি পাখি কারে?

যে সুন্দর, তাকেই ডাকি; যে ভাল, তাকেই ডাকি; যে আমার ডাক শুনে, তাকেই ডাকি। এই যে আশ্চর্য্য ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া আছি, ইহাকেই ডাকি। যদি এই অনন্ত সুন্দর জগৎ শরীরে কেহ আত্মা থাকেন, তবে তাঁহাকে ডাকি। আমিও ডাকি, তুইও ডাকিস।

জানিয়া ডাকি না জানিয়া ডাকি, সমান কথা; তুইও কিছু জানিস্ না, আমিও জানি না; তোরও ডাক পৌঁছিবে, আমারও ডাক পৌঁছিবে। যদি সর্ব্বশব্দগ্রাহী কোন কর্ণ থাকে, তবে তোর আমার ডাক পৌঁছিবে না কেন? আয় ভাই, একবার মিলে মিশে দুইজনে পঞ্চম স্বরে ডাকি।

তবে, কুহুরবে সাধা গলায়, কোকিল এক বার ডাক্ দেখিরে! কণ্ঠ নাই বলিয়া, আমার মনের কথা কখন বলিতে পাইলাম না। যদি তোর ও ভুবন ভুলান স্বর পাইতাম, ত বলিতাম। তুই আমার সেই মনের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া এই পুষ্পময় কুঞ্জবনে একবার ডাক্ দেখিরে! কি কথাটী বলিব বলিব মনে করি, বলিতে জানি না, সেই কথাটি তুই বল্ দেখিরে! কমলাকান্তের মনের কথা, এজন্মে বলা হইল না—যদি কোকিলের কণ্ঠ পাই—

অমানুষী ভাষা পাই, আর নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা বলি। ঐ নীলাম্বর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ঐ নক্ষত্রমণ্ডলীমধ্যে উ-ড়িয়া, কখন কি কুহু বলিয়া ডাকিতে পাইব না? আমি না পাই, তুই কোকিল, আমার হয়ে একবার ডাক্ দেখিরে।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

নবম সংখ্যা।

বিবাহ।

বৈশাখ মাস বিবাহের মাস। আমি ১লা বৈশাখে নসী বাবুর ফুলবাগানে বসিয়া একটি বিবাহ দেখিলাম। ভবিষ্যৎ বরকন্যাদিগের শিক্ষার্থ লিখিয়া রাখিতেছি।

মল্লিকার বিবাহ। বৈকাল শৈশব অব-সান প্রায়, কলিকা কন্যা বিবাহ যোগ্যা হইয়া

আসিল। কন্যার পিতা বড় লোক নহে, ক্ষুদ্র বৃক্ষ, তাহাতে আবার অনেকগুলি কন্যাভার গ্রস্ত। সম্বন্ধের অনেক কথা হইতেছিল, কিন্তু কোনটা স্থির হয় নাই। উদ্যানের রাজা স্থলপদ্ম নির্দ্দোষ পাত্র বটে, কিন্তু ঘর বড় উচু, স্থলপদ্ম অতদূর নামিল না। জবা, এ বিবাহে অসম্মত ছিল না, কিন্তু জবা বড় রাগী, কন্যা-কর্ত্তা পিছাইলেন। গন্ধরাজ পাত্র ভাল, কিন্তু বড় দেমাগ, প্রায় তাঁহার বার পাওয়া যায় না। এইরূপ অব্যবস্থার সময়ে ভ্রমররাজ ঘটক হ-ইয়া মল্লিকাবৃক্ষসদনে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন,

"গুণ! গুণ! গুণ! মেয়ে আছে ?"

মল্লিকা বৃক্ষ পাতা নাড়িয়া সায় দিলেন "আছে!" ভ্রমর পত্রাসন গ্রহণ করিয়া বলি-লেন, "গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণা গুণ্ মেয়ে দে-খিব।"

বৃক্ষ, শাখা নত করিয়া, মুদিত নয়না অবগুণ্ঠনবতী কন্যা দেখাইলেন।

ভ্রমর, একবার বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া বলিলেন, "গুণ! গুণ! গুণ! গুণ দেখিতে চাই। ঘোমটা খোল।"

লজ্জাশীলা কন্যা কিছুতেই ঘোমটা খুলে না। বৃক্ষ বলিলেন, "আমার মেয়েগুলি বড় লাজুক। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি মুখ দেখাইতেছি।"

ভ্রমর ভোঁ করিয়া স্থলপদ্মের বৈঠকখানায় গিয়া রাজপুত্রের সঙ্গে ইয়ারকি করিতে বসিলেন। এদিকে মল্লিকার সন্ধ্যা ঠাকুরাণী দিদি আসিয়া তাহাকে কত বুঝাইতে লাগিল—বলিল, "দিদি, একবার ঘোমটা খোল—নইলে, বর আসিবে না—লক্ষ্মী আমার, চাঁদ আমার, সোণা আমার" ইত্যাদি। কলিকা কতবার ঘাড় নাড়িল, কতবার রাগ করিয়া মুখ

ঘুরাইল কতবার বলিল, "ঠান্‌দিদি, তুই যা!" কিন্তু শেষে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া মুখ খুলিল, তখন ঘটক মহাশয় ভোঁ করিয়া রাজবাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া ঘটকালীতে মন দিলেন। কন্যার পরিমলে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "গুণগুণগুণ গুণ্ গুণাগুণ্! কন্যা গুণবতী বটে। ঘরে মধু কত?"

কন্যাকর্ত্তা বৃক্ষ বলিলেন, "ফর্দ্দ দিবেন, কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিব।" ভ্রমর বলিলেন "গুণ্ গুণ্, আপনার অনেক গুণ্—ঘটকালীটা?"

কন্যাকর্ত্তা শাখা নাড়িয়া সায় দিল। "তাও হবে।"

ভ্রমর—"বলি ঘটকালীর কিছু আগাম দিলে হয় না? নগদ দান বড় গুণ—গুণ গুণ গুণ।"

ক্ষুদ্র বৃক্ষটি তখন বিরক্ত হইয়া, সকল

শাখা নাড়িয়া বলিল, "আগে বরের কথা বল —বর কে?"

ভ্রমর—"বর অতি সুপাত্র।—তাঁর অনেক গুণ্-ন্-ন্।"

"কে তিনি?"

"গোলাবলাল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর অ-নেক—গুণ ন্—ন্।"

এ সকল কথোপকথন মনুষ্যে শুনিতে পায় না, আমি কেবল আফিম প্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ পাইয়াই, এসকল শুনিতেছিলাম। আমি শুনিতে লাগিলাম, কুলাচার্য্য মহাশয়, পাখা ঝাড়িয়া, ছয় পা ছড়াইয়া গোলাবের মহিমাকীর্ত্তন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন, যে গোলাব বংশ বড় কুলীন; কেন না ইহারা "ফুলে" মেল। যদি বল সকল ফুলই ফুলে, তথাপি গোলাবের গৌরব অধিক, কেন না ইহারা সাক্ষাৎ বাগমালীর সন্তান; তাহার বহস্তরো-

পিত। যদি বল এ কুলে কাঁটা আছে, কোন্ কুলে বা কোন্ ফুলে নাই ?

যাহা হউক ঘটকরাজ কোনরূপে সম্বন্ধ স্থির করিয়া বোঁ করিয়া উড়িয়া গিয়া, গোলাব বাবুর বাড়ীতে খবর দিলেন। গোলাব, তখন বাতাসের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া, হাসিয়া নাসিয়া, লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা করিতেছিল, বিবাহের নাম শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া কন্যার বয়স্ জিজ্ঞাসা করিল; ভ্রমর বলিল, "আজি কালি ফুটিবে।"

গোধুলি লগ্ন উপস্থিত, গোলাব বিবাহে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। উচ্চিঙ্গড়া নহবৎ বাজাইতে আরম্ভ করিল; মৌমাছি সানাইয়ের বায়না লইয়াছিল, কিন্তু রাতকানা বলিয়া সঙ্গে যাইতে পারিল না। খদ্যোতেরা ঝাড় ধরিল; আকাশে তারাবাজি হইতে লাগিল; কোকিল আগে আগে ফুকরাইতে লা-

গিল। অনেক বরযাত্র চলিল, স্বয়ং রাজকুমার স্থলপদ্ম দিবাবসানে অস্বস্থকর বলিয়া আসিতে পারিলেন না, কিন্তু জবা গোষ্ঠী—শ্বেতজবা, রক্ত জবা, জরদ জবা প্রভৃতি, সবংশে আসিয়াছিল। করবীরের দল, সেকেলে রাজাদিগের মত বড় উচ্চ ডালে চড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সেঁউতি নীতবর হইবে বলিয়া, সাজিয়া আসিয়া ঢুলিতে লাগিল। গরদের জোড় পরিয়া চাঁপা আসিয়া দাঁড়াইল—বেটা ব্রাণ্ডি টানিয়া আসিয়াছিল, উগ্র গন্ধ ছুটিতে লাগিল। গন্ধরাজেরা বড় বাহার দিয়া, দলে দলে আসিয়া, গন্ধ বিলাইয়া দেশ মাতাইতে লাগিল। অশোক, নেশায় লাল হইয়া আসিয়া উপস্থিত; সঙ্গে একপাল পিপ্ড়া মোসায়েব হইয়া আসিয়াছে; তাহাদের গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কিন্তু দাঁতের জ্বালা বড়—কোন্ বিবাহে না এরূপ বরযাত্র জোটে, হার

কোন্ বিবাহে না তাহারা হুল ফুটাইয়া বিবাদ বাঁধায় ? কুরবক, কুটজ প্রভৃতি আরও অনেক বরযাত্র আসিয়াছিলেন, ঘটক মহাশয়ের কাছে তাঁহাদের পরিচয় শুনিবেন। সর্ব্বত্রই তিনি যাতায়াত করেন এবং কিছু কিছু মধু পাইয়া থাকেন।

আমারও নিমন্ত্রণ ছিল, আমিও গেলাম। দেখি বরপক্ষের বড় বিপদ্। বাতাস্, বাহকের বায়না লইয়া ছিলেন; তখন হুঁ—হুম করিয়া অনেক মরদানি করিয়াছিলেন, কিন্তু কাজের সময়ে কোথায় লুকাইলেন, কেহ খুঁজিয়া পায় না। দেখিলাম বর, বরযাত্র সকলে অবাক্ হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। মল্লিকাদিগের কুল যায় দেখিয়া, আমিই বাহকের কার্য্য স্বীকার করিলাম। বর, বরযাত্র সকলকে তুলিয়া লইয়া মল্লিকাপুরে গেলাম।

সেখানে দেখিলাম, কন্যাকুল, সকল ভগিনী, আহ্লাদে ঘোমটা খুলিয়া, মুখ ফুটাইয়া, পরিমল ছুটাইয়া, সুখের হাসি হাসিতেছে। দেখিলাম, পাতায় পাতায় জড়াজড়ি, গন্ধের ভাণ্ডারে ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে—রূপের ভরে সকলে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। যূথি, মালতী, বকুল, রজনীগন্ধ প্রভৃতি এয়োগণ স্ত্রী আচার করিয়া বরণ করিল। দেখিলাম পুরোহিত উপস্থিত; নশীবাবুর নবমবর্ষীয়া কন্যা (জীয়ন্ত কুসুম রূপিণী) কুসুম লতা সূচ সূতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; কন্যাকর্ত্তা কন্যা সম্প্রদান করিলেন; পুরোহিত মহাশয় দুইজনকে এক সূতায় গাঁথিয়া গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিলেন।

তখন বরকে বাসরঘরে লইয়া গেল। কত যে রসময়ী মধুময়ী সুন্দরী সেখানে বরকে ঘেরিয়া বসিল তাহা কি বলিব। প্রাচীনা ঠাকুরাণীদিদি টগর সাদা প্রাণে বাঁধা রসিকতা

করিতে করিতে শুকাইয়া উঠিলেন। রঙ্গণের, রাঙ্গা মুখে হাসি ধরে না। যূই, কন্যের সই, কন্যের কাছে গিয়া শুইল; রজনীগন্ধকে বর ভাড়কা রাক্ষসী বলিয়া কত তামাসা করিল; বকুল, একে বালিকা, তাতে যত গুণ, তত রূপ নহে; এক কোণে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; আর ঝুম্‌কা ফুল বড় মানুষের গৃহিণীর মত মোটা মাগী নীল শাড়ী ছড়াইয়া জমকাইয়া বসিল তখন—

"কমল কাকা—ওঠ বাড়ী যাই—রাত হয়েছে, ওকি ঢুলে পড়্‌বে যে?"

কুসুমলতা এই কথা বলিয়া আমার গা ঠেলিতেছিল;—চমক হইলে, দেখিলাম কিছুই নাই। সেই পুষ্পবাসর কোথায় মিশিল?—মনে করিলাম, সংসার অনিত্যই বটে—এই আছে এই নাই। সে রম্য বাসর কোথায় গেল?—সেই হাস্যমুখী শুভ্র স্মিত সুধাময়ী

পুষ্পসুন্দরী সকল কোথায় গেল? যেখানে সব যাইবে সেইখানে—স্মৃতির দর্পণতলে, ভূত সাগরগর্ভে। যেখানে রাজা প্রজা, পর্ব্বত সমুদ্র গ্রহ নক্ষত্রাদি গিয়াছে বা যাইবে সেইখানে—ধ্বংসপুরে। এই বিবাহের ন্যায় সব শূন্যে মিশাইবে, সব বাতাসে গলিয়া যাইবে—কেবল থাকিবে—কি? ভোগ? না, ভোগ্য না থাকিলে ভোগ থাকিতে পারে না। তবে কি? স্মৃতি?

কুসুম বলিল, "ওঠ না—কি কচ্চো?"

আমি বলিলাম, "দূর পাগলি, আমি বিয়ে দিচ্ছিলাম।"

কুসুম ঘেসে এসে, হেসে হেসে কাছে দাঁড়াইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কার বিয়ে, কাকা?"

আমি বলিলাম, "ফুলের বিয়ে।"

"ওঃ পোড়া কপাল, ফুলের? আমি বলি

কি! আমিও যে এই ফুলের বিয়ে দিয়েছি।”

“কই?”

“এই যে মালা গাঁথিয়াছি।” দেখিলাম, সেই মালায় আমার বর কন্যা রহিয়াছে।

দশম সংখ্যা।

বড় বাজার।

প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে আমার চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখিতেছি। আমি নশীরাম বাবুর গৃহে আসিয়া অবধি, তাহার নিকট ক্ষীর, সর, দধি দুগ্ধ, এবং নবনীত খাইতেছি। আহারকালে মনে করিতাম, প্রসন্ন কেবল পরলোকে সদ্গতির কামনায় অনন্ত পুণ্যসঞ্চয় করিতেছে;—জানিতাম সংসারারণ্যে যাহারা পুণ্যরূপ মৃগ ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া বেড়ায়, প্রসন্ন তন্মধ্যে সুচতুরা; ভোজনান্তে নিত্যই প্রসন্নের পরকালে অক্ষয় স্বর্গ, এবং

ইহকালে মৌতাত বৃদ্ধির জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতাম। কিন্তু এক্ষণে হায়! মানব-চরিত্র কি ভীষণ স্বার্থপরতায় কলঙ্কিত! এক্ষণে সে মূল্য চাহিতেছে!

সুতরাং তাহার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা। প্রথম দিন সে যখন মূল্য চাহিল, রসিকতা করিয়া উড়াইয়া দিলাম—দ্বিতীয় দিনে বিস্মিত হইলাম—তৃতীয় দিনে গালি দিয়াছি। . এক্ষণে সে দুধ দই বন্ধ করিয়াছে। কি ভয়ানক? এতদিনে জানিলাম মনুষ্যজাতি নিতান্ত স্বার্থপর; এতদিনে জানিয়াছি যে সকল আশা ভরসা সযত্নে হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া বিশ্বাস জলে পুষ্ট কর, সকলই বৃথা! এক্ষণে জানিয়াছি, যে ভক্তিপ্রীতি স্নেহ প্রণয়াদি সকলই বৃথা গল্প—আকাশকুসুম! ছায়াবাজি! হায়! মনুষ্যজাতির কি হইবে! হায়, অর্থলুব্ধ গোয়ালা জাতিকে কে নিস্তার করিবে!

হায়! প্রসন্ন নামে গোয়ালার কবে গোরু চুরি যাবে!

প্রসন্নের দুগ্ধ দধি আছে, সে দিবে, আমার উদর আছে, খাইব, তাহার সঙ্গে এই সম্বন্ধ, ইহাতে সে মূল্য চাহে কোন অধিকারে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। প্রসন্ন বলে, আমি অধিকার অনধিকার বুঝি না; আমার গোরু, আমার দুধ, আমি মূল্য লইব। সে বুঝে না, যে গোরু কাহারও নহে; গোরু, গোরুর নিজের; দুধ, যে খায় তারই।

তবে, এ সংসারে মূল্য লওয়া একটা রীতি আছে, স্বীকার করি। কেবল খাদ্য সামগ্রী কেন, সকল সামগ্রীই মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়। দুধ দই, চাল দাল, খাদ্য পেয়, পরিধেয়, প্রভৃতি পণ্য দ্রব্য দূরে থাকুক, বিদ্যা বুদ্ধিও মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। কালেজে মূল্য দিয়া বিদ্যা কিনিতে হয়। অনেকে ভাল

কথা মূল্য দিয়া কিনিয়া থাকেন। হিন্দুরা সচরাচর মূল্য দিয়া ধর্ম্ম কিনিয়া থাকেন। যশঃ মান অতি অল্প মূল্যেই ক্রীত হইয়া থাকে। ভাল সামগ্রী মূল্য দিয়া কিনিতে হইবে, ইহাও কতক বুঝিতে পারি, কিন্তু মনুষ্য এমনই মূল্য প্রিয়, যে বিনামূল্যে মন্দ সামগ্রীও কেহ কাহাকে দেয় না। যে বিষ খাইয়া মরিবার বাসনা কর, তাহাও তোমাকে বাজার হইতে মূল্য দিয়া, কিনিয়া খাইতে হইবে।

অতএব এই বিশ্বসংসার, একটি বৃহৎ বাজার—সকলেই সেখানে আপনাপন দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্যপ্রাপ্তি। সকলেই অনবরত ডাকিতেছে "আমার দোকানে ভাল জিনিস—খরিদ্দার চলে আয়"—সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য, খরিদ্দারের চোকে ধূলা দিয়া রদি মাল পাচার করিবে। দোকান দার খরিদ্দারে কেবল যুদ্ধ,

কে কাকে ফাঁকি দিতে পারে। সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্যজীবন বলে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনের দুঃখে আফিমের মাত্রা চড়াইলাম। তখন জ্ঞাননেত্র ফুটিল। সম্মুখে ভবের বাজার সুবিস্তৃত দেখিলাম। দেখিলাম অসংখ্য দোকানদার; দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে - অসংখ্য খরিদ্দারে খরিদ করিতেছে—দেখিলাম সেই অসংখ্য দোকানদারে অসংখ্য খরিদ্দারে পরস্পরকে অসংখ্য বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে। আমি গামছা কাঁধে করিয়া বাজার করিতে বাহির হইলাম। প্রথমেই রূপের দোকানে গেলাম। যে জিনিস ঘরে নাই সেই দোকানে আগে যাইতে হয়। দেখিলাম, যে সংসারের সেই মেছো হাটা। পৃথিবীর রূপসীগণ মাছ হইয়া ঝুড়ি চুপড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। দেখিলাম ছোট বড় রুই কাতলা মৃগেল ইলিষ, চুনো

পুঁটি কই মাগুর, খরিদ্দারের জন্য লেজ আছ-ড়াইয়া ধড় ফড় করিতেছে; যত বেলা বাড়ি-তেছে, তত কলসা ফুলাইয়া, হাঁ করিয়া, বিক্র-য়ের জন্য খাবি খাইতেছে।—মেছনিরা ডাকি-তেছে, "মাছ নেবে গো! কুল পুকুরের সস্তা মাছ, অমনি ছাড়ব—বোঝা বিক্রী হলেই বাঁচি।" কেহ ডাকিতেছে, "মাছ নেবে গো —ধন সাগরের মিঠা মাছ—যে কেনে তার পুনর্জ্জন্ম হয় না—ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিবির মুণ্ডে পরিনত হইয়া তার ঘর দ্বারে ছড়াছড়ি যায়, যার সাধ্য থাকে কিনিবে। সোনার হাঁড়িতে চোখের জলে সিদ্ধ করিয়া, দুর্দ্দৈব আগুনে কড়া জ্বাল দিয়া রাঁধিতে হয়—কে খরিদ্ দার সাহস করিস—আয়। সাবধান! হীরার কাঁটা—নাতি ঝাঁটা—গলায় বাঁধলে শাশুড়িরূপী বিড়ালের পায়ে পড়িতে হয়—কাঁটার জ্বালায়, খরিদ্দার হলে কি পলায়!"

কেহ ডাকিতেছে “ওরে আমার সরস পুঁটি, বিক্রী হলেই উঠি। ঝোলে ঝালে অম্বলে, তেলে ঘিয়ে জলে, যাতে দিবে ফেলে, রাম্না যাবে চলে,—সংসারের দিন সুখে কাটাবে আমার এই সরস পুঁটির বলে।” কেহ বলিতেছে “কাদা ছেঁচে চাঁদা এনেছি—দেখে খরিদ্দার পাগল হয়! কিনে নিয়ে ঘর আলো কর।”

এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া মাছ কিনিতে প্রবৃত্ত হইলাম—কেন না আমার নিরামিষ ঘর করনা। দেখিলাম মাছের দালাল আছে; নাম পুরোহিত। দালাল খাড়া হইলে দর জিজ্ঞাসা করিলাম—শুনিলাম দর, “জীবন সর্ব্বস্ব।” যে মাছ ইচ্ছা সেই মাছ কেন, একই দর, “জীবন সর্ব্বস্ব।” জিজ্ঞাসা করিলাম, “ভাল এমাছ কত দিন থাইব।” দালাল বলিল, “দুদিন চারি দিন, তার পর পচিয়া

গন্ধ হইবে।” তখন “এত চড়া দরে, এমন নশ্বর সামগ্রী কেন কিনিব?” ভাবিয়া আমি মেছো হাটা হইতে পলায়ন করিলাম। দেখিয়া মেছনীরা গামছা কাঁধে মিন্‌সেকে গালি পাড়িতে লাগিল।

রূপের বাজার ছাড়িয়া বিদ্যার বাজারে গেলাম। দেখিলাম, এখানে ফলমূল বিক্রয় হয়। একস্থানে দেখিলাম, কতকগুলি ফোঁটা কাটা টিকিওয়ালা ব্রাহ্মণ তসর গরদ পরিয়া নামাবলি গায়ে, ঝুনা নারিকেলের দোকান খুলিয়া বসিয়া খরিদ্দার ডাকিতেছেন—“বেচি আমরা ঘটত্ব পটত্ব যত্ব ণত্ব,—ঘরে চাল থাকিলেই স্ব-ত্ব, নইলে ন-ত্ব। দ্রব্যত্ব জাতিত্ব গুণত্ব পদার্থ—বাপের শ্রাদ্ধে বিদায় না দিলেই তুমি বেটা অপদার্থ। পদার্থতত্ত্ব নামে ঝুনা নারিকেল—খাইতে বড় কঠিন—তাহার প্রথম ছোবড়ায় লেখে যে ব্রাহ্মণীই পরমপদার্থ।

অভাব নামে নারিকেল চতুর্ব্বিধ* — তোমার ঘরে ধন আছে, আমার ঘরে নাই, ইহা অন্যান্যাভাব। যতক্ষণ না পাই, ততক্ষণ প্রাগভাব; খরচ হইয়া গেলেই ধ্বংসাভাব; আর আমাদের ঘরে সর্ব্বদাই অত্যন্ত অভাব। অভাব নিত্য কি অনিত্য যদি সংশয় থাকে, তবে আমাদের ভাণ্ডারে উঁকি মার — দেখিবে নিত্যই অত্যন্ত অভাব। অতএব আমাদের ঝুনা নারিকেল কেন। ব্যাপ্য, ব্যাপক, ব্যাপ্তি, এ নারিকেলের শাঁস, ব্রাহ্মণের হস্ত হইল ব্যাপ্য, রজত হইল ব্যাপক; আর তুমি দিলেই ঘটিল ব্যাপ্তি; এই ঝুনানারিকেল কেন, এখনই বুঝিবে। দেখ, বাপু, কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বড় গুরুতর কথা; টাকা দাও,

* নৈয়ায়িকেরা বলেন, অভাব চতুর্ব্বিধ; অন্যান্যাভাব, প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব? আর অত্যন্তাভাব।

শ্রী কমলাকান্ত

এখনই একটা কার্য্য হইবে, কম দিলেই অকার্য্য। আর কারণ বুঝাইব কি, এই যে দুই প্রহর রৌদ্রে ঝুনানারিকেল বেচিতে আসিয়াছি, ব্রাহ্মণীই তাহার কারণ—কিছু যদি না কেন, তবে নারিকেল বহা,—অকারণ। অতএব নারিকেল কেন, নহিলে এই ঝুনানারিকেল মাথায় ঠুকিয়া মরিব।”

ব্রাহ্মণদিগের সেই প্রখর তপনতপ্ত ঘর্ম্মাক্ত ললাট এবং বাগ্‌বিতণ্ডাজনিত অধর সুধাবৃষ্টি দেখিয়া দয়া হইল—জিজ্ঞাসা করিলাম “হাঁ ভট্টাচার্য্য মহাশয়! ঝুনানারিকেল কিনিতে আপত্তি নাই, কিন্তু দোকানে দা আছে? ছুলিবে কি প্রকারে?”

“না বাপু দা রাখি না।”

“তবে নারিকেল ছোল কিসে?”

“আমরা ছুলি না—আমরা কামড়াইয়া ছোবড়া খাই।”

শুনিয়া, আমি ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া পাশের দোকানে গেলাম।

দেখিলাম ইহাদিগের সম্মুখেই এক্সপেরিমেণ্টেল সায়েন্সের দোকান। কতকগুলি সাহেব দোকানদার, ঝুনানারিকেল, বাদাম, পেস্তা, সুপারি প্রভৃতি ফল বিক্রয় করিতেছেন। ঘরের উপরে বড় বড় পিতলের অক্ষরে লেখা আছে।

MESSRS BROWN JONES AND ROBINSON

NUT SUPPLIERS

ESTABLISHED 1757

ON THE FIELD OF PLASSEY.

MESSRS BROWN JONES AND ROBINSON,

offer to tho Indian Public

A Large Assortment of

NUTS.

PHYSICAL, METAPHYSICAL,

LOGICAL ILLOGICAL,

AND

SUFFICIENT TO BREAK THE JAWS

and

DISLOCATE THE TEETH OF

ALL INDIAN YOUTHS

WHO STAND IN NEED OF HAVING THEIR

DENTAL SUPERFLUITIES CURTAILED.

দোকানদার ডাকিতেছেন—“আয় কালা বালক Experimental Science খাবি আয়। দেখ, ১নম্বর এক্সপেরিমেণ্ট—ঘুসি; ইহাতে দাঁত উপড়ে, মাথা ফাটে এবং হাড় ভাঙ্গে। আমরা এ সকল এক্সপেরিমেণ্ট বিনামূল্যে দেখাইয়া থাকি—পরের মাথা বা নরম হাড় পাইলেই হইল। আমরা স্থূল পদার্থের সংযোগ বিয়োগ সাধনে পটু—রাসায়নিক বলে, বা বৈদ্যুতীয় বলে, বা চৌম্বুক বলে, জড়পদার্থের বিশ্লেষণেই সুদক্ষ—কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মুষ্টাঘাতের বলে মস্তকাদির বিশ্লেষণেই আমরা কৃতকার্য্য। মাধ্যাকর্ষণ, যৌগিকাকর্ষণ, চৌম্বকাকর্ষণ প্রভৃতি নানাবিধ

আকর্ষণের কথা আমরা অবগত আছি, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কেশাকর্ষণেই আমরা কৃতবিদ্য। এই সংসারে জড় পদার্থের নানাবিধ যোগ দেখা যায়; যথা বায়ুতে অম্লজান, ও যবক্ষার জানের সামান্য যোগ; জলে জলজান ও অম্ল-জানের রাসায়নিক যোগ, আর তোমাদিগের পৃষ্ঠে, আমাদের হস্তে, মুষ্টিযোগ। অতএব, এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবে যদি, মাথা বাড়াইয়া দাও; এক্সপেরিমেণ্ট করিব। দেখিবে, গ্রাবিটেশ্যনের বলে এই সকল নারিকেলাদি তোমার মস্তকে পড়িবে; পর্ক-শন নামক অদ্ভুত শাব্দিক রহস্যেরও পরিচয় পাইবে, এবং দেখিবে তোমার মস্তিষ্কস্থিত স্নায়ব পদার্থের গুণে তুমি বেদনা অনুভূত করিবে।

অগ্রিম মূল্য দিও; তাহাহইলে চ্যারিটিতে এক্সপেরিমেণ্ট খাইতে পারিবে।”

আমি এই সকল দেখিতে শুনিতে ছিলাম, এমত সময়ে, সহসা দেখিলাম যে ইংরেজ দোকানদারেরা, লাঠী হাতে, দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণদিগের ঝুনানারিলের গাদার উপর গিয়া পড়িলেন, দেখিয়া, ব্রাহ্মণেরা নারিকেল ছাড়িয়া দিয়া, নামাবলী ফেলিয়া, মুক্তকচ্ছ হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন সাহেবেরা সেই সকল পরিত্যক্ত নারিকেল দোকানে উঠাইয়া লইয়া আসিয়া, বিলাতী অস্ত্রে ছেদন করিয়া, সুখে আহার করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যে “এ কি হইল?” সাহেবেরা বলিলেন, “ইহাকে বলে Asiatic Researches.” আমি তখন ভীত হইয়া, আত্মশরীরে কোন প্রকার Panatonical researches আশঙ্কা করিয়া, সেখান হইতে পলায়ন করিলাম।

সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। দেখিলাম

বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃত ফল বেচিতেছেন, বুঝিলাম ইহা সংস্কৃত সাহিত্য; দেখিলাম দেবর্ষি তুল্য জ্যোতির্ম্ময় মনুষ্যগণ নীচু পীচ পেয়ারা আনারস আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করিতেছেন — বুঝিলাম এ পাশ্চাত্য সাহিত্য। আরও একখানি দোকান দেখিলাম—অসংখ্য শিশুগণ তাহাতে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে—ভিড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না—জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কিসের দোকান?

বালকেরা বলিল, "বাঙ্গালা সাহিত্য?"

"বেচিতেছে কে?"

"আমরাই বেচি। দুই একজন বড় মহাজনও আছেন। তদ্ভিন্ন বাজে দোকানদারের পরিচয় পদ্মাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন।"

"কিনিতেছে কে?"

"আমরাই।"

বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম—খবরের কাগজ জড়ান কতকগুলি অপক্ক কদলী।

তাহার পরে কলু পটিতে গেলাম। দেখিলাম যত উমেদার, মোসায়েব, সকলে কলু সাজিয়া তেলের ভাঁড় লইয়া সারি সারি বসিয়া গিয়াছে। তোমার ট্যাকে চাকুরি আছে, শুনিতে পাইলেই, পা টানিয়া লইয়া, ভাঁড় বাহির করিয়া, তেল মাখাইতে বসে। চাকরি না থাকিলেও—যদি থাকে, এই ভরসায়, পা টানিয়া লইয়া, তেল লেপিতে বসে। তোমার কাছে চাকরি নাই—নাই নাই—নগদ টাকা আছে ত—আচ্ছা তাই দাও—তেল দিতেছি। কাহারও প্রার্থনা, তোমার বাগানে বসিয়া তুমি যখন ব্রাণ্ডি খাইবে, আমি তোমার চরণে তৈল মাখাইব—আমার কন্যার

বিবাহটি যেন হয়। কাহারও আদ্দাশ, তোমার কাণে অবিরত খোষামোদের গন্ধ তৈল ঢালিব—আমার বাড়ীর প্রাচীরটি যেন দিতে পারি। কাহারও কামনা, তোমার তোষাখানার বাতি জ্বালিয়া দিব—আমার খবরের কাগজখানি যেন চলে। শুনিয়াছি কলুদিগের টানাটানিতে অনেকের পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছে। আমার শঙ্কা হইল, পাছে কোন কলু আফিঙ্গের প্রার্থনায় আমার পায়ে তেল দিতে আরম্ভ করে। আমি পলায়ন করিলাম।

তার পরে যশের বাজারে গেলাম—দেখিলাম সে ময়রাপটী। সম্বাদপত্রলেখক নামে ময়রাগণ, গুড়েসন্দেশের দোকান পাতিয়া, নগদ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে—রাস্তার লোক ধরিয়া সন্দেশ গতাইয়া দিয়া, হাত পাতিতেছে—মূল্য না পাইলেই কাপড় কাড়িয়া লইতেছে। এদিকে তাঁহাদের বিক্রেয় যশের

দুর্গন্ধে পথিক নাসিকা আবৃত করিয়া পলায়ন করিতেছে। দোকানদারগণ বিনা ছানায়, শুধু গুড়ে, আশ্চর্য্য সন্দেশ করিয়া সস্তাদরে, বিক্রয় করিতেছেন। কেহ টাকাটা সিকেটায় আনা দু আনায়, কেহ কেবল খাতিরে—কেহ বা এক সাঁজ ফলাহার পেলেই, ছাড়েন—কেহ বা বাবুর গাড়িতে চড়িতে পেলেই যশোবিক্রয় করেন। অন্যত্র রাজপুরুষগণ মিঠাইওয়ালা সাজিয়া, রায়বাহাদুর, রাজাবাহাদুর খেতাব, খেলাত, নিমন্ত্রণ, ধন্যবাদ প্রভৃতি মিঠাই লইয়া দোকান পাতিয়া বসিয়া আছেন, - চাঁদা, সেলাম, খোষামোদ, ডাক্তারখানা, রাস্তাঘাট, মূল্য লইয়া মিঠাই বেচিতেছেন। বিক্রয়ের বড় বেবন্দোবস্ত—কেহ সর্ব্বস্ব দিয়া এক ঠোঙ্গা পাইতেছে না—কেহ শুধু সেলামে দেড়মন লইয়া যাইতেছে। এইরূপ অনেক দোকান দেখিলাম—কিন্তু সর্ব্বত্রেই

পচা মাল আধা দরে বিক্রয় হইতেছে—খাটি দোকান দেখিলাম না। কেবল একখানি দোকান দেখিলাম—তাহা অতি চমৎকার।

দেখিলাম দোকানের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। ডাকিয়া দোকানদারের উত্তর পাইলাম না—কেবল এক সর্ব্বপ্রাণিভীতিসাধক অনন্ত গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম—অল্পালোকে দ্বারে ফলকলিপি পড়িলাম।

যশের পণ্যশালা।

বিক্রেয়—অনন্তযশ।

বিক্রেতা—কাল।

মূল্য—জীবন।

জীয়ন্তে কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারে না।

আর কোথাও সুযশঃ বিক্রয় হয় না।

পড়িয়া ভাবিলাম—আমার যশে কাজ নাই—কমলাকান্তের প্রাণ বাঁচিলে অনেক যশ হইবে।

বিচারের বাজারে গেলাম—দেখিলাম সেটা কসাইখানা। টুপি মাথায় শামলা মাথায়—ছোট বড় কসাই সকল, ছুরি হাতে গোরু কাটিতেছে। মহিষাদি বড় বড় পশু সকল শৃঙ্গ নাড়িয়া ছুটিয়া পলাইতেছে;—ছাগ মেষ এবং গোরু প্রভৃতি ক্ষুদ্র পশু সকল ধরা পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া গোরু বলিয়া এক জন কসাই বলিল, "এও গোরু; কাটিতে হইবে।" আমি সেলাম করিয়া পলাইলাম।

আর বড় বাজার বেড়াইবার সাধ রহিল না—তবে প্রসন্নের উপর রাগ ছিল বলিয়া একবার দইয়ে হাটা দেখিতে লাগিলাম—গিয়া প্রথমেই দেখিলাম যে সেখানে খোদ কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী নামে গোয়ালা—দপ্তররূপ পচা ঘোলের হাঁড়ি লইয়া বসিয়া আছে—আপনি ঘোল খাইতেছে,এবং পরকে খাওয়াইতেছে।

তখন চমক হইল—চক্ষু চাহিলাম—দেখি-

লাম, নশীবাবুর বাড়ীতেই আছি। ঘোলের হাঁড়ি কাছে আছে বটে। প্রসন্ন এক হাঁড়ি ঘোল আনিয়া আমাকে সাধিতেছে—"চক্রবর্ত্তী মশাই—রাগ করিও না। আজ আর দুধ দই নাই—এই ঘোল টুকু আনিয়াছি—ইহার দাম দিতে হইবে না।"

একাদশ সংখ্যা।

আমার দুর্গোৎসব।

সপ্তমী পূজার দিন কে আমাকে এত আফিঙ্গ চড়াইতে বলিল! আমি কেন আফিঙ্গ খাইলাম! আমি কেন প্রতিমা দেখিতে গেলাম! যাহা কখন দেখিব না তাহা কেন দেখিলাম! এ কুহক কে দেখাইল!

দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোতঃ, দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখি-

লাম—অনন্ত, অকূল, অন্ধকারে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোতঃ—মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে—আবার উঠিতেছে, দিগন্ত আলো করিতেছে—আবার নিবিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—মা! মা! করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কাল সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিতেছি। কোথা মা! কই আমার মা! কোথায় কমলাকান্তপ্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে, হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করি-

তেছে! এই কি মা! হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃণ্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশদিক্—দশদিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রুনিষ্পীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কাল স্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু এক দিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণপ্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী* কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কাল স্রোতোমধ্যে দেখিলাম এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা!

কোথায় ফুল পাইলাম বলিতে পারি না—

কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম—ডাকিলাম, "সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে, আমার সর্ব্বার্থ সাধিকে! অসংখ্য সন্তানকুলপালিকে! ধর্ম্ম, অর্থ, সুখ দুঃখ দায়িকে! আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর! এই ভক্তি প্রীতি বৃত্তি শক্তি করে লইয়া তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি, তুমি এই অনন্ত জলমণ্ডল ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি একবার জগৎ সমীপে প্রকাশ কর। এসো মা! নবরাগরঙ্গিণি, নব বলধারিণি, নব দর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিনি—এসো মা, গৃহে এসো—ছয়কোটি সন্তানে একত্রে, এক কালে, দ্বাদশকোটি কর যোড় করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব, মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধন ধান্য দায়িকে! নগাঙ্কশোভিনি নগেন্দ্র বালিকে! শরৎসুন্দরি চারুপূর্ণচন্দ্রভালিকে! ডাকিব,—সিন্ধু সেবিতে সিন্ধুপু-

জিতে সিন্ধুমথনকারিণি, শক্রবধে দশভুজে দশপ্রহরণ ধারিণি! অনন্তশ্রী অনন্ত কালস্থায়িনি! শক্তি দাও, সন্তানে, অনন্তশক্তি প্রদায়িনি! তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা? এই ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব, এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এসো মা গৃহে এসো —যাঁহার ছয় কোটি সন্তান—তাঁহার ভাবনা কি?

দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই অনন্ত কাল সমুদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল; অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল! তখন যুক্ত করে, সজল নয়নে, ডাকিতে লাগিলাম, উঠ হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান

হইব—সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম্ম,আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা—একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! উঠ উঠ, উঠ মা বঙ্গজননি!

মা উঠিলেন না। উঠিবেন না কি!

এস ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই! এস আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্র সকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে নিবিতেছে উহারা পথ দেখাইবে—চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কাল সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া, আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া

আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব; মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি? আইস, প্রতিমা তুলিয়া আনি, বড় পূজার ধূম বাঁধিবে। দ্বেষক ছাগকে হাড়িকাটে ফেলিয়া সংকীর্ত্তি খড়্গে মায়ের কাছে বলি দিব—কত পুরাবৃত্তকার ঢাকী, ঢাক ঘাড়ে করিয়া, বঙ্গের বাজনা বাজাইয়া আকাশ ফাটাইবে—কত ঢোল, কাঁশি, কাড়া, নাগরায় বঙ্গের জয় বাদিত হইবে। কত সানাই পোঁ ধরিয়া গাইবে "কত নাচ গো।—" বড় পূজার ধূম বাঁধিবে। কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লুচি মণ্ডার লোভে বঙ্গপূজায় আসিয়া পাতড়া মারিবে—কত দেশী বিদেশী ভদ্রাভদ্র আসিয়া মায়ের চরণে প্রণামি দিবে—কত দীন দুঃখী প্রসাদ খাইয়া উদর পূরিবে। কত নর্ত্তকী নাচিবে, কত গায়কে মঙ্গল গায়িবে, কত কোটি ভক্তে ডাকিবে মা! মা! মা!—

জয় জয় জয় জয়া জয়দাত্রি।

জয় জয় জয় বঙ্গ জগদ্ধাত্রি ॥
জয় জয় জয় সুখদে অন্নদে।
জয় জয় জয় বরদে শর্ম্মদে ॥
জয় জয় জয় শুভে শুভঙ্করি।
জয় জয় জয় শান্তি ক্ষেমঙ্করি।
দ্বেষকদলনি, সন্তানপালনি।
জয় জয় দুর্গে দুর্গতিনাশিনি।
জয় জয় লক্ষ্মি বারিন্দ্রবালিকে ॥
জয় জয় কমলাকান্ত পালিকে ॥
জয় জয় ভক্তি শক্তি দায়িকে,
পাপ তাপ ভয় শোক নাশিকে।
মৃদুল গম্ভীর ধীর ভাষিকে,
জয় মা কালি করালি অম্বিকে।
জয় হিমালয় নগবালিকে,
অতুলিত পূর্ণচন্দ্র ভালিকে।
শুভে শোভনে সর্ব্বার্থ সাধিকে,
জয় জয় শান্তি শক্তি কালিকে,

জয় মা কমলাকান্ত পালিকে ॥
নমোস্তু তে দেবি বরপ্রদে শুভে।
নমোস্তু তে কামচরে সদা ধ্রুবে ॥
ব্রহ্মাণীন্দ্রাণি রুদ্রাণি ভূতভব্যে যশস্বিনি
ত্রাহি মাং সর্ব্বদুঃখেভ্যো দানবানাং ভয়ঙ্করি।
নমোস্তু তে জগন্নাথে জনার্দ্দনি নমোস্তু তে।
প্রিয়দাস্তে জগন্মাতঃ শৈলপুত্রি বসুন্ধরে।
ত্রায়স্ব মাং বিশালাক্ষি ভক্তানামার্ত্তনাশিনি।
নমামি শিরসা দেবীং বন্ধনোস্তুবিমোচিতঃ ॥*

দ্বাদশ সংখ্যা।

একটি গীত।

"শোন্ প্রসন্ন, তোকে একটি গীত শুনাইব।"

প্রসন্ন গোয়ালিনী বলিল, "আমার এখন

---

* আর্য্যাস্তোত্র দেখ।

গান শুনিবার সময় নয়—দুধ যোগাবার বেলা হলো।”

কমলাকান্ত। “এসো এসো বঁধু এসো।”

প্রসন্ন। “ছি ছি ছি! আমি কি তোমার বঁধু?”

কমলাকান্ত—“বালাই! ষাট, তুমি কেন বঁধু হইতে যাইবে? আমার গীতে আছে—”

এসো এসো বঁধু এসো—আধ আঁচরে বসো—

সুর করিয়া আমি কীর্ত্তন ধরাতে প্রসন্ন দুধের কেঁড়ে রাখিয়া বসিল, আমি গীতটি আদ্যোপান্ত গায়িলাম।

“এসো এসো বঁধু এসো আধ আঁচরে বসো
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে, মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি।
মণি নও মাণিক নও যে হার করে গলে পরি,
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি,

লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ ॥
বঁধু তোমায় যখন পড়ে মনে।
আমি চাই বৃন্দাবন পানে
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই,
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।"

মিল ত চমৎকার, "দেখি" আর "বিধি" মিলিল! কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায়, এইরূপ মোহ-মন্ত্র আর একটি শুনিব, মনে বড় সাধ রহিয়াছে। যখন এই গান প্রথম কর্ণ ভরিয়া শুনিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল, নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত গাই—মনে হইয়াছিল সেই বিচিত্র সৃষ্টিকুশলী কবি শ্রীমদ্ভাগবতকারের সৃষ্টি দৈববংশী লইয়া, মেঘের উপর যে বায়ুস্তর,—শব্দশূন্য, দৃশ্যশূন্য, পৃথিবী যেখান হইতে দেখা যায় না, সেইখানে বসিয়া, সেই মুরলীতে, একা এই গীত গাই—এই গীত

কখন ভুলিতে পারিলাম না; কখন ভুলিতে পারিব না।

এসো এসো বঁধু এসো—

লোকের মনে কি আছে বলিতে পারি না, কিন্তু আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, বুঝিতে পারি না, যে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে কিছু সুখ আছে। যে পশু ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি জন্য পরসন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষী, সে যেন কখন কমলাকান্ত শর্ম্মার দপ্তর মুক্তাবলী পড়িতে বসে না। আমি বিলাসপ্রিয়ের মুখে "এসো এসো বঁধু এসো" বুঝিতে পারি না। কিন্তু ইহা বুঝিতে পারি যে, মনুষ্য মনুষ্যের জন্য হইয়াছিল—এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের জন্য হইয়াছিল—সেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন, ইহা মনুষ্য জীবনের সুখ। ইহজন্মে মনুষ্যহৃদয়ে একমাত্র তৃষা, অন্যহৃদয়কামনা। মনুষ্য-হৃদয় অনবরত হৃদয়ান্তরকে ডাকিতেছে, "এসো

এসো বঁধু এসো।” ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবৃত্তি সকল শরীর রক্ষার্থ—মহতী প্রবৃত্তি সকলের উদ্দেশ্য “এসো এসো বঁধু এসো।” তুমি চাকরি কর, খাইবার জন্য—কিন্তু যশের আকাঙ্ক্ষা কর, পরের অনুরাগ লাভ করিবার জন্য—জনসমাজের হৃদয়কে তোমার হৃদয়ের সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য। তুমি যে পরোপকার কর সে পরের হৃদয়ের ক্লেশ আপন হৃদয়ে অনুভূত কর বলিয়া। তুমি যে রাগ কর, সে তোমার মনোমত কার্য্য হইল না বলিয়া, হৃদয় হৃদয়ে আসিল না বলিয়া। সর্ব্বত্র এই রব —“এসো এসো বঁধু এসো।” সর্ব্ব কর্ম্মের এই মন্ত্র, “এসো এসো বঁধু এসো।” জড় জগতের নিয়ম আকর্ষণ। বৃহৎ গ্রহ, উপগ্রহকে ডাকিতেছে “এসো এসো বঁধু এসো।” সৌর পিণ্ড বৃহৎ গ্রহকে ডাকিতেছে, “এসো এসো বঁধু এসো।” জগৎ জগদন্তরকে ডাকি-

তেছে "এসো এসো বঁধু এসো।" পরমাণু পরমাণুকে অবিরত ডাকিতেছে—"এসো এসো বঁধু এসো" জড়পিণ্ড সকল, গ্রহ, উপগ্রহ ধূমকেতু—সকলেই এই মোহমন্ত্রে বাঁধা পড়িয়া ঘুরিতেছে। প্রকৃতি, পুরুষকে ডাকিতেছে "এসো এসো বঁধু এসো।" জগতের এই গম্ভীর অবিশ্রান্তধ্বনি—"এসো এসো বঁধু এসো।" কমলাকান্তের বঁধু কি আসিবে!

আধ আঁচরে বসো।

এই তৃণশষ্পসমাচ্ছন্ন, কণ্টকাদিতে কর্কশ সংসারারণ্যে, হে বাঞ্ছিত! তোমাকে আর কি আসন দিব, আমার এই হৃদয়াবরণের অর্দ্ধেকে উপবেশন কর। তোমার দুঃখ, তোমার কুশ কণ্টকাদি আচ্ছাদন জন্য আমি এই আপন অঙ্গ অনাবৃত করিতেছি—আমার আঁচরে বসো। যাহাতে আমার লজ্জারক্ষা, মানরক্ষা, যাহাতে

আমার শোভা, হে মিলিত! তুমিও তাহার অর্দ্ধেক গ্রহণ কর—আধ আঁচরে বসো। হে পরের হৃদয়, হে সুন্দর, হে মনোরঞ্জন, হে সুখদ! কাছে এসো, আমাকে স্পর্শ কর,আমি তোমাতে সংলগ্ন হইব,—দূরে আসনগ্রহণ করিও না—এই আমার শরীরলগ্ন অঞ্চলার্দ্ধে বসো। হে কমলাকান্ত! হে দুর্বিনীত! হে আজন্মবিবাহশূন্য, তুমি এতদর্থে শান্তিপুরে কল্কাদার আঁচলের আধখানা বুঝিও না। তুমি যে অঞ্চলার্দ্ধে বসিবে, তাহার তাঁতি আজিও জন্মে নাই। মনের নগ্নত্ব জ্ঞানবস্ত্রে আবৃত; অর্দ্ধেকে তোমার হৃদয় আবৃত রাখ, অর্দ্ধেকে বাঞ্ছিতকে বসাও। তুমি মূর্খ—তথাপি তোমার অপেক্ষা মূর্খ যদি কেহ থাকে তাহাকে ডাক—“এসো এসো বঁধু এসো—আধ আঁচরে বসো।”

নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।

কেহ কখন দেখিয়াছে? তুমি অনেক ধন উপার্জ্জন করিয়াছ—কখন নয়ন ভরিয়া আত্ম-ধন দেখিতে পাইয়াছ? তুমি যশস্বী হইবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছ—কিন্তু আত্মযশোরাশি দেখিয়া কবে তোমার নয়ন ভরিয়াছে? রূপ-তৃষ্ণায় তুমি ইহজীবন অতিবাহিত করিলে—যেখানে ফুলটি ফুটে, ফলটি দোলে, যেখানে পাখীটী উড়ে, যেখানে মেঘ ছুটে, গিরিশৃঙ্গ উঠে, নদী বহে, জল ঝরে, তুমি সেইখানে রূপের অনুসন্ধানে ফিরিয়াছ--যেখানে বালক, প্রফুল্লমুখমণ্ডল আন্দোলিত করিয়া হাসে, যে-খানে যুবতী ব্রীড়াভরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া শঙ্কিত গমনে যায়, যেখানে প্রৌঢ়া নিতান্ত স্ফুটিত মধ্যাহ্ন পদ্মিনীবৎ অকাতরে রূপের বিকাশ করে, তুমি সেইখানেই রূপের সন্ধানে ফিরি-

য়াছ, কখন নয়ন ভরিয়া রূপ দেখিয়াছ? দেখ নাই কি, যে কুসুম দেখিতে দেখিতে শুকায়, ফল দেখিতে দেখিতে পাকে, পড়ে, পচে, গলে; পাখী উড়িয়া যায়, মেঘ চলিয়া যায়, গিরি ধূমে লুকায়, নদী শুকায়, চাঁদ ডুবে, নক্ষত্র নিবিয়া যায়। শিশুর হাসি রোগে হরণ করে, যুবতীর ব্রীড়া—কিসে না যায়? প্রৌঢ়া বয়সে শুকাইয়া যায়। ইহা সংসারের দুর-দৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। অথবা এই সংসারের শুভাদৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। গতিই সংসারের সুখ—চাঞ্চল্যই সংসারের সৌন্দর্য্য। নয়ন ভরে না। সে নয়ন আমরা পাই নাই। পাইলে সংসার দুঃখময় হইত; পরিতৃপ্তি রা-ক্ষস আমাদের সকল সুখকে গ্রাস করিত। কোন কারিগর অভিসন্ধি করিয়া এই পরি-বর্ত্তনশীল সংসার, আর এই অতৃপ্য নয়ন সৃ-

জন করিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না; কিন্তু যদি কারিগরের কারিগরি থাকে, তবে কারিগরির উপর কারিগরি, এই বাসনা, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, নয়নও অতৃপ্য, অথচ বাসনা—নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।

হে রূপ! হে বাহ্য সৌন্দর্য্য! হে অন্তঃপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট! কাছে আইস, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি। দূরে বসিলে দেখা হইবে না কেন না দেখা কেবল নয়নে নহে। সংস্পর্শ বা নৈকট্য ব্যতীত মনের বৈদ্যুতী বহে না—আমরা সর্ব্ব শরীরে দেখিয়া থাকি। মনে হইতে মনে বৈদ্যুতী চলিলে তবে নয়ন ভরিবে। হায়! কিসেই বা নয়ন ভরিবে! নয়নে যে পলক আছে!

অনেক দিবসে, মনের মানসে

তোমা ধনে মিলাইল বিধি হে

আমি কখন কখন মনে করিয়া থাকি কেবল দুঃখের পরিমাণ জন্যই দয়া করিয়া বিধাতা দিবসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নহিলে কাল অপরিমেয়, মনুষ্য দুঃখ অপরিমিত হইত। আমরা এখন বলিতে পারি যে আমি দুইদিন, দুই মাস, বা দুই বৎসর দুঃখভোগ করিতেছি; কিন্তু দিন রাত্রির পরিবর্ত্তন না থাকিলে, কালের পথ চিহ্নশূন্য হইলে, কে না বুঝিত যে আমি অনন্তকাল দুঃখভোগ করিতেছি? আশা তাহা হইলে দাঁড়াইবার স্থান পাইত না—এত দিন পরে আবার দুঃখান্ত হইবে, একথা কেহ ভাবিতে পারিত না—বৃক্ষাদিশূন্য অনন্ত প্রান্তরবৎ জীবনের পথ অনুত্তীর্য্য হইত—জীবন যাত্রা দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণাস্বরূপ হইত। অতএব এই বৃহৎ জগৎকেন্দ্রে সূর্য্যের পথ আমাদের সুখ দুঃখের মানদণ্ড। দিবস গণনায় সুখ আছে। সুখ আছে বলিয়াই দুঃখী জন দি-

বস গণিয়া থাকে। দিবস গণনা দুঃখবিনোদন। কিন্তু এমন দুঃখীও আছে যে সে দিবস গণেনা; দিবস গণনা তাহার পক্ষে চিত্তবিনোদন নহে। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী—পৃথিবীতে ভুলিয়া মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াছি · সুখহীন, আশাহীন, উদ্দেশ্যশূন্য, আকাঙ্ক্ষাশূন্য আমি কি জন্য দিবস গণিব? এই সংসারসমুদ্রে আমি ভাসমান তৃণ, সংসার বাত্যায় আমি ঘূর্ণ্যমান ধূলিকণা, সংসারারণ্যে আমি অফলন্ত বৃক্ষ—সংসারাকাশে আমি বারিশূন্য মেঘ—আমি কেন দিবস গণিব?

গণিব। আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ এক ভরসা আছে। ১২০৩ শাল হইতে দিবস গণি। যে দিন বঙ্গে হিন্দুনাম লোপ পাইয়াছে সেই দিন হইতে দিন গণি। যে দিন সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গজয় করিয়াছিল সেই দিন হইতে দিন গণি। হায়! কত গণিব!

দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাত বার গণি। কই, অনেক দিবসে মনের মানসে বিধি মিলাইল, কই? যাহা চাই তাহা মিলাইল কই? মনুষ্যত্ব মিলিল কই? একজাতীয়ত্ব মিলিল কই? ঐক্য কই? বিদ্যা কই? গৌরব কই? শ্রীহর্ষ কই? ভট্টনারায়ণ কই? হলায়ুধ কই? লক্ষ্মণসেন কই? আর কি মিলিবে না? হায়! সবারই ইপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের মিলিবে না?

মণি নও মাণিক নও, যে হার করে্য গলে পরি---

বিধাতা জগৎ জড়ময় করিয়াছেন কেন? রূপ জড়পদার্থ কেন? সকলই অশরীরী হইল না কেন? হইলে হৃদয় হৃদয়ে কেমন মিলিত! যদি রূপের শরীরে প্রয়োজন ছিল তবে তো-

মার আমার বিধাতা এক শরীর করেন নাই কেন? তাহাহইলে আর ত বিচ্ছেদ হইত না। এখন কি এক শরীর হয় না? আমার শরীরে এত স্থান আছে—তোমাকে তাহাতে কোথাও কি রাখিতে পারি না? তোমাকে কণ্ঠলগ্ন করিয়া হৃদয়ে বিলম্বিত করিয়া রাখিতে পারি না? হায়! তুমি মণি নও, মাণিক নও, যে হার করিয়া গলে পরি।

আর বঙ্গভূমি! তুমিই বা কেন মণি মাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন আমি হার করিয়া, কণ্ঠে পরিতে পাইলাম না! তোমায় যদি কণ্ঠে পরিতাম, মুসলমান আমার হৃদয়ে পদাঘাত না করিলে তাহার পদরেণু তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তোমায় সুবর্ণের আসনে বসাইয়া, হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউরোপে, আমেরিকে, মিসরে, চীনে, দেখিত তুমি আমার কি উজ্জ্বল মণি!

আমায় নারী না করিত্ত বিধি
তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশ।

প্রথমে আহ্বান, "এসো এসো বঁধু এসো" পরে আদর, "আধ আঁচরে বসো" পরে ভোগ, "নযন ভরিয়া তোমায় দেখি।" তখন সুখ-ভোগকালীন পূর্ব্বদুঃখস্মৃতি—"অনেক দিবসে, মনের মানসে, তোমা ধনে মিলাইল বিধি।" সুখ দ্বিবিধ, সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ সুখ যথা,

মণি নও মাণিক নও, যে হার করো গলে প'র

পরে সম্পূর্ণ সুখ,

আমায় নারী না করিত বিধি,
তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশ।

সম্পূর্ণ, অসহ্য সুখের লক্ষণ, শারীরিক চাঞ্চল্য, মানসিক অস্থৈর্য্য। এ সুখ কোথায়

রাখিব, লইয়া কি করিব, আমি কোথায় যাইব, এ সুখের ভার লইয়া কোথায় ফেলিব ? এ সুখের ভার লইয়া আমি দেশে দেশে ফিরিব; এ সুখ একস্থানে ধরে না; যেখানে যেখানে পৃথিবীতে স্থান আছে সেইখানে সেইখানে এ সুখ লইয়া যাইব, এ জগৎ সংসার এই সুখে পুরাইব। সংসার এ সুখের সাগরে ভাসাইব; মেরু হইতে মেরু পর্য্যন্ত সুখের তরঙ্গ নাচাইব, আপনি ডুবিয়া, উঠিয়া, ভাসিয়া, হেলিয়া, ছুটিয়া বেড়াইব। এ সুখে কমলাকান্তের অধিকার নাই—এ সুখে বাঙ্গালির অধিকার নাই। সুখের কথাতেই বাঙ্গালির অধিকার নাই। গোপীর দুঃখ, বিধাতা গোপীকে নারী করিয়াছেন কেন—আমাদের দুঃখ বিধাতা আমাদের নারী করেন নাই কেন—তাহা হইলে এ মুখ দেখাইতে হইত না।

সুখের কথায় বাঙ্গালির অধিকার নাই—

কিন্তু দুঃখের কথায় আছে। কাতরোক্তি যত গভীর, যতই হৃদয়বিদারক হউক না কেন, তাহা বাঙ্গালির মর্ম্মোক্তি। আর কাতরোক্তি কোথায় বা নাই? নবপ্রসূত পক্ষিশাবক হইতে মহাদেবের শৃঙ্গধ্বনি পর্য্যন্ত সকলই কাতরোক্তি। সম্পূর্ণসুখে সুখীও সুখকালে পূর্ব্বদুঃখ স্মরণ করিয়া কাতরোক্তি করে। নহিলে সুখের সম্পূর্ণতা কি? দুঃখস্মৃতি ব্যতীত সুখের সম্পূর্ণতা কোথায়? সুখও দুঃখময়—

তোমায় যখন পড়ে মনে,
আমি চাই বৃন্দাবন পানে,
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।

এই কথা সুখ দুঃখের সীমা রেখা! যাহার নষ্ট সুখের স্মৃতি জাগরিত হইলে সুখের নিদর্শন এখনও দেখিতে পায়, সে এখনও সুখী—তাহার সুখ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। তাহার বন্ধু, তাহার প্রিয়, বাঞ্ছিত—গিয়াছে, কিন্তু

তাহার বৃন্দাবন আছে—মনে করিলে সে সেই সুখভূমি পানে চাহিতে পারে। যাহার সুখ গিয়াছে—সুখের নিদর্শন গিয়াছে—বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে, এখন আর চাহিবার স্থান নাই—সেই দুঃখী, অনন্ত দুঃখে দুঃখী। বিধবা যুবতী, মৃত পতির যত্নরক্ষিত পাদুকা হারাইলে, যেমন দুঃখে দুঃখী হয়, তেমনই দুঃখে দুঃখী।

আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে—নিদর্শন কই? দেবপালদেব, লক্ষ্মণসেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ,—প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী রীতি, এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে পড়িল কিন্তু চাহিব কোন্ দিকে? সে গৌড় কই? সে যে কেবল যবনলাঞ্ছিত ভগ্নাবশেষ! আর্য্য রাজধানীর চিহ্ন কই? আর্য্যের ইতিহাস কই? জীবন চরিত কই? কীর্ত্তি কই?

কীর্ত্তিস্তম্ভ কই? সমরক্ষেত্র কই? সুখ গিয়াছে —সুখ চিহ্নও গিয়াছে, বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—চাহিব কোন্ দিকে?

চাহিবার এক শ্মশান ভূমি আছে,—নবদ্বীপ। সেইখানে সপ্তদশ যবনে বঙ্গাধিকার করিয়াছিল। বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি সেই শ্মশান ভূমি প্রতি চাই। যখন দেখি সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌতবাহিনী গঙ্গা তর তর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—তুমি আছ, সে বঙ্গলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাঁহার পা ধুয়াইতে, সেই মাতা কোথায়? তুমি যাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সেই আনন্দরূপিণী কোথায়? তুমি যাঁহার জন্য সিংহল, বালী, আরব, সুমিত্রা হইতে বুকে করিয়া ধনবহন করিয়া আনিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায়? তুমি যাহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপসী সাজিতে,

সে অনন্তসৌন্দর্য্যশালিনী কোথায়? তুমি যাহার প্রসাদি ফুল লইয়া ঐ স্বচ্ছ হৃদয়ে মালা পরিতে, সে পুষ্পাভরণা কোথায়? সে রূপ, সে ঐশ্বর্য্য কোথায় ধুইয়া লইয়া গিয়াছ? বিশ্বা-সঘাতিনি, তুমি কেন আবার শ্রবণমধুর কল কল তর তর রবে মন ভুলাইতেছ? বুঝি তোমারই অতল গর্ভমধ্যে, যবনভয়ে ভীতা সেই বঙ্গলক্ষ্মী ডুবিয়াছেন, বুঝি কুপুত্রগণের আর মুখ দেখিবেন না বলিয়া ডুবিয়া আছেন। মনে মনে আমি সেইদিন কল্পনা করিয়া কাঁদি। মনে মনে দেখিতে পাই, মার্জ্জিত বর্ষাফলক উন্নত করিয়া, অশ্বপদশব্দমাত্রে নৈশ নীরব বিস্মিত করিয়া, যবনসেনা নবদ্বীপে আসিতেছে। কালপূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বঙ্গলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইতেছেন। সহসা আকাশ অন্ধ-কারে ব্যাপিল; রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ

ছাড়িল; নাগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল; কুঞ্জবনে পক্ষিগণ নীরব হইল; গৃহময়ূরকণ্ঠে অর্দ্ধব্যক্ত কেকার অপরার্দ্ধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, পণ্যবীথিকার দীপমালা নিবিয়া গেল, পূজাগৃহে বাজাইবার সময়ে শংখ বাজিল না; পণ্ডিতে অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল; সিংহাসন হইতে শালগ্রামশিলা গড়াইয়া পড়িল। যুবার সহসা বলক্ষয় হইল; যুবতী সহসা বৈধব্য আশঙ্কা করিয়া কাঁদিল; শিশু বিনারোগে মাতার ক্রোড়ে শুইয়া মরিল। গাঢ়তর, গাঢ়তর, গাঢ়তর অন্ধকারে, দিক্ ব্যাপিল; আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী রাজবর্ত্ম, দেবমন্দির, পণ্য বীথিকা, সেই অন্ধকারে ঢাকিল—কুঞ্জতীরভূমি, নদী, নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে—আঁধার, আঁধার, আঁধার হইয়া লুকাইল। আমি চক্ষে সব দেখিতেছি—আকাশে মেঘ ঢাকিতেছে—ঐ সো-

পানাবলী অবতরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন। অন্ধকারে নির্ব্বাণোন্মুখ আ-লোকবিন্দুবৎ, জলে, ক্রমে ক্রমে সেই তেজোরাশি বিলীন হইতেছে। যদি গঙ্গার অতলজলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই বঙ্গলক্ষ্মী কোথায় গেলেন—

যখন রন্ধনশালাতে যাই,
তুয়া বঁধু গুণ গাই,
কাব্যের ছলনা করি কাঁদি।

ত্রয়োদশ সংখ্যা।

বিড়াল।

আমি শয়নগৃহে, চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুকা হাতে, ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে—দেয়া-

লের উপর ছঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই—এজন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিত লোচনে আমি ভাবিতেছিলাম, যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটর্লু জিতিতে পারিতাম কি না। এমত সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, "মেও!"

চাহিয়া দেখিলাম—হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিঙ্গ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষাণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম, যে ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্ব্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ, অপরিমিত লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, "মেও!"

তখন চক্ষু চাহিয়া, ভাল করিয়া দেখিলাম,

যে ওয়েলিংটন নহে। একটী ক্ষুদ্র মার্জ্জার; প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে; আমি তখন ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই। এক্ষণে মার্জ্জার সুন্দরী, নির্জ্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এজগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে, বলিতেছিলেন, "মেও।" বলিতে পারি না, বুঝি, তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি মার্জ্জার মনে২ হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, "কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।" বুঝি সে "মেও!" শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল। বুঝি বিড়ালের মনের ভাব, "তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি—এখন বল কি?"

বলি কি? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম

না। দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে, যে, বিড়ালে দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কি জানি এই মার্জ্জারী যদি স্বজাতিমণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতরচিত্তে, হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্ব্বে মার্জ্জারী প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জ্জারী কমলাকান্তকে চিনিত; সে

দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, একটু সরিয়া বসিল। বলিল "মেও!" প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া, হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া,মার্জ্জারের বক্তব্য সকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম, যে বিড়াল বলিতেছে "মার পিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি? এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস, সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে—আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লাঠি লইয়া মারিতে আইস,

তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পাদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয় সকল দেখিয়া আমার বোধ হয় তোমরা এতদিনে এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।

"দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল—অতএব তুমি সেই পরম ধর্ম্মের ফলভাগী। আমি চুরিই করি, আর যাই করি, আমি তোমার ধর্ম্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্ম্মের সহায়!

"দেখ আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি

সাধ করিয়া চোর হইয়াছি! খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোরের অপেক্ষাও অধার্ম্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম্ম চোরের নহে—চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?

"দেখ আমি প্রাচীরে প্রাচীরে, মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত, নরদামায় ফেলিয়া দেয়, জলে

ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কিপ্রকারে জানিবে! হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মত দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখন অন্ধকে মুষ্টি ভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না—সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোটলোকের দুঃখে কাতর! ছি! কে হইবে?

"দেখ যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার, আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং যোড় হাত করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁ-

হারা অতি পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী ? তা ত নয়—তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর—আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর,—ছি ! ছি !

"দেখ আমাদিগের দশা দেখ, দেখ প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারিদিক্ দৃষ্টি করিতেছি—কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল—গৃহমার্জ্জার হইয়া, বৃদ্ধের নিকট যুবতী ভার্য্যার সহোদর, বংশজের নিকট কুলীন জামাতা, বা

মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলওয়ারের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল—তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয়, এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া অনেক মার্জ্জার কবি হইয়া পড়ে।

"আর আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে—জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি 'মেও! মেও! খাইতে পাই না!—" আমাদের কাল চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব।' আমাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণসকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে,

ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী, কেন না আফিঙ্গখোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না, যে ধনীর দোষেই দরিদ্রে চোর হয়? পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচশত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন না অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।”

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, “থাম! থাম মার্জ্জারপণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিষ্টিক! সমাজ বিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে

না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

মার্জ্জার বলিল, "না হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি?"

আমি বুঝাইয়া বলিলাম, যে "সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।" বিড়াল রাগ করিয়া বলিল, যে "আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?"

বিড়ালকে বুঝান দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিন কালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জ্জার সুবিচারক, এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, "সমা-

জের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্ত্তব্য।”

মার্জ্জারী মহাশয়া বলিলেন, “চোরকে ফাঁসি দেও, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিনদিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি সচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিনদিন উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে নশীবাবুর ভাণ্ডার ঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।”

বিজ্ঞলোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ

প্রদানারম্ভ করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জ্জারকে বলিলাম, যে “এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এসকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউমান ও পার্করের গ্রন্থ দিতে পারি। আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে—আর কিছু হউক বা না হউক অফিঙ্গের অসীম মহিমা বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর; প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীরা হও, তবে পুনর্ব্বার আসিও, এক সরিষাভোর আফিঙ্গ দিব।”

মার্জ্জার বলিল “আফিঙ্গে বিশেষ প্রয়ো-

জন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।”

মার্জ্জার বিদায় হইল। একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্ত পাদ্রির বড় আনন্দ হইল।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

লোকরহস্য।

১২৭৯।৮০ সালের

বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত

কৌতুক ও রহস্য

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

কাঁটালপাড়া।

বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৭৪।

সূচিপত্র।

বিজ্ঞাপন।

এই গ্রন্থে বঙ্গদর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড হইতে কয়েকটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইল। এতৎ সম্বন্ধে একটি মাত্র কথা বলা আবশ্যক। বঙ্গদেশের সাধারণ পাঠকের এইরূপ সংস্কার আছে যে রহস্য মাত্র গালি, গালি ভিন্ন রহস্য নাই। সুতরাং তাঁহারা বিবেচনা করেন, যে এই সকল প্রবন্ধে যে কিছু ব্যঙ্গ আছে, তাহা ব্যক্তি বিশেষকে গালি দেওয়া মাত্র। এই শ্রেণীর পাঠক দিগের নিকট নিবেদন যে তাঁহাদের জন্য এ গ্রন্থ লিখিত হয় নাই—তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এ গ্রন্থ পাঠ না করিলেই আমি কৃতার্থ হইব।

সামাজিক যে সকল দোষ তাহাতে রহস্য লেখকের অধিকার সম্পূর্ণ। ব্যক্তি বিশেষের যে দোষ, তাহাকে রহস্য লেখকের কোন অধিকার নাই—কদাচিৎ অবস্থা বিশেষে অধিকার জন্মে; যথা, ভ্রান্ত রাজপুরুষের ভ্রান্তি জনিত কার্য্যের প্রতি, অথবা মূর্খ গ্রন্থ কর্ত্তার গ্রন্থের প্রতি, রহস্য প্রযুজ্য। এ গ্রন্থের সে সকল উদ্দেশ্য নহে। এ গ্রন্থে শ্রেণী বিশেষ, বা সাধারণ মনুষ্য, ব্যতীত ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কোন ইঙ্গিত নাই।

লোকরহস্য।

ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল।

একদা সুন্দরবন মধ্যে ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা সমবেত হইয়াছিল। নিবিড় বনমধ্যে প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে ভীমাকৃতি বহুতর ব্যাঘ্র লাঙ্গুলে ভর করিয়া, দংষ্ট্রাপ্রভায় অরণ্য প্রদেশ আলোকময় করিয়া, সারি সারি উপবেশন করিয়াছিল। সকলে একমত হইয়া অমিতোদর নামে এক অতি প্রাচীন ব্যাঘ্রকে সভাপতি করিলেন। অমিতোদর মহাশয় লাঙ্গুলাসন গ্রহণ পূর্ব্বক, সভার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি সভ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন;—

"অদ্য আমাদিগের কি শুভ দিন! অদ্য আমরা যত অরণ্যবাসী মাংসাভিলাষী ব্যাঘ্রকুলতিলক সকল পরস্পরের মঙ্গল সাধনার্থ এই অরণ্যমধ্যে একত্রিত হইয়াছি।

আহা! কুৎসাকারী, খলস্বভাব অন্যান্য পশুবর্গে রটনা করিয়া থাকে যে, আমরা বড় অসামাজিক, একা এক বনেই বাস করিতে ভাল বাসি, আমাদের মধ্যে ঐক্য নাই। কিন্তু অদ্য আমরা সমস্ত সুসভ্য ব্যাঘ্রমণ্ডলী একত্রিত হইয়া সেই অমূলক নিন্দাবাদের নিরাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! এক্ষণে সভ্যতার যেরূপ দিন২ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ আশা আছে যে, শীঘ্রই ব্যাঘ্রেরা সভ্যজাতির অগ্রগণ্য হইয়া উঠিবে। এক্ষণে বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনারা দিন২ এইরূপ জাতিহিতৈষিতা প্রকাশ পূর্ব্বক পরম সুখে নানাবিধ পশুহনন করিতে থাকুন।" (সভা মধ্যে লাঙ্গূল চট্‌চটারব।)

"এক্ষণে হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আমরা যে প্রয়োজন সম্পাদনার্থ সমবেত হইয়াছি, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করি। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, এই সুন্দর-বনের ব্যাঘ্রসমাজে বিদ্যার চর্চ্চা ক্রমে লোপ পাইতেছে। আমাদিগের বিশেষ অভিলাষ হইয়াছে, আমরা বিদ্বান্ হইব। কেননা আজি কালি সকলেই বিদ্বান্ হইতেছে। আমরাও হইব। বিদ্যার আলোচনার জন্য এই ব্যাঘ্রসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে, আমার বক্তব্য এই যে, আপনারা ইহার অনুমোদন করুন।"

সভাপতির এই বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, সভ্যগণ হাউ-মাউ শব্দে এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তখন যথারীতি কয়েকটী প্রস্তাব পঠিত এবং অনুমোদিত হইয়া সভ্যগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইল। প্রস্তাবের সঙ্গে২ দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা হইল। সে সকল ব্যাকরণশুদ্ধ এবং অলঙ্কার বিশিষ্ট বটে, তাহাতে শব্দ বিন্যাসের ছটা বড় ভয়ঙ্কর; বক্তৃতার চোটে সুন্দরবন কাঁপিয়া গেল।

পরে সভার অন্যান্য কার্য্য হইলে, সভাপতি বলিলেন, "আপনারা জানেন যে, এই সুন্দরবনে বৃহল্লাঙ্গূল নামে এক অতি পণ্ডিত ব্যাঘ্র বাস করেন। অদ্য রাত্রে তিনি আমাদিগের অনুরোধে মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে স্বীকার করিয়াছেন।"

মনুষ্যের নাম শুনিয়া কোন২ নবীন সভ্য ক্ষুধা বোধ করিলেন। কিন্তু তৎকালে পব্লিক ডিনরের সূচনা না দেখিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গূল মহাশয় সভাপতি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া, গর্জ্জন পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন। এবং পথিকের ভীতিবিধায়ক স্বরে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী পাঠ করিলেন;—

"সভাপতি মহাশয়! বাঘিনীগণ! এবং ভদ্র ব্যাঘ্রগণ! মনুষ্য এক প্রকার দ্বিপদ জন্তু। তাহারা পক্ষবিশিষ্ট

নহে, সুতরাং তাহাদিগকে পাখী বলা যায় না। বরং চতুষ্পদগণের সঙ্গে তাহাদিগের সাদৃশ্য আছে। চতুষ্পদগণের যেং অঙ্গ, যেং অস্থি আছে, মনুষ্যেরও সেই রূপ আছে। অতএব মনুষ্যদিগকে এক প্রকার চতুষ্পদ বলা যায়। প্রভেদ এই যে, চতুষ্পদের যেরূপ পুচ্ছের পারিপাট্য, মনুষ্যের তাদৃশ নাই। কেবল ঈদৃশ প্রভেদের জন্য আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে যে, আমরা মনুষ্যকে দ্বিপদ বলিয়া ঘৃণা করি।

চতুষ্পদমধ্যে বানরদিগের সঙ্গে মনুষ্যগণের বিশেষ সাদৃশ্য। পণ্ডিতেরা বলেন যে, কালক্রমে পশুদিগের অবয়বের উৎকর্ষ জন্মিতে থাকে; এক অবয়বের পশু ক্রমে অন্য উৎকৃষ্টতর পশুর আকার প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের ভরসা আছে যে, মনুষ্য-পশুও কালপ্রভাবে লাঙ্গুলাদি বিশিষ্ট হইয়া ক্রমে বানর হইয়া উঠিবে।

মনুষ্য-পশু যে অত্যন্ত সুস্বাদু এবং সুভক্ষ্য, তাহা আপনারা বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন। (শুনিয়া সভ্যগণ সকলে আপনং মুখ চাটিলেন।) তাহারা সচরাচর অনায়াসেই মারা পড়ে। মৃগাদির ন্যায় তাহারা দ্রুত পলায়নে সক্ষম নহে, অথচ মহিষাদির ন্যায় বলবান্ বা শৃঙ্গাদি আয়ুধ-যুক্ত নহে। জগদীশ্বর এই জগৎ সংসার

ব্যাঘ্র জাতির সুখের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সেই জন্য ব্যাঘ্রের উপাদেয় ভোজ্য পশুকে পলায়নের বা রক্ষার ক্ষমতা পর্য্যন্ত দেন নাই। বাস্তবিক মনুষ্যজাতি যেরূপ অরক্ষিত—নখ দন্ত শৃঙ্গাদি বর্জ্জিত, গমনে মন্থর এবং কোমল প্রকৃতি, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে, কি জন্য ঈশ্বর ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্যাঘ্র জাতির সেবা ভিন্ন ইহাদিগের জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না।

এই সকল কারণে, বিশেষ তাহাদিগের মাংসের কোমলতা হেতু, আমরা মনুষ্য জাতিকে বড় ভাল বাসি। দৃষ্টি মাত্রেই ধরিয়া খাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারাও বড় ব্যাঘ্রভক্ত। এই কথায় যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন, তবে তাহার উদাহরণ স্বরূপ আমার যাহা ঘটিয়াছিল, তদ্বৃত্তান্ত বলি। আপনারা অবগত আছেন, আমি বহুকালাবধি দেশ ভ্রমণ করিয়া বহুদর্শী হইয়াছি। আমি যে দেশে প্রবাসে ছিলাম, সে দেশ এই ব্যাঘ্রভূমি সুন্দরবনের উত্তরে আছে। তথায় গো মনুষ্যাদি ক্ষুদ্রাশয় অহিংস্র পশুগণই বাস করে। তথাকার মনুষ্য দ্বিবিধ; এক জাতি কৃষ্ণবর্ণ, এক জাতি শ্বেতবর্ণ। একদা আমি সেই দেশে বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে গমন করিয়াছিলাম।”

শুনিয়া মহাদংষ্ট্রানামে এক জন উদ্ধতস্বভাব ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"বিষয় কর্ম্মটা কি?"

বৃহল্লাঙ্গূল মহাশয় কহিলেন, "বিষয় কর্ম্ম, আহারান্বেষণ। এখন সভ্যলোকে আহারান্বেষণকে বিষয় কর্ম্ম বলে। ফলে সকলেই যে আহারান্বেষণকে বিষয় কর্ম্ম বলে, এমত নহে। সম্ভ্রান্ত লোকের আহারান্বেষণের নাম বিষয় কর্ম্ম, অসম্ভ্রান্তের আহারান্বেষণের নাম জুয়াচুরি, উঞ্ছবৃত্তি এবং ভিক্ষা। ধূর্ত্তের আহারান্বেষণের নাম চুরি; বলবানের আহারান্বেষণ দস্যুতা; লোকবিশেষে দস্যুতা শব্দ ব্যবহার হয় না; তৎপরিবর্ত্তে বীরত্ব বলিতে হয়। যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা আছে, সেই দস্যুর কার্য্যের নাম দস্যুতা; যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা নাই, তাহার দস্যুতার নাম বীরত্ব। আপনারা, যখন সভ্যসমাজে অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন এই সকল নামবৈচিত্র স্মরণ রাখিবেন, নচেৎ লোকে অসভ্য বলিবে। বস্তুতঃ আমার বিবেচনায় এত বৈচিত্রের প্রয়োজন নাই; এক উদরপূজা নাম রাখিলেই বীরত্বাদি সকলই বুঝাইতে পারে।

সে যাহাই হউক, যাহা বলিতেছিলাম শ্রবণ করুন। মনুষ্যেরা বড় ব্যাঘ্রভক্ত। আমি একদা মনুষ্যবসতি মধ্যে

বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে গিয়াছিলাম। শুনিয়াছেন, কয়েক বৎসর হইল এই সুন্দরবনে পোর্টক্যানিং কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছিল।”

মহাদংষ্ট্রা পুনর্বায় বক্তৃতা বন্ধ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি কিরূপ জন্তু?”

বৃহল্লাঙ্গূল কহিলেন, “তাহা আমি সবিশেষ অবগত নহি। ঐ জন্তুর আকার হস্তপদাদি কিরূপ, জিঘাংসাই বা কেমন ছিল, ঐ সকল আমরা অবগত নহি। শুনিয়াছি, ঐ জন্তু মনুষ্যের প্রতিষ্ঠিত; মনুষ্যদিগেরই হৃদয়-শোণিত পান করিত: এবং তাহাতে বড় মোটা হইয়া মরিয়া গিয়াছে। মনুষ্যজাতি অত্যন্ত অপরিণামদর্শী। আপন২ বধোপায় সর্ব্বদা আপনারাই সৃজন করিয়া থাকে। মনুষ্যেরা যে সকল অস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকে, সেই সকল অস্ত্রই এ কথার প্রমাণ। মনুষ্যবধই ঐ সকল অস্ত্রের উদ্দেশ্য। শুনিয়াছি, কখন২ সহস্র২ মনুষ্য প্রান্তরমধ্যে সমবেত হইয়া ঐ সকল অস্ত্রাদির দ্বারা পরস্পর প্রহার করিয়া বধ করে। আমার বোধ হয়, মনুষ্যগণ পরস্পরের বিনাশার্থ এই পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি নামক রাক্ষসের সৃজন করিয়াছিল। সে যাহাই হউক, আপনারা স্থির হইয়া এই মনুষ্য-বৃত্তান্ত শ্রবণ ক-

রুন্। মধ্যে২ রসভঙ্গ করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে বক্তৃতা হয় না। সভ্যজাতিদিগের এরূপ নিয়ম নহে। আমরা এক্ষণে সভ্য হইয়াছি, সকল কাজে সভ্যদিগের নিয়মানুসারে চলা ভাল।

আমি একদা সেই পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির বাসস্থান মাতলায় বিষয়-কর্ম্মোপলক্ষে গিয়াছিলাম। তথায় এক বংশমণ্ডপ-মধ্যে একটা কোমল মাংসযুক্ত নৃত্যশীল ছাগবৎস দৃষ্টি করিয়া তদাস্বাদনার্থ মণ্ডপ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। ঐ মণ্ডপ ভৌতিক—পশ্চাৎ জানিয়াছি, মনুষ্যেরা উহাকে ফাঁদ বলে। আমার প্রবেশ মাত্র আপনা হইতে তাহার দ্বার রুদ্ধ হইল। কতক গুলি মনুষ্য তৎপরে সেই খানে উপস্থিত হইল। তাহারা আমার দর্শন পাইয়া পরমানন্দিত হইল, এবং আহ্লাদসূচক চীৎকার, হাসা, পরিহাসাদি করিতে লাগিল। তাহারা যে আমার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কেহ আমার আকারের প্রশংসা করিতেছিল, কেহ আমার দন্তের, কেহ নখের, কেহ লাঙ্গূলের গুণগান করিতে লাগিল। এবং অনেকে আমার উপর প্রীত হইয়া, পত্নীর সহোদরকে যে সম্বোধন করে, আমাকে সেই প্রিয়সম্বোধন করিল। পরে তাহারা ভক্তিভাবে

আমাকে মণ্ডপ-সমেত স্কন্ধে বহন করিয়া, এক শকটের উপর উঠাইল। দুই অমলশ্বেতকান্তি বলদ ঐ শকট বহন করিতেছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া আমার বড় ক্ষুধাব উদ্রেক হইল। কিন্তু তৎকালে ভৌতিক মণ্ডপ হইতে বাহির হইবার উপায় ছিল না, এ জন্য অর্দ্ধভুক্ত ছাগে তাহা পরিতৃপ্ত করিলাম। আমি সুখে শকটারোহণ করিয়া, ছাগমাংস ভক্ষণ করিতে২ এক নগরবাসী শ্বেতবর্ণ মনুষ্যের আবাসে উপস্থিত হইলাম। সে আমার সম্মানার্থ স্বয়ং দ্বারদেশে আসিয়া আমার অভ্যর্থনা করিল। এবং লৌহদণ্ডাদিভূষিত এক সুরম্য গৃহমধ্যে আমার আবাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল। তথায় সজীব বা সদ্য হত ছাগ মেষ গবাদির উপাদেয় মাংস শোণিতের দ্বারা আমার সেবা করিত। অন্যান্য দেশ বিদেশীয় বহুতর মনুষ্য আমাকে দর্শন করিতে আসিত, আমিও বুঝিতে পারিতাম যে, উহারা আমাকে দেখিয়া চরিতার্থ হইত।

আমি বহুকাল ঐ লৌহজালাবৃত প্রকোষ্ঠে বাস করিলাম। ইচ্ছা ছিল না যে, সে সুখ ত্যাগ করিয়া আর ফিরিয়া আসি। কিন্তু স্বদেশ-বাৎসল্য প্রযুক্ত থাকিতে পারিলাম না। আহা! যখন এই জন্মভূমি আমার মনে

পড়িত, তখন আমি হাউ হাউ করিয়া ডাকিতে থাকিতাম। হে মাতঃ সুন্দরবন! আমি কি তোমাকে কখন ভুলিতে পারিব? আহা! তোমাকে যখন মনে পড়িত, তখন আমি ছাগমাংস ত্যাগ করিতাম, মেষ মাংস ত্যাগ করিতাম! (অর্থাৎ অস্থি এবং চর্ম্ম মাত্র ত্যাগ করিতাম)—এবং সর্ব্বদা লাঙ্গুলাঘাতের দ্বারা আপনার অন্তঃকরণের চিন্তা লোককে জানাইতাম। হে জন্মভূমি! যত দিন আমি তোমাকে দেখি নাই, তত দিন ক্ষুধা না পাইলে খাই নাই, নিদ্রা না আসিলে নিদ্রা যাই নাই। দুঃখের অধিক পরিচয় আর কি দিব, পেটে যাহা ধরিত, তাহাই খাইতাম, তাহার উপর আর দুই চারি সের মাত্র মাংস খাইতাম। আর খাইতাম না।”

তখন বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয়, জন্মভূমির প্রেমে অভিভূত হইয়া অনেক ক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। বোধ হইল, তিনি অশ্রুপাত করিতেছিলেন, এবং দুই এক বিন্দু স্বচ্ছ ধারা পতনের চিহ্ন ভূতলে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু কতিপয় যুবা ব্যাঘ্র তর্ক করেন যে, সে বৃহল্লাঙ্গুলের অশ্রুপাতনের চিহ্ন নহে। মনুষ্যালয়ের প্রচুর আহারের কথা স্মরণ হইয়া সেই ব্যাঘ্রের মুখে লাল পড়িয়াছিল।

লেকচরর তখন ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইয়া পুনরপি বলিতে

আরম্ভ করিলেন, "কি প্রকারে আমি সেই স্থান ত্যাগ করিলাম, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমার অভি-প্রায় বুঝিয়াই হউক, আর ভুল ক্রমেই হউক, আমার ভৃত্য এক দিন আমার মন্দির-মার্জ্জনান্তে, দ্বার মুক্ত রাখিয়া গিয়াছিল। আমি সেই দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া উদ্যানরক্ষককে মুখে করিয়া লইয়া চলিয়া আসিলাম।

এই সকল বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলার কারণ এই যে, আমি বহুকাল মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া আসিয়াছি—মনুষ্য চরিত্র সবিশেষ অবগত আছি—শুনিয়া আপনারা আমার কথায় বিশেষ আস্থা করিবেন, সন্দেহ নাই। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিব। অন্য পর্য্যটকদিগের ন্যায় অমূলক উপন্যাস বলা আমার অভ্যাস নাই। বিশেষ, মনুষ্যসম্বন্ধে অনেক উপন্যাস আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি; আমি সে সকল কথায় বিশ্বাস করি না। আমরা পূর্ব্বাপর শুনিয়া আসিতেছি যে, মনুষ্যেরা ক্ষুদ্র-জীবী হইয়াও পর্ব্বতাকার বিচিত্র গৃহ নির্ম্মাণ করে। ঐরূপ পর্ব্বতাকার গৃহে তাহারা বাস করে বটে, কিন্তু কখন তাহাদিগকে ঐরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আমি চক্ষে দেখি নাই। সুতরাং তাহারা যে ঐরূপ গৃহ স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, ইহার প্রমাণাভাব। আমার বোধ হয় তা-

হারা যে সকল গৃহে বাস করে, তাহা প্রকৃত পর্ব্বত বটে, স্বভাবের সৃষ্টি; তবে তাহা বহু গুহাবিশিষ্ট দেখিয়া বুদ্ধিজীবী মনুষ্যপশু তাহাতে আশ্রয় করিয়াছে।*

মনুষ্য জন্তু উভয়াহারী। তাহারা মাংসভোজী; এবং ফলমূলও আহার করে। বড়২ গাছ খাইতে পারে না; ছোট২ গাছ সমূলে আহার করে। মনুষ্যেরা ছোটগাছ এত ভালবাসে যে, আপনারা তাহাব চাস করিয়া ঘেরিয়া রাখে। ঐরূপ রক্ষিত ভূমিকে ক্ষেত বা বাগান বলে। এক মনুষ্যের বাগানে অন্য মনুষ্য চরিতে পায় না।

মনুষ্যেরা. ফল মূল লতা গুল্মাদি ভোজন করে বটে, কিন্তু ঘাস খায় কি না, বলিতে পারি না। কখন কোন মনুষ্যকে ঘাস খাইতে দেখি নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কিছু সংশয় আছে। শ্বেতবর্ণ মনুষ্যেরা এবং কৃষ্ণবর্ণ ধনবান্ মনুষ্যেরা বহুযত্নে আপন২ উদ্যানে ঘাস

* পাঠক মহাশয় বৃহল্লাঙ্গূলের ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। এইরূপ তর্কে মাক্ষমূলর স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা লিখিতে জানিতেন না। এইরূপ তর্কে জেমস মিল স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা অসভ্য জাতি, এবং সংস্কৃত ভাষা রূঢ় ভাষা। বস্তুতঃ এই ব্যাঘ্র পণ্ডিতে এবং মনুষ্য পণ্ডিতে অধিক বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না।

তৈয়ার করে। আমার বিবেচনায় উহারা ঐ ঘাস খাইয়া থাকে। নহিলে ঘাসে তাহাদের এত যত্ন কেন? এরূপ আমি একজন কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যের মুখে শুনিয়াছিলাম। সে বলিতেছিল, 'দেশটা উচ্ছন্ন গেল—যত সাহেব সুবো বড় মানুষে বসে বসে ঘাস খাইতেছে!' সুতরাং প্রধান মনুষ্যেরা যে ঘাস খায়, তাহা এক প্রকার নিশ্চয়।

কোন মনুষ্য বড় ক্রুদ্ধ হইলে বলিয়া থাকে, 'আমি কি ঘাস খাই?' আমি জানি, মনুষ্যদিগের স্বভাব এই, তাহারা যে কাজ করে, অতি যত্নে তাহা গোপন করে। অতএব যেখানে তাহারা ঘাস খাওয়ার কথায় রাগ করে, তখন অবশ্য সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তাহারা ঘাস খাইয়া থাকে।

মনুষ্যেরা পশু পূজা করে। আমার যে প্রকার পূজা করিয়াছিল, তাহা বলিয়াছি। অশ্বদিগেরও উহারা ঐরূপ পূজা করিয়া থাকে; অশ্বদিগকে আশ্রয় দান করে, আহার যোগায়, গাত্র ধৌত ও মার্জ্জনাদি করিয়া দেয়। বোধ হয়, অশ্ব মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ পশু বলিয়াই মনুষ্যেরা তাহার পূজা করে।

মনুষ্যেরা ছাগ, মেষ গবাদিও পালন করে। গো সম্বন্ধে তাহাদের এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গিয়াছে;

তাহারা গোরুর দুগ্ধ পান করে। ইহাতে পূর্ব্বকালের বানর পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মনুষ্যেরা কোন কালে গোরুর বৎস ছিল। আমি তত দূর বলি না, কিন্তু এই কারণেই বোধ করি, গোরুর সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিগত সাদৃশ্য দেখা যায়।

সে যাহাই হউক, মনুষ্যেরা আহারের সুবিধার জন্য, গোরু, ছাগল এবং মেষ পালন করিয়া থাকে। ইহা এক সুরীতি, সন্দেহ নাই। আমি মানস করিয়াছি, প্রস্তাব করিব যে; আমরাও মানুষের গোহাল প্রস্তুত করিয়া মনুষ্য পালন করিব।

গো, অশ্ব, ছাগ ও মেষের কথা বলিলাম। ইহা ভিন্ন, হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, কুক্কুর, বিড়াল, এমন কি, পক্ষী পর্য্যন্ত তাহাদের কাছে সেবা প্রাপ্ত হয়। অতএব মনুষ্য জাতিকে সকল পশুর ভৃত্য বলিলেও বলা যায়।

মনুষ্যালয়ে অনেক বানরও দেখিলাম। সে সকল বানর দ্বিবিধ; এক সলাঙ্গুল, অপর লাঙ্গুলশূন্য। সলাঙ্গুল বানরেরা প্রায় ছাদের উপর, না হয় গাছের উপর থাকে। নীচেও অনেক বানর আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ বানরই উচ্চপদস্থ। বোধ হয়, বংশমর্য্যাদা বা জাতিগৌরব ইহার কারণ।

মনুষ্য চরিত্র অতি বিচিত্র। তাহাদের মধ্যে বিবাহের যে রীতি আছে, তাহা অত্যন্ত কৌতুকাবহ। তদ্ভিন্ন, তাহাদিগের রাজনীতিও অত্যন্ত মনোহর। ক্রমে২ তাহা বিবৃত করিতেছি।"

এই পর্য্যন্ত প্রবন্ধ পঠিত হইলে, সভাপতি অমিতোদর, দূরে একটি হরিণশিশু দেখিতে পাইয়া, চেয়ার হইতে লাফ দিয়া তদনুসরণে ধাবিত হইলেন। অমিতোদর এইরূপ দূরদর্শী বলিয়াই সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাপতিকে অকস্মাৎ বিদ্যালোচনায় বিমুখ দেখিয়া, প্রবন্ধপাঠক কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া একজন বিজ্ঞ সভ্য তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন না, সভাপতি মহাশয় বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে দৌড়িয়াছেন। হরিণের পাল আসিয়াছে, আমি ঘ্রাণ পাইতেছি।"

এই কথা শুনিবামাত্র মহাবিজ্ঞ সভ্যেরা লাঙ্গুলোত্থিত করিয়া, যিনি যে দিকে পারিলেন, সেই দিকে বিষয় কর্ম্মের চেষ্টায় ধাবিত হইলেন। লেক্‌চররও এই বিদ্যার্থীদিগের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইলেন। এইরূপে সে দিন ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা অকালে ভঙ্গ হইল।

পরে তাঁহারা অন্য এক দিন, সকলে পরামর্শ করিয়া

আহারান্তে সভার অধিবেশন করিলেন। সে দিন নির্ব্বিঘ্নে সভার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ পঠিত হইল। তাহার বিজ্ঞাপনী প্রাপ্ত হইলে, আমরা প্রকাশ করিব।

ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গূল।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

সভাপতি মহাশয়, বাঘিনীগণ, এবং ভদ্র ব্যাঘ্রগণ।

আমি প্রথম বক্তৃতায় অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, মানুষের বিবাহপ্রণালী এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিব। ভদ্রের অঙ্গীকার পালনই প্রধান ধর্ম্ম। অতএব আমি একবারেই আমার বিষয়ে প্রবেশ করিলাম।

বিবাহ কাহাকে বলে, আপনারা সকলেই অবগত আছেন। সকলেই মধ্যে ২ অবকাশ মতে বিবাহ করিয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্যবিবাহে কিছু বৈচিত্র্য আছে। ব্যাঘ্র প্রভৃতি সভ্য পশুদিগের দারপরিগ্রহ কেবল প্রয়োজনাধীন, মনুষ্যপশুর সেরূপ নহে—তাহাদের মধ্যে অনেকেই এক কালীন জন্মের মত বিবাহ করিয়া রাখে।

মনুষ্যবিবাহ দ্বিবিধ—নিত্য এবং নৈমিত্তিক। তন্মধ্যে নিত্য অথবা পৌরোহিত বিবাহই মান্য। পুরোহিতকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাই পৌরোহিত বিবাহ।

মহাদংষ্ট্র।—পুরোহিত কি ?

বৃহল্লাঙ্গুল।—অভিধানে লেখে, পুরোহিত চালকলাভোজী বঞ্চনাব্যবসায়ী মনুষ্য বিশেষ। কিন্তু এই ব্যাখ্যা দুষ্ট। কেননা সকল পুরোহিত চালকলাভোজী নহে; অনেক পুরোহিত মদ্য মাংস খাইয়া থাকেন; অনেক পুরোহিত সর্ব্বভুক্। পক্ষান্তরে, চাল কলা খাইলেই পুরোহিত হয়, এমত নহে। বারাণসী নামক নগরে অনেক গুলিন যাঁড় আছে—তাহারা চালকলা খাইয়া থাকে। তাহারা পুরোহিত নহে, তাহার কারণ, তাহারা বঞ্চক নহে। বঞ্চকে যদি চালকলা খায়, তাহা হইলেই পুরোহিত হয়।

পৌরোহিত বিবাহে এই রূপ এক জন পুরোহিত বরকন্যার মধ্যবর্ত্তী হইয়া বসে। বসিয়া কতক গুলা বকে। এই বক্তৃতাকে মন্ত্র বলে। তাহার অর্থ কি, আমি সবিশেষ অবগত নহি, কিন্তু আমি যেরূপ পণ্ডিত, তাহাতে ঐ

সকল মন্ত্রের এক প্রকার অর্থ মনে মনে অনুভূত করিয়াছি। বোধ হয়, পুরোহিত বলে,

"হে বরকন্যে! আমি আজ্ঞা করিতেছি, তোমরা বিবাহ কর। তোমরা বিবাহ করিলে, আমি নিত্য চাল কলা পাইব—অতএব তোমরা বিবাহ কর। এই কন্যার গর্ব্ভাধানে, সীমন্তোন্নয়নে, সূতিকাগারে, চালকলা পাইব—অতএব তোমরা বিবাহ কর। সন্তানের ষষ্ঠীপূজায়, অন্নপ্রাশনে, কর্ণবেধে, চূড়াকরণে বা উপনয়নে—অনেক চাল কলা পাইব, অতএব তোমরা বিবাহ কর। তোমরা সংসারধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, সর্ব্বদা ব্রত নিয়মে, পূজা পার্ব্বণে, যাগ যজ্ঞে, রত হইবে, সুতরাং আমি অনেক চাল কলা পাইব; অতএব তোমরা বিবাহ কর। বিবাহ কর, কখন এ বিবাহ রহিত করিও না। যদি রহিত কর, তবে আমার চাল কলার বিশেষ বিঘ্ন হইবে। তাহা হইলে এক২ চপেটাঘাতে তোমাদের মুণ্ডপাত করিব। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের এইরূপ আজ্ঞা।"

বোধ হয়, এই শাসনের জন্যই পৌরোহিত বিবাহ কখন রহিত হয় না।

আমাদিগের মধ্যে যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহাকে নৈমিত্তিক বিবাহ বলা যায়। মনুষ্য মধ্যে এরূপ

বিবাহও সচরাচর প্রচলিত। অনেক মনুষ্য এবং মানুষী, নিত্য নৈমিত্তিক উভয়বিধ বিবাহ করিয়া থাকে। কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ প্রভেদ এই, যে নিত্য বিবাহ কেহ গোপন করে না, নৈমিত্তিক বিবাহ সকলেই প্রাণপণে গোপন করে। যদি এক জন মনুষ্য অন্য মনুষ্যের নৈমিত্তিক বিবাহের কথা জানিতে পারে, তাহা হইলে কখন কখন তাহাকে ধরিয়া প্রহার করে। আমার বিবেচনায় পুরোহিতেরাই এই অনর্থের মূল। নৈমিত্তিক বিবাহে তাহারা চাল কলা পায় না—সুতরাং ইহার দমনই তাহাদের উদ্দেশ্য—তাহাদের শিক্ষা মতে সকলেই নৈমিত্তিকবিবাহকারীকে ধরিয়া প্রহার করে। কিন্তু বিশেষ চমৎকার এই, যে অনেকেই গোপনে স্বয়ং নৈমিত্তিক বিবাহ করে, অথচ পরকে নৈমিত্তিক বিবাহ করিতে দেখিলে ধরিয়া প্রহার করে!

ইহাতে আমার বিবেচনা হইতেছে যে, অনেক মনুষ্যই নৈমিত্তিক বিবাহে সম্মত, তবে পুরোহিত প্রভৃতির ভয়ে মুখ ফুটিতে পারে না। আমি মনুষ্যালয়ে বাস কালীন জানিয়া আসিয়াছি, অনেক উচ্চ শ্রেণীস্থ মনুষ্যের নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ আদর। যাঁহারা আমাদিগের ন্যায় সুসভ্য, সুতরাং পশুবৃত্ত, তাঁহারাই এ বিষয়ে আমাদি-

গের অনুকরণ করিয়া থাকেন। আমার এমনও ভরসা আছে যে, কালে মনুষ্যজাতি আমাদিগের ন্যায় সুসভ্য হইলে, নৈমিত্তিক বিবাহ তাহাদের মধ্যে সমাজসম্মত হইবে। অনেক মনুষ্যপণ্ডিত তৎপক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক গ্রন্থাদি লিখিতেছেন। তাঁহারা স্বজাতিহিতৈষী, সন্দেহ নাই। আমার বিবেচনায়, সম্মানবর্দ্ধনার্থ তাঁহাদিগকে এই ব্যাঘ্রসমাজের অনরারি মেম্বর নিযুক্ত করিলে ভাল হয়। ভরসা করি, তাঁহারা সভাস্থ হইলে, আপনারা তাঁহাদিগকে জলযোগ করিবেন না। কেননা তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় নীতিজ্ঞ এবং লোকহিতৈষী।

মনুষ্যমধ্যে বিশেষ এক প্রকার নৈমিত্তিক বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাকে মৌদ্রিক বিবাহ বলা যাইতে পারে। এ প্রকার বিবাহ সম্পন্নার্থ মানুষ মুদ্রার দ্বারা কোন মানুষীর করতল সংস্পৃষ্ট করে। তাহা হইলেই মৌদ্রিক বিবাহ সম্পন্ন হয়।

মহাদংষ্ট্রা। মুদ্রা কি?

বৃহল্লাঙ্গুল। মুদ্রা মনুষ্যদিগের পূজ্য দেবতা বিশেষ। যদি আপনাদিগের কৌতূহল থাকে, তবে আমি সবিশেষে সেই মহাদেবীর গুণ কীর্ত্তন করি। মনুষ্য যত দেবতার পূজা করে, তন্মধ্যে ইহার প্রতিই তাহাদের বিশেষ

ভক্তি। ইনি সাকারা। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্রে ইহার প্রতিমা নির্ম্মিত হয়। লৌহ, টিন এবং কাষ্ঠে ইহাঁর মন্দির প্রস্তুত করে। রেশম, পশম, কার্পাস, চর্ম্ম প্রভৃতিতে ইহার সিংহাসন রচিত হয়। মানুষ গণ রাত্রিদিন ইহার ধ্যান করে, এবং কিসে ইহার দর্শন প্রাপ্ত হইবে, সেই জন্য সর্ব্বদা শশব্যস্ত হইয়া বেড়ায়। যে বাড়ীতে টাকা আছে জানে, অহরহ সেই বাড়ীতে মনুষ্যেরা যাতায়াত করিতে থাকে,—এমনই ভক্তি, কিছুতেই সে বাড়ী ছাড়ে না—মারিলেও যায় না। যে এই দেবীর পুরোহিত, অথবা যাহার গৃহে ইনি অধিষ্ঠান করেন, সেই ব্যক্তি মনুষ্যমধ্যে প্রধান হয়। অন্য মনুষ্যেরা সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট যুক্তকরে স্তব স্তুতি করিতে থাকে। যদি মুদ্রাদেবীর অধিকারী একবার তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করে, তাহাহইলে তাঁহারা চরিতার্থ হয়েন।

দেবতাও বড় জাগ্রত। এমন কাজই নাই যে এই দেবীর অনুগ্রহে সম্পন্ন হয় না। পৃথিবীতে এমন সামগ্রীই নাই যে এই দেবীর বরে পাওয়া যায় না। এমন দুষ্কর্ম্মই নাই যে এই দেবীর উপাসনায় সম্পন্ন হয় না। এমন দোষই নাই যে ইহার অনুকম্পায় ঢাকা পড়ে না। এমন গুণই নাই যে তাঁহার অনুগ্রহব্যতীত গুণ বলিয়া

মনুষ্যসমাজে প্রতিপন্ন হইতে পারে; যাহার ঘরে ইনি নাই—তাহার আবার গুণ কি? যাহার ঘরে ইনি বিরাজ করেন, তাহার আবার দোষ কি? মনুষ্যসমাজে মুদ্রামহাদেবীর অনুগৃহীত ব্যক্তিকেই ধার্ম্মিক বলে—মুদ্রাহীনতাকেই অধর্ম্ম বলে। মুদ্রা থাকিলেই বিদ্বান্ হইল। মুদ্রা যাহার নাই, তাহার বিদ্যা থাকিলেও, মনুষ্যশাস্ত্রানুসারে সে মূর্খ বলিয়া গণ্য হয়। আমরা যদি "বড় বাঘ" বলি, তবে অমিতোদর, মহাদংষ্ট্রা, প্রভৃতি প্রকাণ্ডাকার মহাব্যাঘ্রগণকে বুঝাইবে। কিন্তু মনুষ্যালয়ে "বড় মানুষ" বলিলে সেরূপ অর্থ হয় না—আট হাত বা দশ হাত মানুষ বুঝায় না, যাহার ঘরে এই দেবী বাস করেন, তাহাকেই "বড় মানুষ" বলে। যাহার ঘরে এই দেবী স্থাপিতা নহেন, সে পাঁচ হাত লম্বা হইলেও তাহাকে "ছোট লোক" বলে।

মুদ্রাদেবীর এই রূপ নানাবিধ গুণগান শ্রবণ করিয়া আমি প্রথমে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, যে মনুষ্যালয় হইতে ইহাকে আনিয়া ব্যাঘ্রালয়ে স্থাপন করিব। কিন্তু পশ্চাৎ যাহা শুনিলাম, তাহাতে বিরত হইলাম। শুনিলাম যে, মুদ্রাই মনুষ্যজাতির যত অনিষ্টের মূল। ব্যাঘ্রাদি প্রধান পশুরা কখন স্বজাতির হিংসা করে না, কিন্তু মনুষ্যেরা

সর্ব্বদা আত্মজাতির হিংসা করিয়া থাকে। মুদ্রাপূজাই ইহার কারণ। মুদ্রার লোভে, সকল মনুষ্যেই পরস্পরের অনিষ্টচেষ্টায় রত। প্রথম বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম যে, মনুষ্যেরা সহস্রে২ প্রান্তরমধ্যে সমবেত হইয়া পরস্পরকে হনন করে। মুদ্রাই তাহার কারণ। মুদ্রাদেবীর উত্তেজনায় সর্ব্বদাই মনুষ্যেরা পরস্পরে হত, আহত, পীড়িত, অবরুদ্ধ, অপমানিত, তিরস্কৃত করে। মনুষ্যলোকে বোধ হয়, এমত অনিষ্টই নাই, যে এই দেবীর অনুগ্রহপ্রেরিত নহে। ইহা আমি জানিতে পারিয়া, মুদ্রাদেবীকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া তাঁহার পূজার অভিলাষ ত্যাগ করিলাম।

কিন্তু মনুষ্যেরা ইহা বুঝে না। প্রথম বক্তৃতাতেই বলিয়াছি যে, মনুষ্যেরা অত্যন্ত অপরিণামদর্শী—সর্ব্বদাই পরস্পরের অমঙ্গল চেষ্টা করে। অতএব তাহারা অবিরত রূপার চাকি ও তামার চাকি সংগ্রহের চেষ্টায় কুমারের চাকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

মনুষ্যদিগের বিবাহতত্ত্ব যেমন কৌতুকাবহ, অন্যান্য বিষয়ও তদ্রূপ। তবে, পাছে দীর্ঘ বক্তৃতা করিলে, আপনাদিগের বিষয় কর্ম্মের সময় পুনরুপস্থিত হয়, এই জন্য অদ্য এই খানে সমাধা করিলাম। ভবিষ্যতে যদি অবকাশ হয়, তবে অন্যান্য বিষয়ে কিছু বলিব।”

এই রূপে বক্তৃতা সমাধা করিয়া পণ্ডিতবর ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গূল, বিপুল লাঙ্গূলচট্চটারবমধ্যে উপবেশন করিলেন। তখন দীর্ঘনখ নামে এক সুশিক্ষিত যুবা ব্যাঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া, হাউ মাউ শব্দে বিতর্ক আরম্ভ করিলেন।

দীর্ঘনখ মহাশয় গর্জ্জনান্তে বলিলেন, "হে ভদ্র ব্যাঘ্রগণ! আমি অদ্য বক্তার সদ্বক্তৃতার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করি। কিন্তু ইহা বলাও কর্ত্তব্য যে বক্তৃতাটি নিতান্ত মন্দ, মিথ্যাকথাপরিপূর্ণ, এবং বক্তা অতি গণ্ডমূর্খ।"

অমিতোদর। "আপনি শান্ত হউন। সভ্যজাতীয়েরা অত স্পষ্ট করিয়া গালি দেয় না। প্রচ্ছন্নভাবে আপনি আরও গুরুতর গালি দিতে পারেন।"

দীর্ঘনখ। "যে আজ্ঞা। বক্তা অতি সত্যবাদী, তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মধ্যে, অধিকাংশ কথা অপ্রাকৃত হইলেও, দুই একটা সত্য কথা পাওয়া যায়। তিনি অতি সুপণ্ডিত ব্যক্তি। অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, এই বক্তৃতার মধ্যে বক্তব্য কিছুই নাই। কিন্তু আমরা যাহা পাইলাম, তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তবে বক্তৃতার সকল কথায় সম্মতি প্রকাশ করিতে পারি

না। বিশেষ, আদৌ মনুষ্যমধ্যে বিবাহ কাহাকে বলে, বক্তা তাহাই অবগত নহেন। ব্যাঘ্র জাতির কুলরক্ষার্থ যদি কোন বাঘ কোন বাঘিনীকে আপন সহচরী করে, (সহচরী, সঙ্গে চরে) তাহাকেই আমরা বিবাহ বলি। মানুষের বিবাহ সেরূপ নহে। মানুষ, স্বভাবতঃ দুর্ব্বল এবং প্রভুভক্ত। সুতরাং প্রত্যেক মনুষ্যের এক২টি প্রভু চাহি। সকল মনুষ্যই এক২ জন স্ত্রীলোককে আপন প্রভু বলিয়া নিযুক্ত করে। ইহাকেই তাহারা বিবাহ বলে। যখন তাহারা কাহাকে সাক্ষী রাখিয়া প্রভুনিয়োগ করে, তখন সে বিবাহকে পৌরোহিত বিবাহ বলা যায়। সাক্ষীর নাম পুরোহিত। বৃহল্লাঙ্গূল মহাশয় বিবাহমন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অযথার্থ। সে মন্ত্র এই রূপ;—

পুরোহিত। ‘বল, আমাকে কি বিষয়ের সাক্ষী হইতে হইবে?’

বর। ‘আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি এই স্ত্রীলোকটিকে জন্মের মত আমার প্রভুত্বে নিযুক্ত করিলাম।’

পুরো। ‘আর কি?’

বর। ‘আর আমি জন্মের মত ইঁহার শ্রীচরণের

গোলাম হইলাম। আহার যোগানের ভার আমার উপর;—খাইবার ভার উঁহার উপর।'

পুরো। (কন্যার প্রতি) 'তুমি কি বল?'

কন্যা। 'আমি ইচ্ছাক্রমে এই ভৃত্যটিকে গ্রহণ করিলাম। যত দিন ইচ্ছা হইবে, চরণসেবা করিতে দিব। যে দিন ইচ্ছা না হইবে, সেদিন নাতি মারিয়া তাড়াইয়া দিব।'

পুরো। 'শুভমস্তু।'

এইরূপ আরও অনেক ভুল আছে। যথা মুদ্রাকে বক্তা মনুষ্যপূজিত দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক উহা দেবতা নহে। মুদ্রা এক প্রকার বিষচক্র। মনুষ্যেরা অত্যন্ত বিষপ্রিয়; এই জন্য সচরাচর মুদ্রাসংগ্রহজন্য যত্নবান্। মনুষ্যগণকে মুদ্রাভক্ত জানিয়া আমি পূর্ব্বে বিবেচনা করিয়াছিলাম যে 'না জানি মুদ্রা কেমনই উপাদেয় সামগ্রী; আমাকে একদিন খাইয়া দেখিতে হইবে।' একদা বিদ্যাধরী নদীর তীরে একটা মনুষ্যকে হত করিয়া ভোজন করিবার সময়ে, তাহার বস্ত্রমধ্যে কয়েকটা মুদ্রা পাইলাম। পাইবামাত্র উদরসাৎ করিলাম। পর দিবস আমার উদরের পীড়া উপস্থিত হইল। সুতরাং মুদ্রা যে এক প্রকার বিষ, তাহাতে সংশয় কি?"

দীর্ঘনখ এইরূপে বক্তৃতা সমাপন করিলে পর অন্যান্য ব্যাঘ্র মহাশয়েরা উঠিয়া বক্তৃতা করিলেন। পরে, সভাপতি অমিতোদর মহাশয় বলিতে লাগিলেন;—

"এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে, বিষয় কর্ম্মের সময় উপস্থিত। বিশেষ, হরিণের পাল কখন্ আইসে, তাহার স্থিরতা কি? অতএব দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া কালহরণ কর্ত্তব্য নহে। বক্তৃতা অতি উত্তম হইয়াছে—এবং বৃহল্লাঙ্গূল মহাশয়ের নিকট আমরা বড় বাধিত হইলাম। এক কথা এই বলিতে চাহি, যে আপনারা দুই দিন যে বক্তৃতা শুনিলেন, তাহাতে অবশ্য বুঝিয়া থাকিবেন যে, মনুষ্য অতি অসভ্য পশু। আমরা অতি সভ্য পশু। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে যে আমরা মনুষ্যগণকে আমাদের ন্যায় সভ্য করি। বোধ করি, মনুষ্যদিগকে সভ্য করিবার জন্যই জগদীশ্বর আমাদিগকে এই সুন্দরবনভূমিতে প্রেরণ করিয়াছেন। বিশেষ, মানুষেরা সভ্য হইলে, তাহাদের মাংস আরও কিছু সুস্বাদ হইতে পারে, এবং তাহারাও আরও সহজে ধরা দিতে পারে। কেন না সভ্য হইলেই তাহারা বুঝিতে পারিবে যে ব্যাঘ্রদিগের আহারার্থ শরীরদান করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। এই রূপ সভ্যতাই আমরা শিখাইতে চাই। অতএব আপ-

নারা এ বিষয়ে মনোযোগী হউন। ব্যাঘ্রদিগের কর্ত্তব্য যে, মনুষ্যদিগকে অগ্রে সভ্য করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করেন।"

সভাপতি মহাশয় এইরূপে বক্তৃতা সমাপন করিয়া লাঙ্গূলচট্চটারবমধ্যে উপবেশন করিলেন, তখন সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানানন্তর ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা ভঙ্গ হইল। তাঁহারা যে যথায় পারিলেন, বিষয় কর্ম্মে প্রয়াণ করিলেন।

যে ভূমিখণ্ডে সভার অধিষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার চারি পার্শ্বে কতকগুলিন বড়২ গাছ ছিল। কতকগুলিন বানর, তদুপরি আরোহণ করিয়া, বৃক্ষপত্রমধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, ব্যাঘ্রদিগের বক্তৃতা শুনিতেছিল। ব্যাঘ্রেরা সভাভূমি ত্যাগ করিয়া গেলে, একটি বানর মুখ বাহির করিয়া অন্য বানরকে ডাকিয়া কহিল, "বলি, ভায়া ডালে আছ?"

দ্বিতীয় বানর বলিল, "আজ্ঞে, আছি।"

প্রথম বানর। "আইস, আমরা এই ব্যাঘ্রদিগের বক্তৃতার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই।"

দ্বি, বা। "কেন?"

প্র, বা। "এই বাঘেরা আমাদিগের চিরশত্রু। আইস, কিছু নিন্দা করিয়া শত্রুতা সাধা যাউক।"

দ্বি, বা। "অবশ্য কর্ত্তব্য। কাজটা আমাদিগের জাতির উচিত বটে।"

প্র, বা। "আচ্ছা, তবে দেখ বাঘেরা কেহ নিকটে নাই ত?"

দ্বি, বা। "না। তথাপি আপনি একটু প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বলুন।"

প্র, বা। "সেই কথাই ভাল। নইলে কি জানি, কোন্ দিন কোন্ বাঘের সম্মুখে পড়িব, আর আমাকে ভোজন করিয়া ফেলিবে।"

দ্বি, বা। "বলুন কি দোষ!"

প্র, বা। "প্রথম, ব্যকারণ অশুদ্ধ। আমরা বানর-জাতি, ব্যাকরণে বড় পণ্ডিত। ইহাদের ব্যাকরণ আমাদের বাঁছুরে ব্যাকরণের মত নহে।"

দ্বি, বা। "তার পর?"

প্র, বা। "ইহাদের ভাষা বড় মন্দ।"

দ্বি, বা। "হাঁ; উহারা বাঁছুরে কথা কয় না!

প্র, বা। "ঐ যে অমিতোদর বলিল, 'ব্যাঘ্রদিগের কর্ত্তব্য, অগ্রে মনুষ্যদিগের সভ্য করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করেন,' ইহা না বলিয়া যদি বলিত, 'অগ্রে মনুষ্যদিগকে

ভোজন করিয়া পশ্চাৎ সভ্য করেন, তাহা হইলে সঙ্গত হইত।”

দ্বি, বা। “সন্দেহ কি—নহিলে আমাদের বানর বলিবে কেন?”

প্র, বা। “কি প্রকারে বক্তৃতা হয়, কিঁ কি কথা বলিতে হয়, তাহা উহারা জানে না। বক্তৃতায় কিছু কিচমিচ কবিতে হয়, কিছু লম্ফ ঝম্ফ করিতে হয়, দুই একবার মুখ ভেঙ্গাইতে হয়, দুই এক বার কদলী ভোজন করিতে হয়; উহাদের কর্ত্তব্য, আমাদের কাছে কিছু শিক্ষা লয়।”

দ্বি, বা। “আমাদিগের কাছে শিক্ষা পাইলে উহারা বানর হইত, ব্যাঘ্র হইত না।”

এমত সময়ে আরো কয়েকটা বানর সাহস পাইয়া উঠিল। এক বানর বলিল, “আমার বিবেচনায় বক্তৃতার মহদ্দোষ এই যে, বৃহল্লাঙ্গূল আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কৃত অনেক গুলিন নূতন কথা বলিয়াছেন। সে সকল কথা কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। যাহা পূর্ব্ব-লেখকদিগের চর্ব্বিতচর্ব্বণ নহে, তাহা নিতান্ত দূষ্য। আমরা বানর জাতি, চিরকাল চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়া বানর-

লোকের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া আসিতেছি—ব্যাঘ্রাচার্য্য যে তাহা করেন নাই, ইহা মহা পাপ।”

তখন একটি রূপী বানর বলিয়া উঠিল, “আমি এই সকল বক্তৃতার মধ্যে হাজার এক দোষ তালিকা করিয়া বাহির করিতে পারি। আমি হাজার এক স্থানে বুঝিতে পারি নাই। যাহা আমার বিদ্যাবুদ্ধির অতীত, তাহা মহাদোষ বই আর কি?”

আর একটি বানর কহিল, “আমি বিশেষ কোন দোষ দেখাইতে পারি না। কিন্তু আমি বায়ান্ন রকম মুখভঙ্গী করিতে পারি; এবং অশ্লীল গালিগালাজ দিয়া আপন সভ্যতা এবং রসিকতা প্রচার করিতে পারি।”

এইরূপে বানরেরা ব্যাঘ্রদিগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত রহিল। দেখিয়া এক স্থূলোদর বানর বলিল, যে “আমরা যেরূপ নিন্দাবাদ করিলাম তাহাতে বৃহল্লাঙ্গুল বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে। আইস, আমরা কদলী ভোজন করি।”

ইংরাজস্তোত্র।

(মহাভারত হইতে অনুবাদিত)

হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১॥

তুমি নানাগুণে বিভূষিত, সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট, বহুল সম্পদ্‌যুক্ত; অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২॥

তুমি হর্ত্তা—শত্রুদলের; তুমি কর্ত্তা—আইনাদির; তুমি বিধাতা—চাকরি প্রভৃতির। অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৩॥

তুমি সমরে দিব্যাস্ত্রধারী—শিকারে বল্লমধারী, বিচারাগারে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমিত ব্যাসবিশিষ্ট বেত্রধারী, আহারে কাঁটা চাম্‌চে ধারী; অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৪॥

তুমি একরূপে রাজপুরী মধ্যে অধিষ্ঠান করিয়া রাজ্য কর; আর একরূপে পণ্যবীথিকা মধ্যে বাণিজ্য কর; আর একরূপে কাছাড়ে চার চাস কর; অতএব হে ত্রিমূর্ত্তে! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৫॥

তোমার সত্ত্বগুণ তোমার প্রণীত গ্রন্থাদিতে প্রকাশ; তোমার রজোগুণ তোমার কৃত যুদ্ধাদিতে প্রকাশ; তো-

নার তমোগুণ তোমার প্রণীত ভারতবর্ষীয় সম্বাদ পত্রা-
দিতে প্রকাশ।—অতএব হে ত্রিগুণাত্মক! আমি তো-
মাকে প্রণাম করি। ৬॥

তুমি আছ, এই জন্যই তুমি সৎ! তোমার শত্রুরা রণক্ষেত্রে চিৎ: এবং তুমি উমেদার বর্গের আনন্দ; অত-এব হে সচ্চিদানন্দ! তোমাকে আমি প্রণাম করি। ৭॥

তুমি ব্রহ্মা, কেন না তুমি প্রজাপতি: তুমি বিষ্ণু, কেন না কমলা তোমার প্রতিই কৃপা করেন; এবং তুমি মহেশ্বর, কেন না তোমার গৃহিণী গৌরী। অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৮॥

তুমি ইন্দ্র, কামান তোমার বজ্র: তুমি চন্দ্র, ইন্‌কম টেক্‌স তোমার কলঙ্ক; তুমি বায়ু, রেইলওয়ে তোমার গমন; তুমি বরুণ, সমুদ্র তোমার রাজ্য; অতএব হে ইং-রাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৯॥

তুমিই দিবাকর, তোমার আলোকে আমাদের অজ্ঞা-নান্ধকার দূর হইতেছে; তুমিই অগ্নি, কেন না সব খাও; তুমিই যম, বিশেষ আমলাবর্গের। ১০॥

তুমি বেদ, আর ঋক্‌যজুষাদি মানি না; তুমি স্মৃতি—মন্বাদি ভুলিয়া গিয়াছি; তুমি দর্শন—ন্যায় মীমাংসা

প্রভৃতি তোমারই হাত। অতএব হে ইংরাজ! তোমাকে প্রণাম করি। ১১॥

হে শ্বেতকান্ত! তোমার অমল-ধবল দ্বিরদ-রদশুভ্র মহাশ্মশ্রুশোভিত মুখমণ্ডল দেখিয়া আমার বাসনা হইয়াছে, আমি তোমার স্তব করিব; অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১২॥

তোমার হরিতকপিশ পিঙ্গললোহিত কৃষ্ণশুভ্রাদি নানা বর্ণশোভিত, অতিযত্নরঞ্জিত, ভল্লুক মেদ মার্জ্জিত, কুন্তলাবলি দেখিয়া আমার বাসনা হইয়াছে, আমি তোমার স্তব করিব; অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৩॥

তুমি কলিকালে গৌরাঙ্গবতার, তাহার সন্দেহ নাই। হ্যাট তোমার সেই গোপবেশের চূড়া; পেণ্টুলন সেই ধড়া—আর হুইপ্ সেই মোহন মুরলী—অতএব হে গোপীবল্লভ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৪॥

হে বরদ! আমাকে বর দাও। আমি শাম্‌লা মাতায় বাঁধিয়া তোমার পিছু২ বেড়াইব—তুমি আমাকে চাকরি দাও। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৫।

হে শুভঙ্কর! আমার শুভ কর। আমি তোমার খোষামোদ করিব, তোমার প্রিয় কথা কহিব, তোমার

মন রাখা কাজ করিব—আমায় বড় কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৬॥

হে মানদ—আমায় টাইটল দাও, খেতাব দাও, খেলাত দাও;—আমাকে তোমার প্রসাদ দাও—আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৭॥

হে ভক্ত বৎসল! আমি তোমার পাত্রাবশেষ ভোজন করিতে ইচ্ছা করি—তোমার করস্পর্শে লোক মণ্ডলে মহা মানাস্পদ হইতে বাসনা করি,—তোমার স্বহস্তলিখিত দুই একখানা পত্র বাক্সমধ্যে রাখিবার স্পর্দ্ধা করি—অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৮॥

হে অন্তর্যামিন্! আমি যাহা কিছু করি, তোমাকে ভুলাইবার জন্য। তুমি দাতা বলিবে বলিয়া আমি দান করি: তুমি পরোপকারী বলিবে বলিয়া পরোপকার করি; তুমি বিদ্বান্ বলিবে বলিয়া আমি লেখা পড়া করি। অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৯॥

আমি তোমার ইচ্ছামতে ডিস্পেন্সরি করিব: তোমার প্রীত্যর্থ স্কুল করিব; তোমার আজ্ঞামত চাঁদা দিব, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২০॥

হে সৌম্য! যাহা তোমার অভিমত, তাহাই আমি করিব। আমি বুট পাণ্টলুন পরিব, নাকে চস্‌মা দিব, কাঁটা চাম্‌চে ধরিব, টেবিলে খাইব—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২১ ॥

হে মিষ্টভাষিন্! আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব; পৈতৃকধর্ম্ম ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বন করিব; বাবু নাম ঘুচাইয়া মিষ্টর লেখাইব; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২২ ॥

হে সুভোজক! আমি ভাত ছাড়িয়াছি, পাউরুটি খাই; নিষিদ্ধ মাংস নহিলে আমার ভোজন হয় না; কুক্কুট আমার জলপান। অতএব হে ইংরাজ! আমাকে চরণে রাখিও, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২৩ ॥

আমি বিধবার বিবাহ দিব; কুলীনের জাতি মারিব, জাতিভেদ উঠাইয়া দিব—কেন না তাহা হইলে তুমি আমার সুখ্যাতি করিবে। অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ২৪ ॥

হে সর্ব্বদ! আমাকে ধন দাও, মান দাও, যশঃ দাও; —আমার সর্ব্ববাসনা সিদ্ধ কর। আমাকে বড় চাকরি দাও, রাজা কর, রায়বাহাদুর কর, কৌন্সিলের মেম্বর কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২৫ ॥

যদি তাহা না দাও, তবে আমাকে ডিনরে আট্‌হোমে নিমন্ত্রণ কর; বড়২ কমিটির মেম্বর কর, সেনেটের মেম্বর কর, জষ্টিস্‌ কর, অনরারী মাজিষ্ট্রেট্‌ কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২৬॥

আমার স্পীচ্‌ শুন, আমার এশে পড়, আমায় বাহবা দাও,—আমি তাহা হইলে সমগ্র হিন্দুসমাজের নিন্দাও গ্রাহ্য করিব না। আমি তোমাকেই প্রণাম করি। ২৭॥

হে ভগবন্‌! আমি অকিঞ্চন! আমি তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি আমাকে মনে রাখিও। আমি তোমাকে ডালি পাঠাইব, তুমি আমাকে মনে রাখিও। হে ইংরাজ! আমি তোমাকে কোটি২ প্রণাম করি। ২৮॥

বাবু।

জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনি কহিলেন যে, কলিযুগে বাবু নামে এক প্রকার মনুষ্যেরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন। তাঁহারা কি প্রকার মনুষ্য হইবেন এবং পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কি কার্য্য করিবেন, তাহা

শুনিতে বড় কৌতূহল জন্মিতেছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সবিস্তারে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরবর, আমি সেই বিচিত্র-বুদ্ধি, আহারনিদ্রাকুশলী বাবুগণকে আখ্যাত করিব, আপনি শ্রবণ করুন। আমি সেই চস্‌মাঅলঙ্কৃত, উদারচরিত্র, বহুভাষী, সন্দেশপ্রিয় বাবুদিগের চরিত্র কীর্ত্তিত করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। হে রাজন্, যাঁহারা চিত্রবসনাবৃত, বেত্রহস্ত, রঞ্জিতকুন্তল, এবং মহাপাদুক, তাঁহারাই বাবু। যাঁহারা বাক্যে অজেয়, পরভাষাপারদর্শী, মাতৃভাষাবিরোধী, তাঁহারাই বাবু। মহারাজ! এমন অনেক মহাবুদ্ধিসম্পন্ন বাবু জন্মিবেন যে, তাঁহারা মাতৃভাষায় বাক্যালাপে অসমর্থ হইবেন। যাঁহাদিগের দশেন্দ্রিয় প্রকৃতিস্থ, অতএব অপরিশুদ্ধ, যাঁহাদিগের কেবল রসনেন্দ্রিয় পরজাতিনিষ্ঠীবনে পবিত্র, তাঁহারাই বাবু। যাঁহাদিগের চরণ মাংসাস্থিবিহীন শুষ্ককাষ্ঠের ন্যায় হইলেও পলায়নে সক্ষম;—হস্ত দুর্ব্বল হইলেও লেখনীধারণে এবং বেতনগ্রহণে সুপটু;—চর্ম্ম কোমল হইলেও সাগর পারনির্ম্মিত দ্রব্য বিশেষের প্রহার সহিষ্ণু; যাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়মাত্রেরই ঐরূপ প্রশংসা করা যাইতে পারে, তাঁহারাই বাবু। যাঁহারা বিনা উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিবেন,

সঞ্চয়ের জন্য উপার্জ্জন করিবেন, উপার্জ্জনের জন্য বিদ্যাধ্যয়ন করিবেন, বিদ্যাধ্যয়নের জন্য প্রশ্ন চুরি করিবেন, তাঁহারাই বাবু।

মহারাজ! বাবু শব্দ নানার্থ হইবে। যাঁহারা কলিযুগে ভারতবর্ষের রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া, ইংরাজ নামে খ্যাত হইবেন, তাঁহাদিগের নিকট "বাবু" অর্থে কেরাণী বা বাজার সরকার বুঝাইবে। নির্ধন দিগের নিকটে "বাবু" শব্দে অপেক্ষাকৃত ধনী বুঝাইবে। ভৃত্যের নিকট "বাবু" অর্থে প্রভু বুঝাইবে। এ সকল হইতে পৃথক্, কেবল বাবুজন্ম-নির্ব্বাহাভিলাষী কতকগুলিন মনুষ্য জন্মিবেন। আমি কেবল তাঁহাদিগেরই গুণকীর্ত্তন করিতেছি। যিনি বিপরীতার্থ করিবেন, তাঁহার এই মহাভারত শ্রবণ নিষ্ফল হইবে। তিনি গো জন্ম গ্রহণ করিয়া বাবুদিগের ভক্ষ্য হইবেন।

হে নরাধিপ! বাবুগণ দ্বিতীয় অগস্ত্যের ন্যায় সমুদ্ররূপী বরুণকে শোষণ করিবেন, স্ফাটিক পাত্র ইহাদিগের গণ্ডূষ। অগ্নি ইহাদিগের আজ্ঞাবহ হইবেন—"তামাকু" এবং "চুরট" নামক দুইটি অভিনব খাণ্ডবকে আশ্রয় করিয়া রাত্রি দিন ইহাদিগের মুখে লাগিয়া থাকিবেন। ইহাদিগের যেমন মুখে অগ্নি, তেমনি জঠরেও

অগ্নি জ্বলিবেন। এবং রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত ইহা-দিগের রথস্থ যুগল প্রদীপে জ্বলিবেন। ইহাদিগের আলোচিত সঙ্গীতে এবং কাব্যেও অগ্নিদেব থাকিবেন। তথায় তিনি "মদন আগুন" এবং "মনাগুন" রূপে পরি-ণত হইবেন। বারবিলাসিনীদিগের মতে ইহাদিগের কপালেও অগ্নিদেব বিরাজ করিবেন। বায়ুকেই ইহারা ভক্ষণ করিবেন—ভদ্রতা করিয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ কার্য্যের নাম রাখিবেন, "বায়ুসেবন।" চন্দ্র ইহাঁদের গৃহে এবং গৃহের বাহিরে নিত্য বিরাজমান থাকিবেন—কদাপি অবগুণ্ঠনা-বৃত। কেহ প্রথমরাত্রে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র, শেষরাত্রে শুক্লপক্ষের চন্দ্র দেখিবেন, কেহ তদ্বিপরীত করিবেন। সূর্য্য ইহাদিগকে দেখিতে পাইবেন না। যম ইহাদিগকে ভুলিয়া থাকিবেন। কেবল অশ্বিনীকুমারদিগকে ইহারা পূজা করিবেন। অশ্বিনীকুমারদিগের মন্দিরের নাম হইবে "আস্তাবল।"

হে নরশ্রেষ্ঠ! যিনি কাব্যরসাদিতে বঞ্চিত, সঙ্গীতে দগ্ধ কোকিলাহারী, যাঁহার পাণ্ডিত্য শৈশবাভ্যস্ত গ্রন্থগত, যিনি আপনাকে অনন্তজ্ঞানী বিবেচনা করিবেন, তিনিই বাবু। যিনি কাব্যের কিছুই বুঝিবেন না, অথচ কাব্য-পাঠে এবং সমালোচনায় প্রবৃত্ত, যিনি বারযোষিতের চীৎ-

ক্কার মাত্রকেই সঙ্গীত বিবেচনা করিবেন, যিনি আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ এবং অভ্রান্ত বলিয়া জানিবেন, তিনিই বাবু। যিনি রূপে কার্ত্তিকেয়ের কনিষ্ঠ, গুণে নির্গুণ পদার্থ, কর্ম্মে জড়ভরত, এবং বাক্যে সরস্বতী, তিনিই বাবু। যিনি উৎসবার্থ দুর্গাপূজা করিবেন, গৃহিণীর অনুরোধে লক্ষ্মীপূজা করিবেন, উপগৃহিণীর অনুরোধে সরস্বতী পূজা করিবেন, এবং পাটার লোভে গঙ্গাপূজা করিবেন, তিনিই বাবু। যাহার গমন বিচিত্র রথে, শয়ন সাধারণ গৃহে, পান দ্রাক্ষারস, এবং আহার কদলী দগ্ধ, তিনিই বাবু। যিনি মহাদেবের তুল্য মাদকপ্রিয়, ব্রহ্মার তুল্য প্রজা সিসৃক্ষু, এবং বিষ্ণুর তুল্য লীলা-পটু, তিনিই বাবু। হে কুরুকুলভূষণ! বিষ্ণুর সহিত এই বাবুদিগের বিশেষ সাদৃশ্য হইবে। বিষ্ণুর ন্যায়, ইহাঁদের লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়ই থাকিবেন। বিষ্ণুর ন্যায়, ইহারাও অনন্ত শয্যাশায়ী হইবেন। বিষ্ণুর ন্যায় ইহাঁদিগেরও দশ অবতার—যথা কেরাণী, মাষ্টর, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকীল, হাকিম, জমীদার, সম্বাদপত্র সম্পাদক এবং নিষ্কর্ম্মা। বিষ্ণুর ন্যায় ইহাঁরা সকল অবতারেই অমিতবল পরাক্রম অসুরগণকে বধ করিবেন। কেরাণী অবতারে বধ্য অসুর দপ্তরী: মাষ্টার অবতারে বধ্য ছাত্র: ষ্টেশ্যান মাষ্টার

অবতারে বধ্য টীকেটহীন পথিক; ব্রাহ্মাবতারে বধ্য চাল-কলা প্রত্যাশা পুরোহিত; মুৎসুদ্দী অবতারে বধ্য বণিক্ ইংরাজ; ডাক্তার অবতারে বধ্য রোগী; উকীল অবতারে বধ্য মোয়াক্কল; হাকিম অবতারে বধ্য বিচারার্থী; জমীদার অবতারে বধ্য প্রজা; সম্পাদক অবতারে বধ্য ভদ্রলোক এবং নিষ্কর্ম্মাবতারে বধ্য পুষ্করিণীর মৎস্য।

মহারাজ! পুনশ্চ শ্রবণ করুন। যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত, এবং কলহে সহস্র, তিনিই বাবু। যাঁহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ, পৃষ্ঠে শতগুণ, এবং কার্য্যকালে অদৃশ্য, তিনিই বাবু। যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তকমধ্যে, যৌবনে বোতলমধ্যে, বার্দ্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে, তিনিই বাবু। যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রাহ্মধর্ম্মবেত্তা, বেদদ্বেষী সম্বাদ পত্র, এবং তীর্থ "ন্যাশানেল থিয়েটর," তিনিই বাবু। যিনি মিশনরির নিকট খ্রীষ্টিয়ান, কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দু, এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক, তিনিই বাবু। যিনি নিজগৃহে শুধু জল খান, বন্ধু গৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান, এবং মুনিব সাহেবের গৃহে গলা ধাক্কা খান, তিনিই বাবু। যাঁহার স্নানকালে তৈলে ঘৃণা, আহারকালে আপন অঙ্গুলিকে ঘৃণা, এবং

কথোপকথনকালে মাতৃভাষাকে ঘৃণা, তিনিই বাবু। যাঁহার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারিতে, ভক্তি কেবল গৃহিণী বা উপগৃহিণীতে, এবং রাগ কেবল সদ্‌গ্রন্থের উপর,নিঃসন্দেহ তিনিই বাবু।

হে নরনাথ! আমি যাঁহাদিগের কথা বলিলাম; তাঁহাদিগের মনে২ বিশ্বাস জন্মিবে, যে আমরা তাম্বূল চর্ব্বণ করিয়া, উপাধান অবলম্বন করিয়া, দ্বৈভাষিকী কথা কহিয়া, এবং তামাকু সেবন করিয়া ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার করিব।

জনমেজয়' কহিলেন, হে মুনিপুঙ্গব! বাবুদিগের জয় হউক, আপনি অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করুন।

গর্দ্দভ।

হে গর্দ্দভ! আমার প্রদত্ত, এই নবীন তৃণ সকল ভোজন করুন্। ১।

আমি বহুযত্নে, গোবৎসাদির অগম্য প্রান্তর সকল হইতে, নবজলকণানিষেকসুরভি তৃণাগ্রভাগ সকল, আহরণ করিয়া আনিয়াছি, আপনি সুন্দর বদনমণ্ডলে গ্রহণ

করিয়া, মুক্তানিন্দিত দন্তে ছেদন পূর্ব্বক আমার প্রতি কৃপাবান্ হউন।

হে মহাভাগ! আপনার পূজা করিব ইচ্ছা হইয়াছে, কেন না আপনাকেই সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। অতএব হে বিশ্বব্যাপিন্! আমার পূজা গ্রহণ করুন্।

আমি পূজ্য ব্যক্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, নানা দেশে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, আপনি সর্ব্বত্রই বসিয়া আছেন, সকলেই আপনার পূজা করিতেছে। অতএব হে দীর্ঘকর্ণ! আমারও পূজা গ্রহণ করুন্।

হে গর্দ্দভ! কে বলে তোমার পদগুলি ক্ষুদ্র। যেখানে সেখানে তোমারই বড় পদ, দেখিয়া থাকি। তুমি উচ্চাসনে বসিয়া, স্তাবকগণে পরিবৃত হইয়া, মোটা২ ঘাসের আঁটি খাইয়া থাক। লোকে তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রশংসা করে।

তুমিই বিচারাসনে উপবেশন করিয়া, মহাকর্ণদ্বয় ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতেছ। তাহার অগাধ গহ্বর দেখিতে পাইয়া, উকীল নামক কবিগণ নানাবিধ কাব্যরস তন্মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে। তখন তুমি শ্রবণতৃপ্তিসুখে অভিভূত হইয়া নিদ্রা গিয়া থাক।

হে বৃহন্মুণ্ড! তখন সেই কাব্যরসে আর্দ্রীভূত হইয়া, তুমি দয়াময় হইয়া, অসীম দয়ার প্রভাবে রামের সর্ব্বস্ব শ্যামকে দাও, শ্যামের সর্ব্বস্ব কানাইকে দাও; তোমার দয়ার পার নাই।

হে রজকগৃহভূষণ! কখনও দেখিয়াছি, তুমি লাঙ্গুল সঙ্গোপন পূর্ব্বক কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া, সরস্বতী-মণ্ডপ মধ্যে বঙ্গীয় বালকগণকে গর্দ্দভলোক প্রাপ্তির উ-পায় বলিয়া দিতেছ। বালকেরা গর্দ্দভ লোকে প্রবেশ করিলে, "প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইল" বলিয়া, মহা গর্জ্জন করিয়া থাক। শুনিয়া আমরা ভয় পাই।

হে প্রকাণ্ডোদর! তুমিই চতুষ্পাঠীমধ্যে কুশাসনে উপবেশন করিয়া, তৈলনিষিক্ত ললাটপ্রান্তরে চন্দনে নদী অঙ্কিত করিয়া, তুলটহস্তে শোভা পাও। তোমার কৃত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া আমরা ধন্য২ করিতেছি। অতএব হে মহাপশো! আমার প্রদত্ত কোমল তৃণাঙ্কুর ভোজন কর।

তোমারই প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা—তুমি নহিলে আর কা-হারও প্রতি কমলার দয়া হয় না। তিনি তোমাকে কখ-নও ত্যাগ করেন না, কিন্তু তুমি তাঁহাকে বুদ্ধির গুণে

সর্ব্বদাই ত্যাগ করিয়া থাক। এই জন্যই লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য কলঙ্ক। অতএব হে সুপুচ্ছ! তৃণ ভোজন কর।

তুমিই গায়ক। ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, প্রভৃতি সপ্তস্বরই তোমার কণ্ঠে। অন্যে বহুকাল, তোমার অনুকরণ করিয়া, দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিয়া, অনেক প্রকার কাশি অভ্যাস করিয়া, তোমার মত স্বর পাইয়া থাকে। হে ভৈরবকণ্ঠ! ঘাস খাও।

তুমি বহুকাল হইতে পৃথিবীতলে বিচরণ করিতেছ। তুমিই রামায়ণে রাজা দশরথ, নহিলে রাম বনে যাইবে কেন? তুমি মহাভারতে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির, নহিলে পাণ্ডব পাশায় স্ত্রী হারিবে কেন? তুমি কলিযুগে বঙ্গদেশে বৃদ্ধ সেন রাজা ছিলে,—নহিলে বঙ্গদেশে মুসলমান কেন?

তুমিই ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলে, সন্দেহ নাই, নহিলে নবমীতে লাউ খাইতে নাই কেন? তুমিই আলঙ্কারিক, সাহিত্যদর্পণাদি তোমারই সৃষ্টি। কিঞ্চিৎ ঘাস খাও।

তুমি সুকবি—কাদম্বরী, বাসবদত্তা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট, জগন্মান্য কাব্য তোমারই প্রণীত। কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় থাকিয়া, তুমিই বিদ্যাসুন্দরাদি প্রণয়ন করিয়াছিলে, স-

ন্দেহ নাই। নহিলে এজন্মে তাহাতে তোমার এত প্রীতি কেন?

তুমি নানা রূপে, নানাদেশ আলো করিয়া, যুগে২ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। এক্ষণে তপস্যাবলে, ব্রহ্মার বরে, তুমি বঙ্গদেশে সমালোচক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। হে লোমশাবতার! আমার সমাহৃত কোমল নবীন তৃণাঙ্কুর সকল ভক্ষণ কর, আমি আহ্লাদিত হইব।

হে মহাপৃষ্ঠ! তুমি কখন রাজ্যের ভার বহ, কখন পুস্তকের ভার বহ, কখন ধোপার গাঁটরি বহ। হে লোমশ! কোনটি গুরুভার আমায় বলিয়া দাও।

তুমি কখন ঘাস খাও, কখন ঠেঙ্গা খাও, কখন গ্রন্থকারের মাথা খাও: হে লোমশ! কোনটি সুভক্ষ্য, অর্ব্বাচীনকে বলিয়া দাও।

হে সুন্দর! তোমার রূপ দেখিয়া আমি মোহিত হইয়াছি। তুমি যখন গাছ তলায় দাঁড়াইয়া, নববর্ষাসারসিক্ত হইতে থাক, দুই মহাকর্ণ উর্দ্ধোত্থিত করিয়া, মুখচন্দ্র বিনত করিয়া, চক্ষু দুটি ক্ষণে মুদিত ক্ষণে উন্মেষিত করিতে করিতে ভিজিতে থাক,—তোমার পৃষ্ঠে, মুণ্ডে এবং স্কন্ধে বসুধারা বহিতে থাকে—তখন তোমাকে আমি বড় সুন্দর দেখি। হে লোকমনোমোহন! কিছু ঘাস খাও।

বিধাতা তোমায় তেজ দেন নাই, এজন্য তুমি শান্ত, বেগ দেন নাই এজন্য সুধীর, বুদ্ধি দেন নাই, এজন্য তুমি বিদ্বান্; এবং মোট না বহিলে খাইতে পাও না, এজন্য তুমি পরোপকারী। আমি তোমার যশোগান করিতেছি; ঘাস খাইয়া সুখী কর।

যেমন ভগবান্ কূর্ম্মরূপে, পৃষ্ঠে পৃথিবী বহন করিয়াছিলেন, কৃষ্ণরূপে অঙ্গুলিতে গিরিবহন করিয়াছিলেন. নাগরূপে, মস্তকে ধরণীর ভার বহন করিতেছেন, তেমনি তুমিও পশু, পশুরূপে মলিন বস্ত্রের ভার বহন কর। অতএব তোমারও পূজা করিব—এই ঘাস গ্রহণ কর।

তুমি বিধাতার অনুগ্রহে চতুর্ভুজ। এবং জাতিধর্ম্মবশতঃ সর্ব্বদা গোপীগণে পরিবৃত। পুচ্ছ চূড়া হইতে স্থানান্তরে গিয়াছে বটে, কিন্তু আছে। ঐ যে গর্জ্জন করিলে, ওকি বংশীরব? তুমি ভক্তের নিকট প্রকাশ করিয়া বল, আবার এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে কেন?

তুমি আবার কি কংস শিশুপালাদি অসুরের বধ করিতে আসিয়াছ? কংস এখন আর নাই—তিনি একটি "আকার" প্রাপ্ত হইয়া থালা ঘটি বাটি ইত্যাদিতে পরিণত হইয়াছেন—এবার তাহাতে উচ্ছিষ্ট অন্ন খাইয়া সুখী হও। শিশুপালের উপর তোমার রাগ আছে সন্দেহ

নাই কেননা শিশুপাল ইট মারিয়া সর্ব্বদা তোমার অস্থি ভাঙ্গিয়া দেয়। কিন্তু হে মহাবল! আমার পরামর্শ শুন, তাহাদিগের শারীরিক আঘাত করিও না। তুমি যে সম্বাদ পত্রের সম্পাদক হইয়া সপ্তাহে সপ্তাহে তাহা-দিগকে আপন বুদ্ধি দান করিতেছ, তাহাতেই শিশুপালের সর্ব্বনাশ হইবে।

অথবা তুমি কি আবার একটা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধাইতে অবতীর্ণ হইয়াছ? এবারকার যুদ্ধ শস্ত্রে না শাস্ত্রে?

হে গর্দ্দভ! আমি অর্ব্বাচীন, কি বলিতে কি বলিলাম, তুমি আমার উপর রাগ করিও না। যিনি জগতের আরাধ্য তিনি সকল ভূতেই আছেন, এজন্য আমি তোমারও পূজা করিলাম। অন্য লোকে যদি মনুষ্য পূজা করিতে পারে, তবে আমি তোমার পূজা না করি কেন? তুমি কি "Grand etre" ছাড়া?

দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন।

আমরা স্ত্রীজাতি, নিরীহ ভালমানুষ বলিয়া আজি কালি আমাদিগের উপর বড় অত্যাচার হইতেছে। পুরুষের এক্ষণে বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে, ভর্ত্তৃগণ স্ত্রীকে আর মানে না, স্ত্রীলোকদিগের পুরাতন স্বত্ব সকল লুপ্ত হইতেছে, কেহই আর স্ত্রীর আজ্ঞার বশবর্ত্তী নহে। এই সকল বিষয়ের সুনিয়ম করিবার জন্য আমরা স্ত্রীস্বত্বরক্ষণী সভা সংস্থাপিতা করিয়াছি। সে সভার পরিচয় যদি সাধারণে সবিশেষ অবগত না থাকেন, তবে তাহার বিজ্ঞাপনী পশ্চাৎ প্রকাশ করিব। এক্ষণে বক্তব্য এই যে আমাদিগের স্বত্বরক্ষার্থ সভা হইতে একটি বিশেষ সদুপায় হইয়াছে। আমরা এবিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছি। এবং তৎসমভিব্যাহারে ভর্ত্তৃশাসনার্থ একটি দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইনের পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করিয়াছি।

সকলের স্বত্ব রক্ষার্থ যেখানে প্রত্যহ আইনের সৃষ্টি

হইতেছে, সেখানে আমাদিগের চিরন্তন স্বত্ব রক্ষার্থ কোন আইন হয়না কেন? অতএব এই আইন সত্বরে পাস হইবে, এই কামনায় স্বামিগণকে অবগত করিবার জন্য আমি তাহা বঙ্গদর্শনে প্রচার করিলাম। অনেক বাবু-লোক বাঙ্গালাতে আইন ভাল বুঝিতে পারেন না, বিশেষতঃ আইনের বাঙ্গালা অনুবাদ সচরাচর ভাল হয় না, এবং আইন আদৌ ইংরাজিতেই প্রণীত হইয়াছিল, এবং ইহার বাঙ্গালা অনুবাদটি ভাল হয় নাই, স্থানেং ইংরাজির সঙ্গে ইহার প্রভেদ আছে, অতএব আমরা ইংরাজি বাঙ্গালা দুই পাঠাইলাম। ভরসা করি বঙ্গদর্শনকারক একবার আমাদিগের অনুরোধে ইংরাজির প্রতি বিরাগ ত্যাগ করিয়া ইংরাজিসমেত এই আইন প্রচার করিবেন। সকলেই দেখিবেন যে এই আইনটিতে নূতন কিছু নাই; সাবেক Lex Non Scripta কেবল লিপি বদ্ধ হইয়াছে মাত্র।

শ্রীমতী অনৃতসুন্দরী দাসী।

স্ত্রীস্বত্ব রক্ষণী সভার সম্পাদিকা।

THE MATRIMONIAL PENAL CODE.

CHAPTER 1.

Introduction.

Whereas it is expedient to provide a special Penal Code for the coercion of refractory husbands and others who dispute the supreme authority of Woman, it is hereby enacted as follows:

1. This Act shall be entitled the "Matrimonial Penal Code" and shall take effect on all natives of India in the married state.

CHAPTER 11.

Definitions.

2. A husband is a piece of moving and moveable property at the absolute disposal of a Woman.

Illustrations.

(a) A trunk or a workbox is not a husband, as it is not a moving, though a moveable piece of property.

দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন।

প্রথম অধ্যায়।

স্ত্রীদিগের অবাধ্য স্বামী প্রভৃতির সুশাসনের জন্য এক বিশেষ আইন করা উচিত, এই কারণ নিম্নের লিখিত মত আইন করা গেল।

১ ধারা। এই আইন "দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন" নামে খ্যাত হইবে। ভারতবর্ষীয় যে কোন দেশী বিবাহিত পুরুষের উপর ইহার বিধান খাটিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাধারণ ব্যাখ্যা।

২ধারা। কোন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধীন যে সচল অস্থাবর সম্পত্তি তাহাকে স্বামী বলা যায়।

উদাহরণ।

(ক) বাক্স তোরঙ্গ প্রভৃতিকে স্বামী বলা যায় না, কেন না যদিও সে সকল অস্থাবর সম্পত্তি বটে, তথাপি সচল নহে।

(b) Cattle are not husbands, for though capable of locomotion, they cannot be at the absolute disposal of any woman, as they often display a will of their own.

(c) Men in the married state, having no will of their own, are husbands.

3. A wife is a woman having the right of property in a husband.

Explanation.

The right of property inlcudes the right of flagellation.

4. "The married state" is a state of penance into which men voluntarily enter for sins committed in a previous life.

CHAPTER III.

Of Punishments.

5. The punishments to which offenders are liable under the provisions of this Code are;

FIRST, IMPRISONMENT.

Which may be either within the four walls of a bed-room, or within the four walls of a house.

(খ) গোরু বাছুরও স্বামী নহে, কেন না যদিও গোরু বাছুর সচল বটে, কিন্তু তাহাদের একটু স্বেচ্ছামতে কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং তাহারা কোন স্ত্রী-লোকের সম্পূর্ণ অধীন নহে।

(গ) বিবাহিত পুরুষেরাই স্বেচ্ছাধীন কোন কার্য্য করিতে পারেন না, এজন্য গোরু বাছুরকে স্বামী না ব-লিয়া তাঁহাদিগকেই স্বামী বলা যাইতে পারে।

৩ধারা। যে স্বামীর উপর যে স্ত্রীলোকের সম্পত্তি বলিয়া স্বত্ব আছে, সেই স্ত্রীলোক সেই স্বামীর পত্নী বা স্ত্রী।

অর্থের কথা।

সম্পত্তি বলিয়া যাহার উপর স্বত্বাধিকার থাকে- তা-হাকে মারপিট করিবারও স্বত্বাধিকার থাকিবে।

৪ধারা। পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের জন্য পুরুষের প্রায়-শ্চিত্ত বিশেষকে বিবাহ বলে।

তৃতীয় অধ্যায়।

দণ্ডের কথা।

৫ধারা। এই আইনের বিধান মতে অপরাধীদিগের নিম্নলিখিত দণ্ড হইতে পারে।

প্রথম। কয়েদ।

অর্থাৎ শয্যাগৃহের চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ, অথবা বাটীর চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ।

Imprisonment is of two discriptions, namely,

(1) Rigorous, that is, accompanied by hard words.

(2) Simple.

SECNDLY, Transportation, that is to another bed-room.

THIRDLY, Matrimonial servitude.

FOURTHLY, Forfeiture of pocket-money.

6. "Capital punishment" under this Code, means that the wife shall run away to her paternal roof, or to some other friendly house, with the intention of not returning in a hurry.

7. The following punishments are also provided for minor offences.

FIRST, Contemptuous silence on the part of the wife.

SECONDLY Frowns.

THIRDLY, Tears and lamentation.

FOURTHLY, Scolding, and abuse,

CHAPTER IV.

General Exceptions,

8. Nothing is an offence which is done by a wife.

কয়েদ দুই প্রকার।

(১) কঠিন তিরস্কারের সহিত।

(২) বিনা তিরস্কার।

দ্বিতীয়। শয্যান্তর প্রেরণ বা শয্যাগৃহান্তর প্রেরণ।

তৃতীয় পত্নীর দাসত্ব।

চতুর্থ। সম্পত্তিদণ্ড, অর্থাৎ নিজখরচের টাকা বন্ধ।

৬ধারা। এই আইনে "প্রাণদণ্ড" অর্থে বুঝাইবে, যে স্ত্রী বাপের বাড়ী কি ভাইয়ের বাড়ী চলিয়া যাইবেন, শীঘ্র আসিতে চাহিবেন না।

৭ ধারা। ক্ষুদ্র২ অপরাধের জন্য নিম্নলিখিত দণ্ড হইতে পারে।

প্রথম। মান।

দ্বিতীয়। ভ্রূকুটী।

তৃতীয়। অশ্রুবর্ষণ বা উচ্চৈঃস্বরে রোদন।

চতুর্থ। গালি তিরস্কার।

চতুর্থ অধ্যায়।

সাধারণ বর্জ্জিত কথা।

৮ধারা। স্ত্রীকৃত কোন ক্রিয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

9. Nothing is an offence which is done by a husband in obedience to the commands of a wife.

10. No person in the married state shall be entitled to plead any other circumstances as grounds of exemption from the provisions of the Matrimonial Penal Code.

CHAPTER V.

Of Abetment.

11. A person abets the doing of a matrimonial offence who

First, Instigates, pursuades, induces, or encourages a husband to commit that offence;

Secondly, Joins him in the commission of that offence, or keeps him company during its commission.

Explanation.

A man not in the married state or even a woman, may be an abettor.

Illustrations.

(a) A the husband of B, and C, an unmarried man, drink togather. Drinking is a matrimonial offence. C has abetted A.

৯ধারা। স্ত্রীর আজ্ঞানুসারে স্বামিকৃত কোন ক্রিয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

১০ধারা। ইহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ওজর করিয়া কোন বিবাহিত পুরুষ বলিতে পারিবেন না যে আমি দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইনানুসারে দণ্ডনীয় নই।

পঞ্চম অধ্যায়।

অপরাধের সহায়তার বিধি।

১১ধারা। যে কোন ব্যক্তি—

প্রথম। অন্য ব্যক্তিকে কোন দাম্পত্য অপরাধ করিতে প্রবৃত্তি দেয়, বা উৎসাহিত বা উত্ত্যক্ত করে

দ্বিতীয়। বা তৎসঙ্গে সেই অপরাধে লিপ্ত হয় বা সেই অপরাধ করার সময়ে তাহার সঙ্গে থাকে

তবে বলা যায় যে ঐ অপরাধের সহায়তা করিয়াছে।

অর্থের কথা।

অবিবাহিত পুরুষ বা কোন স্ত্রীলোকও দাম্পত্য অপরাধেব সহায়তা করিতে পারে।

উদাহরণ।

(ক) রাম, কামিনীর স্বামী। যদু অবিবাহিত পুরুষ। উভয়ে একত্রে মদ্যপান করিল। মদ্যপান একটি দাম্পত্য অপরাধ। যদু, রামের সহায়তা করিয়াছে।

(b) A the mother of B, the husband of C, persuades B to spend money in other ways than those which C approves.

As spending money in such ways is a matrimonial offence, A has abetted B.

12. When a man in the married state abets another man in the married state in a matrimonial offence, the abettor is liable to the same punishment as the principal. Provided that he can be so punished only by a competent court.

"Explanation."

A competent court means the wife having right of property in the offending husband.

13. Abettors who are females or male offenders not in the married state are liable to be punished only with scolding, abuse, frowns, tears and lamentations.

CHAPTER VI.

Of Offences against the State.

14. "The State" shall in this Code mean the married state only.

(খ) হরমণি, রামের মা। রাম কামিনীর স্বামী। কামিনী যেরূপে টাকা খরচ করিতে বলে সেরূপে খরচ না করিয়া, রাম হরমণির পরামর্শে অন্য প্রকার খরচ করিল। স্ত্রীর অনভিমত খরচ করা একটি দাম্পত্য অপরাধ। হরমণি তাহার সহায়তা করিয়াছে।

১২ ধারা। *যদি কোন বিবাহিত পুরুষ কোন দাম্পত্য অপরাধে অন্য বিবাহিত পুরুষের সহায়তা করে, তবে সে আসল অপরাধীর সঙ্গে সমান দণ্ডনীয়। কিন্তু তাহার দণ্ড উপযুক্ত আদালত নহিলে হইবে না।

অর্থের কথা।

ঐ ব্যক্তি যে স্ত্রীর সম্পত্তি, সেই স্ত্রীকেই উপযুক্ত আদালত বলা যায়।

১৩ ধারা। স্ত্রীলোক বা অবিবাহিত পুরুষ দাম্পত্য অপরাধের সহায়তা করিলে, তিরস্কার, ভ্রূকুটী, এবং অশ্রুবর্ষণ ও রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় মাত্র।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

স্ত্রী বিদ্রোহিতার অপরাধ।

১৪ধারা। (অনুবাদক অক্ষম)

15. Whoever wages war against his wife or attempts to wage such war or abets the waging of such war shall be punished capitally, that is by separation, or by transportation to another bed-room and shall forfeit all his pocket money.

16. Whoever induces friends or gains over children to side with him or otherwise prepares to wage war with the intention of waging war against the wife shall be punished by transportation to another bed-room and shall also be liable to be punished with scolding and with tears and lamentations.

17. Whoever shall render allegiance to any woman other than his wife shall be guilty of incontinence.

Explanation.

1. To show the slightest kindness to a young woman who is not the wife, is to render such young woman allegiance.

Illustration.

A is the husband of B, and C is a young woman. A likes C's baby because he is a nice child and gives him buns to eat. A has rendered allegiance to C

১৫ধারা। যে কেহ স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ করে, কি বিবাদ করিতে উদ্যোগ করে, কি বিবাদ করায় সহায়তা করে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে (অর্থাৎ স্ত্রী তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন) বা শয্যাগৃহ পৃথক্ হইবে এবং তাঁহার খরচের টাকা জব্দ হইবে।

১৬ধারা। যে কেহ বন্ধুবর্গকে মুরব্বি ধরিয়া বা সন্তানদিগকে বশীভূত করিয়া বা অন্য প্রকারে স্ত্রীর সহিত বিবাদ করিবার অভিপ্রায়ে বিবাদের উদ্যোগ করে, সে শয্যাগৃহান্তরে প্রেরিত হইবে, এবং তিরস্কার, অশ্রুবর্ষণ এবং রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে।

১৭ধারা। যে কেহ আপন স্ত্রী ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত, তাহার অপরাধের নাম লাম্পট্য।

প্রথম অর্থের কথা।

স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোন যুবতী স্ত্রীলোকের প্রতি কিছুমাত্র দয়া বা আনুকূল্য করিলেই লাম্পট্য গণ্য হইবে।

উদাহরণ।

রাম কামিনীর স্বামী। বামা অন্য এক যুবতী। বামার শিশু সন্তানটি দেখিতে সুন্দর বলিয়া, রাম তাহাকে আদর করে বা তাহার হাতে মিঠাই দেয়। রাম বামার প্রতি আসক্ত।

Explanation.

2. Wives shall be entitled to imagine offences under this section, and no husband shall be entitled to be acquitted on the ground that he has not committed the offence.

The simple accusation shall always be held to be couclusive proof of the offence.

EXPLANATION.

3. The right of imagining offences under this section shall be held to belong in generai to old wives, and to women with old and ugly husdands; and a young wife shall not be entitled to assume the right unless she can prove that she has a particularly cross temper, or was brought up a spoilt child or is herself supremely ugly.

18. Whoever is guilty of incontenence shall be liable to all the punishments mentioned in this Code and to other punishments not mentioned in the Code.

CHAPLER VII.

Of offences relating to the Army and Navy.

19. The army and navy shall in this Code mean the sons and the daughters and daughters-in-law.

অর্থের কথা।

দ্বিতীয়। স্বামীদিগকে নিষ্কারণে এ অপরাধে অপরাধী বিবেচনা করা, স্ত্রীলোকদিগের অধিকার রহিল। আমি এ অপরাধ করি নাই বলিয়া কোন স্বামী খালাস পাইতে পারিবে না।

"অপরাধ করিয়াছে" বলিলেই এ অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে।

অর্থের কথা।

তৃতীয়। নিষ্কারণে স্বামিগণকে এ অপরাধে অপরাধী বিবেচনা করিবার অধিকার, প্রাচীনা স্ত্রীদিগের পক্ষে বিশেষ রূপে বর্ত্তিবে, অথবা যাহাদিগের স্বামী কুৎসিত বা প্রাচীন, তাহাদিগের পক্ষে বর্ত্তিবে। যদি কোন যুবতী স্ত্রী এ অধিকার চাহেন, তবে তাঁহাকে অগ্রে প্রমাণ করিতে হইবে, যে তিনি নিজে বদমেজাজি, বা আদরে মেয়ে, বা তিনি নিজে কদাকারা।

১৮ধারা। যে কেহ লম্পট হইবে সে এই আইনের লিখিত সকল প্রকার দণ্ডের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে এবং তাহার অন্য দণ্ডও হইতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়।

পল্টন এবং নাবিকসেনা সম্বন্ধীয় অপরাধ।

১৯ধারা। এ আইনে পলটন্ অর্থে ছেলের দল। নাবিক সেনা ঝি বউ।

20. Whoever abets the committing of mutiny by a son or a daughter or a daughter-in-law shall be liable to be punished by scolding and tears and lamentations.

CHAPTER VIII.

OF OFFENCES AGAINST THE DOMESTIC TRANQUILLITY.

21. An assembly of two or more husbands is designated an unlawful assembly if the common object of such husbands is,

FIRST, To drink ,as defined below or to gamble or to commit any other matrimonial offence.

SECONDLY, To overawe by show of authority their wives from the exercise of the lawful authority of such wives.

THIRDLY, To resist the execution of a wife's order,

22. Whoever is a member of an unlawful assembly shall be punished by imprisonment with hard words and shall also be liable to contemptuous silence or to scolding.

২০ধারা। যে স্বামী, পুত্র বা কন্যা বা বধূকর্ত্তৃক গৃহিণীর প্রতি বিদ্রোহিতার সহায়তা করিবে, সে তিরস্কার ও রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে।

অষ্টম অধ্যায়।

গৃহমধ্যে শান্তি ভঞ্জনের অপরাধ।

২১ধারা। দুই কি তাহার অধিক বিবাহিত ব্যক্তির জনতা হইলে যদি জনতাকারীদের নিম্নের লিখিত কোন অভিপ্রায় থাকে তবে "বে-আইন মতের জনতা" বলা-যায়।

প্রথম। যদি মদ্যপান করা কি অন্য প্রকার দাম্পত্য অপরাধ করিবার অভিপ্রায় থাকে,

দ্বিতীয়। যদি আস্ফালন দ্বারা পত্নীদিগকে আইন মত ক্ষমতা প্রকাশ করণে নিবৃত্ত করার জন্য ভয় প্রদর্শন করার অভিপ্রায় থাকে,

তৃতীয়। যদি কোন স্ত্রীর আজ্ঞামত কর্ম্মের প্রতি-বন্ধক হইবার অভিপ্রায় থাকে,

২২ধারা। যে কেহ "বেআইন মতের জনতার ব্যক্তি" হয়, সে কঠিন তিরস্কারের সহিত কয়েদ হইবে, অথবা মান অথবা তিরস্কারের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে।

OF DRINKING WINE AND SPIRITS.

23. Any liquid kept in a bottle and taken in a glass vessel is wine and spirits.

24. Whoever has in his possession wine and spirits as above defined is said to drink.

EXPLANATION.

He is said to drink even though he never touch the liquid himself.

25. Whoever is guilty of drinking shall be punished with imprisonment of either description within the four walls of a bed-room during the evening hours and shall also be liable to scolding.

OF RIOTING.

26. Whoever shall speak in an ungentle voice to his wife shall be guilty of domestic rioting.

27. Whoever is guilty of domestic rioting shall be punished by contemptuous silence or by scolding or by tears and lamentations.

মদ্যপানের কথা।

২৩ধারা। যে কোন জলবৎ দ্রব্য বোতলে থাকে, এবং কাচের পাত্রে পীত হয় তাহা মদ্য।

২৪ধারা। উক্তরূপ মদ্য যে ঘরে রাখে সেই মদ্যপায়ী।

অর্থের কথা।

সে ঐ দ্রব্য স্বহস্তে স্পর্শ না করিলেও মদ্যপায়ী।

২৫ধারা। যে মদ্যপায়ী সে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শয্যাগৃহের চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ থাকিবে, এবং তিরস্কার প্রাপ্ত হইবে।

হাঙ্গামার কথা।

২৬ধারা যে কেহ স্ত্রীর প্রতি কর্কশ স্বরে কথা কহে, সে হাঙ্গামা করে।

২৭ধারা। যে কেহ গৃহমধ্যে হাঙ্গামা করিবে, তাহার সাজা মান বা তিরস্কার বা অশ্রুবর্ষণ ও রোদন।

বসন্ত এবং বিরহ।

রামী। সখি, ঋতুরাজ বসন্ত আসিয়া ধরাতলে উদয় হইয়াছেন; আইস আমরা বসন্ত বর্ণনা করি। বিশেষ আমরা উভয়েই বিরহিণী; পূর্ব্বগামিনী বিরহিণীগণ চিরকাল বসন্তবর্ণন করিয়া আসিয়াছেন, আইস আমরাও তাই করি।

বামী। সই, ভাল বলিয়াছ। আমরা বালিকা বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখিয়া কেবল কুটনো কুটিয়া মরিলাম, আইস অদ্য কাব্যালোচনা করি।

রামী। সই! তবে আরম্ভ করি। সখি! ঋতুরাজ বসন্তের সমাগম হইয়াছে। দেখ, পৃথিবী কেমন অনির্ব্বচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছেন। দেখ, চূত লতা কেমন নব মুকুলিত—

বামী। বৃক্ষে২ শজিনা খাড়া বিলম্বিত—

রামী। মলয় মারুত মৃদু২ প্রধাবিত—

বামী। তদ্বাহিত ধূলায় দন্ত কিচ্‌কিচিত।

রামী। দূর ছুঁড়ী—ওকি! শোন্। ভ্রমরগণ পুষ্পের উপর গুণ্২ করিতেছে—

বামী। মাছিগণ ভাতের উপর ভন২ করিতেছে—

রামী। বৃক্ষোপরে কোকিলগণ পঞ্চমস্বরে কুহূ২ করিতেছে—

বামী। গাজন তলায় ঢাকিগণ অষ্টমস্বরে চড়২ করিতেছে।

রামী। না ভাই, তোকে নিয়ে বসন্ত বর্ণন হয় না। আমি শ্যামীকে ডাকি। আয় সই শ্যামি আমরা বসন্ত বর্ণনা করি।

(শ্যামী আসিল)

শ্যামী। আমি ত সখি তোমাদের মত ভাল লেখা পড়া জানি না; একটু২ জানি মাত্র; আমি সকল বুঝিতে পারিব না—আমাকে মধ্যে২ বুঝাইয়া দিতে হবে।

রামী। আচ্ছা। দেখ সখি, বসন্ত কি অপূর্ব্ব সময়! কেমন চূতলতা সকল নব মুকুলিত—

শ্যামী। সই, আঁবের গাছই দেখিয়াছি। আঁবের লতা কোন গুলা?

রামী। আঁবের লতা আছে শুনিয়াছি কিন্তু কখন চক্ষে দেখি নাই। দেখি না দেখি, চূতলতা ভিন্ন চূত বৃক্ষ কখন পড়ি নাই। তবে চূতলতাই বলিতে হইবে—চূত বৃক্ষ বলা হইবে না।

শ্যামী। তবে বল।

রামী। চূত লতিকা নব মুকুলিত হইয়া—

শ্যামী। সই! এই বলিলে চূত লতা—আবার লতিকা হইল কেন?

রামী। আরও কিছু মিষ্ট হইল। চূত লতিকা নব মুকুলিত হইয়া চারিদিকে সৌগন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে—

বামী। ভাই, আঁবের বোল যে বসন্ত কালে চুঁইয়ে গিয়া কড়েয়া ধরে।

শ্যামী। বলিলে কি হয়, কেমন মিষ্ট হইল দেখ দেখি।

রামী। তাহাতে ভ্রমরগণ মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া ঝঙ্কার করিতেছে, শুনিয়া আমাদিগের প্রাণ বাহির হই-তেছে।

শ্যামী। আহা! সখি, সত্যই বলিয়াছ। সই, ভ্রমর কাকে বলে?

রামী। মর্ নেকি, তাও জানিস্‌নে? ভ্রমর বলে ভোমরাকে।

শ্যামী। ভোম্‌রা কোন গুলো ভাই?

রামী। ভোম্‌রা বলে ভিম্‌রুল্‌কে!

শ্যামী। তা ভাই ভিম্‌রুল্ আঁবের বোল দেখে

পাগল হয় কেন? ভিমরুলের পাগলামি কেমন তর? ওরা কি আবোল তাবোল বকে?

রামী। কে বলেছে পাগল হয়?

শ্যামী। ঐ যে তুমি বলিলে "উন্মত্ত হইয়া ঝঙ্কার করিতেছে,"

রামী। কোন্ শালী আর তোদের কাছে বসন্ত বর্ণনা করিবে!

শ্যামী। ভাই রাগ কর কেন? তুমি বেশী লেখা পড়া শিখেছ, আমি কম শিখেছি—আমায় বুঝাইয়া দিলেই ত হয়। সকলেই কি তোমার মত রসিকে?

রামী। (সাহঙ্কারে) আচ্ছা, তবে শোন্। ভ্রমরগণ মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া ঝঙ্কার করিতেছে। তাহাদিগের গুণ্২ রবে আমাদের প্রাণ বাহির হইতেছে।

শ্যামী। সই, ভোমরার ডাক "গুণ্ গুণ্" না "ভোঁ ভোঁ"?

রামী। কবিরা বলেন, "গুণ্ গুণ্।"

শ্যামী। তবে গুণ্ গুণ ই বটে। তা, উহাতে আমাদের প্রাণ বাহির হয় কেন? ভিমরুল কামড়াইলে প্রাণ বাহির হয় জানি, কিন্তু ভিমরুল ডাকিলেও কি মরিতে হইবে?

রামী। এ পর্য্যন্ত সকল বিরহিণীগণ গুণ২ রবে মরিয়া আসিতেছে; তুই কি পীর যে মরবি না?

বামী। আচ্ছা ভাই, শাস্ত্রে যদি লেখে ত নাহয় মরিব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কেবল কি ভিমরুলের ডাকে মরিতে হইবে, না বোলতা মৌমাছি গুব্‌রে পোকার ডাক শুনিলেও অন্তর্জলে শুইব?

রামী। কবিরা শুধু ভ্রমরের রবেই মরিতে বলেন।

বামী। কবিদের বড় অবিচার। কেন, গুব্‌রেপোকা কি অপরাধ করেছে?

রামী। তোর মর্‌তে হয় মরিস্ এখন শোন্।

বামী। বল।

রামী। কোকিলগণ বৃক্ষে বসিয়া পঞ্চম স্বরে গান করিতেছে।

শ্যামী। পঞ্চমস্বর কি ভাই?

রামী। কোকিলের স্বরের মত।

শ্যামী। আর কোকিলের স্বর কেমন?

রামী। পঞ্চম স্বরের মত।

শ্যামী। বুঝিয়াছি। তার পর বল।

রামী। কোকিলগণ বৃক্ষে বসিয়া পঞ্চম স্বরে গান করিতেছে; তাহাতে বিরহিণীর অঙ্গ জর২ হইতেছে।

বামী। আর কুঁক্ড়োর পঞ্চম স্বরে অঙ্গ কেমন করে?

রামী। মরণ আর কি, কুঁক্ড়োর আবার পঞ্চমস্বর কি লো?

বামী। আমার তাতেই অঙ্গ জ্বর২ হয়। কুঁক্ড়া ডাকিলেই মনে হয় যে তিনি বাড়ী এলেই আমায় ঐ সর্ব্বনেশে পাকী বাঁধিয়া দিতে হবে।

রামী। তার পর মলয় সমীরণ। মৃদু২ মলয় সমীরণে বিরহিণী সিহরিয়া উঠিতেছে।

শ্যামী। শীতে?

রামী। না—বিরহে। মলয় সমীরণ অন্যের পক্ষে শীতল, কিন্তু আমাদের পক্ষে অগ্নিতুল্য।

বামী। সই, তা সকলের পক্ষেই। এই চৈত্র মাসের দুপুরে রৌদ্রের বাতাস আগুনের হল্কা বলিয়া কাহার বোধ হয় না?

রামী। ও লো আমি সে বাতাসের কথা বলিতেছি না।

শ্যামী। বোধ হয় তুমি উত্তুরে বাতাসের কথা বলিতেছ। উত্তুরে বাতাস যেমন ঠাণ্ডা, মলয় বাতাস তেমন নয়।

রামী। বসন্তানিলস্পর্শে অঙ্গ সিহরিয়া উঠে।

বামী। গায়ে কাপড় না থাকিলে উত্তুরে বাতাসেও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।

রামী। মর ছুঁড়ি, বসন্তকালে কি উত্তুরে বাতাস বয়, যে আমি বসন্তবর্ণনায় উত্তুরে বাতাসের কথা বলিব?

বামী। উত্তুরে বাতাসই এখন বয়। দেখ এখন কার যত ঝড় সব উত্তুরে। আমার বোধ হয়, বসন্ত বর্ণনে উত্তুরে বাতাসের প্রসঙ্গ করাই উচিত। আইস আমরা বঙ্গদর্শনে লিখিয়া পাঠাই, যে ভবিষ্যতে কবিগণ বসন্তবর্ণনে মলয় বাতাস ত্যাগ করিয়া উত্তুরে ঝড়ের বর্ণনা করেন।

রামী। তাহাহইলে বিরহীদের কি উপায় হইবে? তাহারা কি লইয়া কাঁদিবে?

শ্যামী। সখি, তবে থাক। এক্ষণে তোমার বসন্ত বর্ণনা—উহুঃ উহুঃ সখি! মোলেম, মোলেম, গেলেম রে! গেলেম রে!

[ভূমে পতন-চক্ষু মুদিত]

রামী। কেন, কেন, সই, কি হয়েছে? হঠাৎ অমন হলে কেন?

শ্যামী। (চক্ষু বুজিয়া) ঐ শুনিলে না? ঐ সেওড়া গাছে কোকিল ডাকিয়াছে।

রামী। সখি আশ্বস্তা হও, আশ্বস্তা হও,—তোমার

প্রাণকান্ত শীঘ্রই আসিবেন। সই, আমারও ঐরূপ যন্ত্রণা হইতেছে। নাথের সন্দর্শন ভিন্ন আমার বাঁচা ভার হইয়া উঠিয়াছে। (চক্ষু মুছিয়া) পাড়ার সকল পুকুরের যদি জল না শুকাইত, তবে এত দিন ডুবিয়া মরিতাম। হে হৃদয় বল্লভ, জীবিতেশ্বর! হে রমণীজন মনোমোহন! হে নিশা-শেষোন্মেষোন্মুখকমলকোরকোপমোত্তেজিত হৃদদশনা! হে অতলজলদলতলন্যস্তরত্নরাজীবমহামূল্য পুরুষরত্ন! হে কামিনীকণ্ঠবিলম্বিত রত্নহারাধিক প্রাণাধিক! আর প্রাণ বাঁচে না। আমি অবলা, সরলা, চঞ্চলা, নিষ্কলা, দীনা, হীনা, ক্ষীণা, পীনা, নবীনা, শ্রীহীনা,—আর প্রাণ বাঁচে না। আর কত দিন তোমার আশাপথ চাহিয়া থাকিব? যেমন সরোবরে সরোজিনী ভানুর আশা করে, যেমন কুমুদিনী কুমুদ বান্ধবের আশা করিয়া থাকে, যেমন চাতক মেঘের জলের আশা করিয়া থাকে—আমি তেমনি তোমার আশা করিতেছি।

শ্যামী। (কাঁদিতে২) যেমন রাখাল, হারাণ গোরুর আশায় দাঁড়াইয়া থাকে, যেমন বালকে ময়রার দোকান হইতে লোক ফিরিবার আশায় দাঁড়াইয়া থাকে, যেমন অশ্ব তৃণাঙ্কুরক গ্রাসকটের আশা করিয়া থাকে, হে প্রাণবন্ধো! আমি তেমনি তোমার আশা করিয়া আছি।

যেমন মাছ ধুইতে গেলে পরিচারিকার পশ্চাৎ২ মার্জ্জার গমন করে, তেমনি তোমার পশ্চাৎ২ আমার মন গিয়াছে। যেমন উচ্ছিষ্টাবশেষ ফেলিতে গেলে, বুভুক্ষু কুক্কুর পশ্চাৎ২ যায়, আমার অবশ চিত্ত তেমনি তোমার পশ্চাৎ গিয়াছে। যেমন কলুর ঘানিগাছে প্রকাণ্ডাকার বলদ ঘুরিতে থাকে, তেমনি আশা নামে আমার প্রকাণ্ড বলদ, তোমার প্রণয় রূপ ঘানিগাছে ঘুরিতেছে। যেমন লোহার চাটুতে তপ্ত তৈলে কই মাছ ভাজে, তেমনি এই বিরহ চাটুতে বসন্ত রূপ তপ্ত তৈলে আমার হৃদয় রূপ কই মাছকে অহরহ ভাজিতেছে। যেমন এই বসন্তকালের তাপে শজিনা খাড়া ফাটিতেছে, তোমার বিরহ সন্তাপে তেমনি আমার হৃদয় খাড়া ফাটিতেছে। যেমন এক লাঙ্গলে যোড়া গরু যুড়িয়া ক্ষেত্রকে চাসা ক্ষতবিক্ষত করে, তেমনি এক প্রেম লাঙ্গলে বিরহ এবং বারস্ত্রীভক্তিরূপ যোড়া গরু যুড়িয়া আমার স্বামী চাসা আমার হৃদয়ক্ষেত্রকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছেন। কথায় আর কি বলিব। বিরহের জ্বালায় আমার ডালে নুণ হয় না, পাণে চুণ হয় না, ঝোলে ঝাল হয় না, ক্ষীরে মিষ্ট হয় না। সখি বিরহের দুঃখ যে দিন২ মনে হয়, সে দিন আমি তিন বেলা বই খাইতে পারি না, আমার দুধের বাটি অমনি পড়িয়া থাকে। (চক্ষু মুছিয়া)

সখি, তোমার বসন্ত বর্ণনা সমাপ্ত কর, দুঃখের কথায় আর কাজ নাই।

রামী। আমার বসন্ত বর্ণনা শেষ হইয়াছে। ভ্রমর, কোকিল, মলয় মারুত এবং বিরহ এই চারিটির কথাই বলিয়াছি আর বাঁকি কি?

বামী। দাঁড় আর কলসী!

সুবর্ণ গোলক।

কৈলাস শিখরে, নবমুকুলশোভিত দেবদারুতলায় শার্দ্দূলচর্ম্মাসনে বসিয়া হরপার্ব্বতী পাশা খেলিতেছিলেন। বাজি একটি স্বর্ণ গোলক। মহাদেবের খেলায় দোষ এই—আড়ি মারিতে পারেন না—তাহা পারিলে সমুদ্রমন্থনের সময়ে বিষের ভাগটা তাঁহার ঘাড়ে পড়িত না। গৌরী আড়ি মারিতে পটু—প্রমাণ পৃথিবীতে তাঁহার তিন দিন পূজা। আর খেলায় যত হউক না হউক, কান্নাইয়ে অদ্বিতীয়া, কেননা তিনিই আদ্যাশক্তি। মহাদেবের ভাল দান পড়িলে কাঁদিয়া হাট বাধান—আপনার যদি পড়ে পাঁচ দুই সাত, তবে হাঁকেন পোহা-বারো। হাঁকিয়া তিন চক্ষে মহাদেবের প্রতি কটাক্ষ

করেন—যে কটাক্ষে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হয়, তাহার গুণে মহাদেব দান দেখিয়াও দেখিতে পায়েন না। বলা বাহুল্য যে দেবাদিদেবের হার হইল। ইহাই রীতি।

তখন মহাদেব পার্ব্বতীকে স্বীকৃত কাঞ্চন গোলক প্রদান করিলেন। উমা তাহা গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন। দেখিয়া, পঞ্চানন ভ্রূকুটী করিয়া কহিলেন, "আমার প্রদত্ত গোলক ত্যাগ করিলে কেন?"

উমা কহিলেন, "প্রভো! আপনার প্রদত্ত গোলক অবশ্য কোন অপূর্ব্ব শক্তিবিশিষ্ট এবং মঙ্গলপ্রদ হইবে। মনুষ্যের হিতার্থে তাহা প্রেরণ করিয়াছি।"

গিরিশ বলিলেন, "ভদ্রে! প্রজাপতি, বিষ্ণু, এবং আমি, এই তিন জনে যে সকল নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া সৃষ্টি-স্থিতিলয় করিতেছি তাহার ব্যতিক্রমে কখন মঙ্গল হয় না। যে মঙ্গল হইবার, তাহা সেই সকল নিয়মাবলীর বলেই ঘটিবে। কাঞ্চন গোলকের কোন প্রয়োজন নাই যদি ইহার কোন মঙ্গলপ্রদ গুণ হয়, তবে নিয়ম ভঙ্গ দোষে লোকের অনিষ্ট হইবে। তবে তোমার অনুরোধে উহাকে একটি বিশেষ গুণযুক্ত করিলাম। বসিয়া উহার কার্য্য দর্শন কর।"

কালীকান্ত বসু বড় বাবু। বয়স বৎসর পঁইত্রিশ, দেখিতে সুন্দর পুরুষ, কয় বৎসর হইল পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী কামসুন্দরীর বয়ঃক্রম আঠার বৎসব। তাঁহার পত্নী তাহার পিতৃভবনে ছিল। কালীকান্ত বাবু স্ত্রীর সম্ভাষণে শ্বশুর বাড়ী যাইতে ছিলেন। শ্বশুর বিশেস সম্পন্ন ব্যক্তি—গঙ্গাতীরবর্ত্তী গ্রামে বাস। কালীকান্ত, ঘাটে নৌকা লাগাইয়া পদব্রজে যাইতে ছিলেন, সঙ্গে রামা চাকর একটা পোর্টমাণ্টো বহিয়া যাইতে ছিল। পথিমধ্যে কালীকান্ত বাবু দেখিলেন একটি স্বর্ণগোলক পড়িয়া আছে। বিস্মিত হইয়া তাহা উঠাইয়া লইলেন। দেখিলেন, সুবর্ণ বটে। প্রীত হইয়া তাহা ভৃত্য রামাকে রাখিতে দিলেন; বলিলেন, “এটা সোণার দেখিতেছি। কেহ হারাইয়া থাকিবে। যদি কেহ খোঁজ করে, বাহির করিয়া দিব। নহিলে বাড়ী লইয়া যাইব। এখন রাখ্।”

রামা বস্ত্রমধ্যে গোলকটি লুকাইয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে, পথে পোর্টমাণ্টো নামাইল। পরে কালীকান্ত বাবুর হস্ত হইতে গোলকটি গ্রহণ করিয়া বস্ত্রমধ্যে লুকাইল।

কিন্তু রামা আর পোর্টমাণ্টো মাথায় তুলিল না।

কালীকান্ত বাবু স্বয়ং তাহা উঠাইয়া মাথায় করিলেন। রামা অগ্রসর হইয়া চলিল, বাবু মোট মাথায় পশ্চাৎ২ চলিলেন। তখন রামা বলিল, "ওরে, রামা।"

বাবু বলিলেন, "আজ্ঞা?" রামা বলিল, "তুই বড় বেআদব, দেখিস্ যেন আমার শ্বশুর বাড়ী গিয়া বেঅদবি করিস্ না। তাহারা ভদ্রলোক।"

বাবু বলিলেন, "আজ্ঞে তাকি পারি? আপনি হচ্চেন মুনিব—আপনার কাছে কি বেআদবি করিতে পারি।"

কৈলাসে গৌরী বলিলেন, "প্রভো, আমিত কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা। আপনার স্বর্ণগোলকের কি গুণ এ?"

মহাদেব বলিলেন, "গোলকের গুণ চিত্তবিনিময়। আমি যদি নন্দীর হাতে এই গোলক দিই, তবে নন্দী ভাবিবে, আমি মহাদেব, আমাকে ভাবিবে নন্দী; আমি ভাবিব আমি নন্দী, নন্দীকে ভাবিব মহাদেব। রামা ভাবিতেছে, আমি কালীকান্ত বসু; কালীকান্তকে ভাবিতেছে, এ রামা চাকর। কালীকান্ত ভাবিতেছে, আমি রামা খানসামা, রামাকে ভাবিতেছে কালীকান্ত বাবু।"

কালীকান্ত বাবু যখন শ্বশুর বাড়ী পৌছিলেন, তখন

তাঁহার শ্বশুর অন্তঃপুরে। কিন্তু বাহিরে একটা গণ্ডগোল উঠিল। দ্বারবান্ রামদীন পাঁড়ে বলিতেছে, "আরে ও খানসামাজি, তোম্ ছুঁয়া মৎ বইঠিও—তোম্ হামারা পাশ আও।" শুনিয়া রামা গরম হইয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিতেছে, "যা বেটা মেড়ুয়াবাদী যা—তোর আপনার কাজ করগে।"

দ্বারবান্ পোর্টমাণ্টো নামাইয়া দিল। কালীকান্ত বলিল, "দরওয়ান জি, বাবুকে অমন করিয়া অপমান করিও না। উনি রাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন।"

দ্বারবান্ জামাই বাবুকে চিনিত, খানসামাকে চিনিত না। কালীকান্তের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া, মনে করিল, যেখানে জামাই বাবুই ইহাকে বাবু বলিতেছেন, সেখানে ইনি কোন ছদ্মবেশী বড় লোক হইবেন। দ্বারবান্ তখন ভক্তিভাবে রামাকে যুক্তকরে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, "গোলাম কি কসুর মাফ কি জিয়ে!" রামা কহিল, "আচ্ছা তামাকু ভেজ দেও!"

শ্বশুর বাড়ীর খানসামা উদ্ধব, অতি প্রাচীন পুরাতন ভৃত্য। সেই বাঁধা হুঁকায় তামাকু সাজিয়া আনিল। রামা, তাকিয়ায় হেলান দিয়া, তামাকু খাইতে লাগিল। কালীকান্ত চাকরদের ঘরে গিয়া, কলিকায় তামাকু খাইতে

লাগিল। উদ্ধব বিস্মিত হইয়া কহিল "দাদা ঠাকুর এ কি এ?" কালীকান্ত কহিল, "ওঁর সাক্ষাতে কি তামাকু খাইতে পারি?"

উদ্ধব গিয়া অন্তঃপুরে কর্ত্তাকে সম্বাদ দিল, "জামাই-বাবু আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে একজন কে ছদ্মবেশী মহাশয় এসেছেন—জামাইবাবু তাঁকে বড় মানেন, তাঁর সাক্ষাতে তামাকু পর্য্যন্ত খান না।"

কর্ত্তা নীলরতন বাবু শীঘ্র বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। কালীকান্ত তাঁহাকে দেখিয়া দূর হইতে একটি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সরিয়া গেল। রামা আসিয়া নীলরতনের পায়ের ধূলা লইয়া কোলাকুলি করিল। নীলরতন ভাবিল, "সঙ্গের লোকটা সভ্যভব্য বটে—তবে জামাই বাবা-জিকে কেমন২ দেখিতেছি।"

নীলরতন বাবু রামাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিতে বসিলেন, কিন্তু কথা বার্ত্তা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এদিকে অন্তঃপুর হইতে জলযোগের স্থান হইয়াছে বলিয়া পরিচারিকা কালীকান্তকে ডাকিতে আসিল। কালী-কান্ত বলিল, "বাপরে আমি কি বাবুর আগে জল খেতে পারি। আগে বাবুকে জল খাওয়াও। তার পর আমার হবে এখন। আমি, মা ঠাকুরুণ, আপনাদের খাচ্চিইত।"

"মাঠাকুরুণ" শুনিয়া পরিচারিকা মনে করিল, "জামাইবাবু আমাকে একজন শাশুড়ী টাশুড়ী মনে করিয়াছেন—না করবেন কেন, আমাকে ভাল মানুষের মেয়ে বইত আর ছোট লোকেব মেয়ের মত দেখায় না। ওঁরা দশটা দেখেছেন—মানুষ চিনতে পারেন—কেবল এই বাড়ীর পোড়া লোকেই মানুষ চেনে না।" অতএব বিন্দী চাকরাণী জামাইবাবুর উপর বড় খুসি হইয়া অন্তঃপুরে গিয়া বলিল, "জামাইবাবুর বিবেচনা ভাল— সঙ্গের মানুষটি না খেলে কি তিনি খেতে পারেন—তা আগে তাঁকে জল খাওয়াও তবে জামাই খাবেন।"

বাড়ীর গৃহিণী মনে ভাবিলেন, "সে উপরি লোক, তাহাকে বাড়ীর ভিতর আনিয়া জল খাওয়ান হইতে পারে না। জামাইকেও বাহিরে খাওয়ান হইতে পারে না। তা, তার যায়গা হউক, বাহিরে; আর জামাইয়ের যায়গা হউক, ভিতরে।" গৃহিণী সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। রামা বাহিরে জলযোগের উদ্যোগ দেখিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইল, ভাবিল "একি অলৌকিকতা!" এদিকে দাসী কালীকান্তকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিল। ঘরের ভিতর স্থান হইয়াছে, কিন্তু কালীকান্ত উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল, "আমাকে ঘরের ভিতর কেন? আমাকে এইখানে

হাতে দুটো ছোলা গুড় দাও, খেয়ে একটু জল খাই।" শুনিয়া শ্যালীরা বলিল, "বোসজা মশাই যে এবার অনেক রকম রসিকতা শিখে এয়েছ দেখ্‌তে পাই।" কালীকান্ত কাতর হইয়া বলিল, "আজ্ঞে আমাকে ঠাট্টা করেন কেন, আমি কি আপনাদের তামাসার যোগ্য?" একজন প্রাচীনা ঠাকুরাণীদিদি বলিল, "আমাদের তামাসার যোগ্য কেন?—যার তামাসার যোগ্য তার কাছে চল।" এই বলিয়া কালীকান্তের হাত ধরিয়া হুড়হুড় করিয়া টানিয়া ঘরের ভিতর লইয়া আসিল।

সেখানে কালীকান্তের ভার্য্যা কামসুন্দরী দাঁড়াইয়া ছিল; কালীকান্ত তাহাকে দেখিয়া প্রভুপত্নী মনে করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

কামসুন্দরী দেখিয়া, চন্দ্রবদনে মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "ওকি ও রঙ্গ—এ আবার কোন্ ঠাট্ শিখিয়া আসিয়াছ?" শুনিয়া কালীকান্ত কাতর হইয়া কহিল, "আজ্ঞে আমার সঙ্গে অমন সব কথা কেন—আমি আপনার চাকর—আপনি মুনিব।"

রসিকা কামসুন্দরী বলিল, "তুমি চাকর, আমি মুনিব, সে আজ না কাল? যতদিন আমার বয়স্ আছে ততদিন এই সম্পর্কই থাকিবে। এখন জল খাও।"

কালীকান্ত মনে করিল, "বাবা, এঁর কথার ভাব যে কেমন কেমন। আমাদের বাবু যে একটা গেছো মেয়ের হাতে পড়েছেন দেখ্‌তে পাই! তা, আমার সরাই ভাল।" এই ভাবিয়া কালীকান্ত পুনর্ব্বার ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, দেখিয়া কামসুন্দরী আসিয়া তাঁহার গাত্রবস্ত্র ধরিল, বলিল, "ওরে আমার সোণার চাঁদ! আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক! আমার কাছ থেকে আর পলাতে হয় না।" এই বলিয়া কামসুন্দরী স্বামীকে আসনের দিকে টানিতে লাগিল।

কালীকান্ত আন্তরিক কাতরতার সহিত হাত যোড় করিয়া বলিতে লাগিল, "দোহাই বৌঠাকুরাণি, আপনার সাত দোহাই—আমাকে ছাড়িয়া দিন—আপনি আমার স্বভাব জানেন না—আমি সে চরিত্রের লোক নই।" কামসুন্দরী হাসিয়া বলিল, "তুমি যে চরিত্রের লোক আমি বেশ জানি—এখন জল খাও।"

কালীকান্ত বলিল, "যদি আপনার কাছে কেহ আমার এমন নিন্দা করিয়া থাকে, তবে সে ঠক—ঠকাম করিয়াছে। আপনার কাছে হাতযোড় করিতেছি, আপনি আমার গুরুজন—আমায় ছাড়িয়া দিন।"

কামসুন্দরী রসিকতাপ্রিয়, মনে করিল, যে এ একতর নূতন রসিকতা বটে। বলিল, "প্রাণাধিক, তুমি কত রসিকতা শিখিয়া আসিয়াছ, তাহা বুঝা যাইবে।" এই বলিয়া স্বামীর দুই হস্ত ধারণ করিয়া আসনে বসাইবার জন্য টানিতে লাগিল।

হস্তধারণ মাত্র, কালীকান্ত সর্ব্বনাশ হইল মনে করিয়া "বাবারে, গেলামরে, এগোরে, আমায় মেরে ফেল্লেরে" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। চীৎকার শুনিয়া গৃহস্থ সকলে ভীত হইয়া দৌড়িয়া আসিল। মা, ভগিনী, পিসী প্রভৃতিকে দেখিয়া, কামসুন্দরী স্বামীর হস্ত ছাড়িয়া দিল। কালীকান্ত অবসর পাইয়া, উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

গৃহিণী কামসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লা কামি—জামাই অমন করে উঠলো কেন? তুই কি মেরেছিস্?"

বিস্মিতা কামসুন্দরী মর্ম্মপীড়িতা হইয়া কহিল, "মারিব কেন। আমি মারিব কেন—আমার যেমন পোড়া কপাল!" ক্রমে ক্রমে স্বর কাঁদনিতে চড়িতে লাগিল—"আমার যেমন পোড়া কপাল—কোন্ আবাগী আমার সর্ব্বনাশ করেছে—কে ওষুধ করেছে—" বলিতে বলিতে কামসুন্দরী কাঁদিয়া হাট লাগাইল।

সকলেই বলিল, "হাঁ। তুই মেরেছিস্ নহিলে অমন করে কাতরাবে কেন?" এই বলিয়া সকলে, কামকে "পাপিষ্ঠা" "ডাইনী" "রাক্ষসী" ইত্যাদি কথায় ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। কামসুন্দরী বিনাপরাধে নিন্দিতা ও ভর্ৎসিতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে গিয়া দ্বার দিয়া শুইয়া পড়িল।

এদিকে কালীকান্ত বাহিরে আসিয়া দেখিল, যে বড় একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিয়াছে। নীলরতন বাবু স্বয়ং, এবং দ্বারবান্, ও উদ্ধব সকলে পড়িয়া যে যেখানে পাইতেছে, সে সেইখানে রামাকে প্রহার করিতেছে; কিল, লাথি, ও চাপড়ের বৃষ্টির মধ্যে রামা চাকর কেবল, বলিতেছে, "ছেড়েদেরে বাবারে, জামাই মারে এমন কখন শুনি নাই, আমার কি—তোদেরই মেয়েকে একাদশী করতে হবে।" নিকটে দাঁড়াইয়া তরঙ্গ চাক্‌রাণী হাসিতেছে, সে সর্ব্বদা কালীকান্ত বাবুর বাড়ীতে যাতায়াত করিত, সে রামাচাকরকে চিনিত, সেই বলিয়া দিয়াছে। কালীকান্ত বাবু মারপিট দেখিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় উঠানময় বেড়াইতে লাগিল, বলিতে লাগিল, "কি সর্ব্বনাশ হইল! বাবুকে মারিয়া ফেলিল।" ইহা দেখিয়া নীলরতন বাবু আরও কোপাবিষ্ট হইয়া রামাকে

বলিতে লাগিলেন, "তুই বেটাই জামাইকে কি খাওয়াইয়া পাগল করিয়া দিয়াছিস্—মার বেটাকে জুতো।" এই কথা বলায়, যেমন শ্রাবণ মাসে বৃষ্টির উপর বৃষ্টি চাপিয়া আইসে, তেমনি নির্দ্দোষী রামার উপর প্রহার বৃষ্টি চাপিয়া আসিল। মারপিটের চোটে বস্ত্রমধ্য হইতে লুকান স্বর্ণ গোলকটি পড়িয়া গেল। দেখিয়া তরঙ্গ চাক্‌রাণী তাহা কুড়াইয়া লইয়া নীলরতন বাবুর হস্তে দিল। বলিল, "ওমিন্সে চোর! দেখুন ও একটা সোণার তাল চুরি করিয়া রাখিয়াছে।" "দেখি" বলিয়া নীলরতন বাবু স্বর্ণগোলক হস্তে লইলেন,—অমনি তিনি রামাকে ছাড়িয়া দিয়া, সরিয়া দাঁড়াইয়া, কোঁচার কাপড় খুলিয়া মাথায় দিলেন; তরঙ্গও মাথার কাপড় খুলিয়া, কোঁচা করিয়া পরিয়া, পাদুকা হস্তে রামাকে মারিতে প্রবৃত্ত হইল।

উদ্ধব তরঙ্গকে বলিল, "তুই মাগি আবার এর ভিতর এলি কেন?"

তরঙ্গ বলিল, "কাকে মাগি বলিতেছিস্?" উদ্ধব বলিল, "তোকে।"

"আমাকে ঠাট্টা?" এই বলিয়া তরঙ্গ মহাক্রোধে হস্তের পাদুকার দ্বারা উদ্ধবকে প্রহার করিল। উদ্ধবও

ক্রুদ্ধ হইয়া, স্ত্রীলোককে মারিতে না পারিয়া, নীলরতন বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখুন্ দেখি কর্ত্তা মহাশয় মাগির কত বড় স্পর্দ্ধা, আমাকে জুতা মারে!" কর্ত্তা তখন, একটু খানি ঘোমটা টানিয়া একটু রসের হাসি হাসিয়া, মৃদুস্বরে কহিলেন, তা মেরেছেন, মেরেছেন, তুমি রাগ করিও না। মুনিব—মারতে পারেন।"

শুনিয়া উদ্ধব আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "ও আবার কিসের মুনিব—ওও চাকর, আমিও চাকর! আপনি এমনি আজ্ঞা করেন! আমি আপনারই চাকর, ওর চাকর কেন হব? আমি এমন চাকরি করি না।"

শুনিয়া কর্ত্তা আবার একটু মধুর হাসি হাসিয়া, বলিলেন, "মরণ আর কি, বুড়ো বয়সে মিন্সের রস দেখ? আমার চাকর—আবার তুমি কিসে হতে গেলে?"

উদ্ধব অবাক্ হইল, মনে করিল "আজ কি পাগলের পাড়া পড়িয়াছে নাকি?" উদ্ধব বিস্মিত হইয়া রামাকে ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

এমত সময়ে বাড়ীর গোরক্ষক গোবর্দ্ধন ঘোষ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তরঙ্গের স্বামী। সে তরঙ্গের অবস্থা ও কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইল—তরঙ্গ তাহাকে গ্রাহ্যও করিল না। এদিগে কর্ত্তামহাশয়

গোবর্দ্ধনকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া এক পাশে দাঁড়াইলেন। গোবর্দ্ধনকে আড়ে আড়ে দেখিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "তুমি উহার ভিতর যাইও না।" গোবর্দ্ধন তরঙ্গের আচরণ দেখিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিল—সে কথা তাহার কাণে গেল না: সে তরঙ্গের চুল ধরিতে গেল। "নচ্ছার মাগি, তোর হায়া নেই" এই বলিয়া গোবর্দ্ধন অগ্রসর হইতেছিল, দেখিয়া, তরঙ্গ বলিল, "গোবরা তুইও কি পাগল হয়েছিস না কি? যা গোরুর যাব দিগে যা।" শুনিয়া গোবর্দ্ধন, তরঙ্গের কেশাকর্ষণ করিয়া উত্তম মধ্যম আরম্ভ করিল। দেখিয়া নীলরতন বাবু বলিলেন, "মা! পোড়া কপালে মিন্সে কর্ত্তাকে ঠেঙ্গিয়া খুন করলে।" এদিগে তরঙ্গও ক্রুদ্ধ হইয়া, "আমার গায়ে হাত তুলিস" বলিয়া গোবর্দ্ধনকে মারিতে আরম্ভ করিল। তখন একটা বড় গোলযোগ হইয়া উঠিল। শুনিয়া পাড়ার প্রতিবাসী রাম মুখোপাধ্যায় গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম মুখোপাধ্যায় একটা স্বর্ণগোলক পড়িয়া আছে দেখিয়া গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়া বলিলেন; "দেখুন দেখি মহাশয় এটা কি?"

কৈলাসে পার্ব্বতী বলিলেন, "প্রভো! আপনার গোলক সম্বরণ করুন—ঐ দেখুন! গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় বৃদ্ধ রাম মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া রামের বৃদ্ধা ভার্য্যাকে পত্নী সম্বোধনে কৌতুক করিতেছে। আর রাম মুখোপাধ্যায়ের পরিচারিকা, তাহার আচরণ দেখিয়া তাহাকে সম্মার্জ্জনী প্রহার করিতেছে। এদিগে বৃদ্ধ রাম মুখোপাধ্যায়, আপনাকে যুবা গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মনে করিয়া, তাহার অন্তঃপুরে গিয়া তাহার ভার্য্যাকে টপ্পা শুনাইতেছে। এ গোলক আর মুহূর্ত্তকাল পৃথিবীতে থাকিলে গৃহেং বিশৃঙ্খলা হইবে। অতএব আপনি ইহা সম্বরণ করুন।"

মহাদেব বলিলেন, "হে শৈলসুতে! আমার গোলকের অপরাধ কি? এ কাণ্ড কি আজ নূতন পৃথিবীতে হইল? তুমি কি নিত্য দেখিতেছ না যে বৃদ্ধ যুবা সাজিতেছে, যুবা বৃদ্ধ সাজিতেছে; প্রভু ভৃত্যের তুল্য আচরণ করিতেছে, ভৃত্য প্রভু হইয়া বসিতেছে। কবে না দেখিতেছ যে পুরুষ স্ত্রীলোকের ন্যায় আচরণ করিতেছে, স্ত্রীলোক পুরুষের মত ব্যবহার করিতেছে? এ সকল পৃথিবীতে নিত্য ঘটে, কিন্তু তাহা যে কি প্রকার হাস্যজনক, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখে না। আমি তাহা একবার

সকলের প্রত্যক্ষীভূত করাইলাম। এক্ষণে গোলক সম্বৃত করিলাম। আমার ইচ্ছায় সকলেই পুনর্ব্বার স্ব২ প্রকৃতিস্থ হইবে, এবং যাহা যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহা কাহারও স্মরণ থাকিবে না। তবে, লোক হিতার্থে আমার বরে বঙ্গদর্শন এই কথা পৃথিবীমধ্যে প্রচারিত করিবে।

রামায়ণের সমালোচন।

শ্রীমৎকুমুদবংশজ শ্রীমন্মহামর্কট প্রণীত।

আমি রামায়ণ গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছি। গ্রন্থকার যে আর কিছুদিন যত্ন করিলে একজন সুকবি হইতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই কাব্যগ্রন্থখানির স্থূল তাৎপর্য্য, বানরদিগের মাহাত্ম্য বর্ণন। বানরগণ কর্ত্তৃক লঙ্কাজয়, ও রাক্ষসদিগের সবংশে নিধন, ইহার বর্ণনীয় বিষয়। বানরদিগের কীর্ত্তি সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করা, সামান্য কবিত্বের কার্য্য নহে। গ্রন্থকার যে তদ্দূর কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, এমত আমরা বলিতে পারি না; তবে তিনি যে কিয়দ্দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

রামায়ণে অনেক নীতিগর্ভ কথা আছে। বুদ্ধিহীনতার যে কত দোষ, তাহা ইহাতে উত্তমরূপে দেখান হইয়াছে। এক নির্ব্বোধ প্রাচীন রাজার যুবতী ভার্য্যা ছিল। বুদ্ধিমতী কৈকেয়ী স্বীয় পুত্রের উন্নতির জন্য, নির্ব্বোধ বৃদ্ধকে ভুলাইয়া ছলক্রমে রাজার জ্যেষ্ঠপুত্রকে বনবাসে প্রেরণ করিল। জ্যেষ্ঠপুত্রও ততোধিক মূর্খ, আপন স্বত্বাধিকার বজায় রাখিবার কোন যত্ন না করিয়া বুড়া বাপের কথায় বনে গেল। তা, একাই যাউক, তাহা নহে; আপনার যুবতী ভার্য্যাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। "পথে নারী বিবর্জ্জিতা," এটা সামান্য কথা; ইহাও তাহার ঘটে আসিল না। তাহাতে যাহা ঘটিবার, ঘটিল। স্ত্রীস্বভাবসুলভ চাঞ্চল্য বশতঃ সীতা রামকে ত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের সঙ্গে লঙ্কায় রাজ্যভোগ করিতে গেল। নির্ব্বোধ রাম পথে২ কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। সীতা অন্তঃপুরে থাকিলে এতটা ঘটিত না। সীতা দুশ্চরিত্রা হইলেও, ঘরে থাকিত; বনে গিয়া স্বাধীনতা পাইয়াছিল, এবং অন্যের সংসর্গ সুসাধ্য হইয়াছিল এজন্য এমত ঘটিয়াছিল। এক্ষণে যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীন করিবার জন্য কলহ করেন, তাঁহারা যেন এই কথাটি স্মরণ রাখেন।

লক্ষ্মণ আর একটি গণ্ডমূর্খ। তাহার চরিত্র এ রূপে

চিত্রিত হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা লক্ষ্মণকে কর্ম্মক্ষম বোধ্যালক মনে করিলে সে এক জন বড় লোক হইতে পারিত, কিন্তু তাহার এক দিনের জন্যও সে দিকে মন যায় নাই। সে কেবল রামের পিছু২ বেড়াইল, আপনার উন্নতির কোন চেষ্টা করিল না। ইহা কেবল বুদ্ধিহীনতার ফল।

আর একটি চাণ্ডমূর্খ ভরত। আপন হাতে রাজ্য পাইয়া ভাইকে ফিরাইয়া দিল। ফলতঃ রামায়ণ মূর্খ লোকের ইতিহাসেই পূর্ণ! ইহা গ্রন্থকারের একটি উদ্দেশ্য। রাম পত্নীকে হারাইলে আমার বন্দনীয় পূর্ব্বপুরুষ তাহার কাতরতা দেখিয়া দয়া করিয়া রাবণকে সবংশে মারিয়া সীতা কাড়িয়া আনিয়া রামকে দিলেন, কিন্তু মূর্খের মূর্খতা কোথায় যাইবে? রাম স্ত্রীর উপর রাগ করিয়া তাহাকে একদিন পুড়াইয়া মারিতে গেল। দৈবে সেদিন সেটার রক্ষা হইল। পরে তাহাকে দেশে আনিয়া দুই চারিদিন মাত্র সুখে ছিল! পরে বুদ্ধিহীনতাবশতঃ পরের কথা শুনিয়া স্ত্রীটাকে তাড়াইয়া দিল। কয়েক বৎসর পরে, সীতা খাইতে না পাইয়া, রামের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। রাম তাহাকে দেখিয়া, রাগ করিয়া, মাটীতে পুঁতিয়া ফেলিল। বুদ্ধি না থাকিলে এইরূপই ঘটে। রামায়ণের স্থূল তাৎপর্য্য এই। ইহার

প্রণেতা কে, তাহা সহজে স্থির করা যায় না। কিম্বদন্তী আছে যে, ইহা বাল্মীকি প্রণীত। বাল্মীকি নামে কোন গ্রন্থকার ছিল কি না, তদ্বিষয়ে সংশয়। বল্মীক হইতে বাল্মীকি শব্দের উৎপত্তি দেখা যাইতেছে, অতএব আমার বিবেচনায় কোন বল্মীক মধ্যে এই গ্রন্থখানি পাওয়া গিয়াছিল, ইহা কাহারও প্রণীত নহে।

রামায়ণ নামে একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। ইহা কৃত্তিবাস প্রণীত। উভয় গ্রন্থে অনেক সাদৃশ্য আছে। অতএব ইহাও অসম্ভব নহে যে, বাল্মীকি রামায়ণ কৃত্তিবাসের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। বাল্মীকি রামায়ণ কৃত্তিবাস হইতে সঙ্কলিত, কি কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণ হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা মীমাংসা করা সহজ নহে: ইহা স্বীকার করি। কিন্তু রামায়ণ নামটিই এবিষয়ের এক প্রমাণ। "রামায়ণ" শব্দের সংস্কৃতে কোন অর্থ হয় না, কিন্তু বাঙ্গালায় সদর্থ হয়। বোধ হয়, "রামায়ণ" শব্দটি "রামা যবন" শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। কেবল "ব" কার লুপ্ত হইয়াছে। রামা যবন বা রামা মুসলমান নামক কোন ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বন করিয়া কৃত্তিবাস প্রথম ইহার রচনা করিয়া থাকিবেন। পরে কেহ সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া বল্মীক মধ্যে লুকাইয়া রাখি-

য়াছিল। পরে গ্রন্থ বল্মীক মধ্যে প্রাপ্ত হওয়ায় বাল্মীকি নামে খ্যাত হইয়াছে।

রামায়ণ গ্রন্থখানির আমরা কিছু প্রশংসা করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি না। উহাতে অনেক গুরুতর দোষ আছে। আদ্যোপান্ত আদিরসঘটিত। সীতার বিবাহ, রাবণকর্ত্তৃক সীতা হরণ, এ সকল আদিরস ঘটিত না ত কি? রামায়ণে করুণরসের অতি বিরল প্রচার। বানরকর্ত্তৃক সমুদ্র বন্ধন, কেবল এইটিই রামায়ণের মধ্যে করুণ রসাশ্রিত বিষয়। লক্ষণভোজনে কিঞ্চিৎ বীররস আছে। বশিষ্ঠাদি ঋষিদিগের কিছু হাস্যরস আছে। ঋষিগণ বড় রসিক পুরুষ ছিলেন। ধর্ম্মের কথা লইয়া অনেক হাস্য পরিহাস করিতেন।

রামায়ণের ভাষা যদিও প্রাঞ্জল এবং বিশদ বটে, তথাপি অত্যন্ত অশুদ্ধ বলিতে হইবে। রামায়ণের একটি কাণ্ডে যোদ্ধাদিগের কোন কথা না থাকায় তাহার নাম হইয়াছে "অযোদ্ধাকাণ্ড।" গ্রন্থকার তাহা "অযোদ্ধাকাণ্ড" না লিখিয়া "অযোধ্যাকাণ্ড" লিখিয়াছেন। ইহা কি সামান্য মূর্খতা? এই একটি দোষেই এই গ্রন্থখানি সাধারণের পরিহার্য্য হইয়াছে।

ভরসা করি, পাঠক সকলে এই কদর্য্য গ্রন্থখানি পড়া

ত্যাগ করিবেন। আমি একখানি নূতন রামায়ণ রচনা করিয়াছি, তৎপরিবর্ত্তে তাহাই সকলে পাঠ করিতে আরম্ভ করুন। আমার প্রণীত রামায়ণ যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য; কেন না আমি ত বাল্মীকির ন্যায় কবিত্ববিহীন এবং বিদ্যাবুদ্ধিশূন্য নহি। সেই কথা বলাই এ সমালোচনার উদ্দেশ্য। অলমতি বিস্তরেণ।

সং সঃ

বিজ্ঞানরহস্য

অর্থাৎ

১২৭৯।৮০ শালের

বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংগ্রহ।

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

কাঁটালপাড়া।

বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রী হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৭৫।

CONTENTS.

সূচিপত্র।

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত হইয়া এই কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধগুলি লেখকের সন্তোষজনক হয় নাই—কৃতবিদ্য পাঠকেরও হইবার সম্ভাবনা নাই। বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের আলোচনায় অনেক পুস্তকের সাহায্য প্রয়োজন করে; এ সকল প্রবন্ধ যেখানে লিখিত হইয়াছিল, সেখানে বৈজ্ঞানিক পুস্তক পাওয়া কষ্টকর। অনেক কথা কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছে,—অথচ স্মৃতির ন্যায় বিশ্বাসঘাতিনী কেহ নাই। লিখিতবিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপণ জন্য অনেক সময় আবশ্যক, লেখক, সময়াভাবে নিতান্ত কাতর। অতএব এই সকল প্রবন্ধে যে অনেক ভ্রান্তি আছে, ইহা নিতান্ত সম্ভব। যিনি যেখানে যে ভ্রম দেখিবেন, অনুগ্রহ করিয়া তাহা লেখককে জানাইবেন ভবিষ্যতে তাহা সংশোধন করা যাইবে।

এই সকল প্রবন্ধ প্রধানতঃ হক্‌স্লী, টিণ্ডল, প্রকৃটর, লকিয়র, লায়েল প্রভৃতি লেখকের মতাবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। কোন-টিই অনুবাদ নহে। তবে টিণ্ডল সাহেবের "Dust and Disease" নামক প্রবন্ধের সার মর্ম্মে, "ধূলা," গ্লেশর সাহেবের গ্রন্থ হইতে "গগন-পর্য্যটন" হক্‌স্লীর "Lay Sermons" হইতে জৈবনিক, এবং লায়েল সাহেবের "Antiquity of Man" হইতে "কতকাল মনুষ্য?" নামক প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে।

লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য এই, যে আলোচিত বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব সকল সাধারণ বাঙ্গালি পাঠক, বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর বালকেরা, এবং আধুনিক শিক্ষিতা বাঙ্গালী স্ত্রী, বুঝিতে পারেন। কতদূর এ উদ্দেশ্য সফল হইবে, বলিতে পারি না।

বিজ্ঞানরহস্য।

আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত।

১৮৭১ শালে সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকা-নিবাসী অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ ইয়ঙ্ সাহেব যে আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত দৃষ্টি করিয়াছিলেন, এরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড মনুষ্য চক্ষে প্রায় আর কখন পড়ে নাই। তত্তুলনায় এট্না বা বিসিউবিয়সের অগ্নিবিপ্লব, সমুদ্রোচ্ছ্বাসের তুলনায় দুগ্ধকটাহে দুগ্ধোচ্ছ্বাসের তুল্য বিবেচনা করা যাইতে পারে।

যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যার সবিশেষ অনুশীলন করেন নাই, এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাঁহাদের বোধগম্য করার জন্য সূর্য্যের প্রকৃতিসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

সূর্য্য অতি বৃহৎ তেজোময় গোলক। এই গোলক, আমরা অতি ক্ষুদ্র দেখি, কিন্তু উহা বাস্তবিক কত বৃহৎ, তাহা পৃথিবীর পরিমাণ না বুঝিলে বুঝা যাইবে না। সকলে জানেন যে, পৃথিবীর ব্যাস ৭০৯১ মাইল। যদি পৃথিবীকে এক মাইল দীর্ঘ এক মাইল প্রস্থ, এমত খণ্ডে২ ভাগ করা যায়, তাহাহইলে, উনিশ কোটি, ছষট্টি লক্ষ ছাব্বিশ হাজার এইরূপ বর্গ মাইল পাওয়া যায়। এক মাইল দীর্ঘ, এক মাইল প্রস্থে, এবং এক মাইল উর্দ্ধে, এরূপ ২৫৯, ৮০০০০০,০০০ ভাগ পাওয়া যায়।

আশ্চর্য্য বিজ্ঞানবলে পৃথিবীকে ওজন করাও গিয়াছে। ওজনে পৃথিবী যত টন হইয়াছে, তাহা নিম্নে অঙ্কের দ্বারা লিখিলাম। ৬,০৬৯,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০। এক টন সাতাশ মনের অধিক।

এই সকল অঙ্ক দেখিয়া মন অস্থির হয়; পৃথিবী যে কত বৃহৎ পদার্থ, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এক্ষণে যদি বলি যে, এমত অন্য কোন গ্রহ বা নক্ষত্র আছে যে, তাহা পৃথিবী অপেক্ষা, ত্রয়োদশ লক্ষ গুণে বৃহৎ, তবে কে না বিস্মিত হইবে? কিন্তু বাস্তবিক সূর্য্য পৃথিবী হইতে ত্রয়োদশ লক্ষগুণে বৃহৎ। ত্রয়োদশ লক্ষটি পৃথিবী একত্র করিলে সূর্য্যের আয়তনের সমান হয়।

তবে আমরা সূর্য্যকে এত ক্ষুদ্র দেখি

কেন? উহার দূরতাবশতঃ। পূর্ব্বতন গণনানুসারে সূর্য্য পৃথিবী হইতে সার্দ্ধ নয় কোটি মাইল দূরে স্থিত বলিয়া জানা ছিল। আধুনিক গণনায় স্থির হইয়াছে যে, ৯১,৬৭৮০০০ মাইল অর্থাৎ এক কোটি, চতুর্দ্দশ লক্ষ, ঊনসপ্ততি সহস্র সার্দ্ধ সপ্তশত যোজন, পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরতা। এই ভয়ঙ্কর দূরতা অনুমেয় নহে। দ্বাদশ সহস্র পৃথিবী শ্রেণীপরম্পরায় বিন্যস্ত হইলে, পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত পায় না।

এই দূরতা অনুভব করিবার জন্য একটি উদাহরণ দিই। অস্মাদাদির দেশে রেলওয়ে ট্রেণ ঘণ্টায় ২০ মাইল যায়। যদি পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত রেইলওয়ে হইত, তবে কত কালে সূর্য্যলোকে যাইতে পারিতাম? উত্তর —যদি দিনরাত্রি ট্রেণ, অবিরত, ঘণ্টায় বিশ

মাইল চলে, তবে ৫২০ বৎসর ৬মাস ১৬দিনে সূর্য্য লোকে পেঁাছান যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ট্রেণে চড়িবে, তাহার সপ্তদশ পুরুষ ঐ ট্রেণে গত হইবে।

এক্ষণে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, যে সূর্য্য-মণ্ডলমধ্যে অণুবৎ ক্ষুদ্রাকৃতি পদার্থও বাস্তবিক অতি বৃহৎ। যদি সূর্য্য মধ্যে আমরা একটি বালির মত বিন্দুও দেখিতে পাই, তবে তাহাও লক্ষ ক্রোশ বিস্তার হইতে পারে।

কিন্তু সূর্য্য এমনি প্রচণ্ড রশ্মিময় যে, তাহার গায়ে বিন্দু বিসর্গ কিছু দেখিবার সম্ভাবনা নাই। সূর্য্যের প্রতি চাহিয়া দেখিলেও অন্ধ হইতে হয়। কেবল সূর্য্যগ্রহণের সময়ে সূর্য্য-তেজঃ চন্দ্রান্তরালে লুকায়িত হইলে, তৎপ্রতি দৃষ্টি করা যায়। তখনও সাধারণ লোকে চ-

ক্ষের উপর কালিমাখা কাঁচ না ধরিয়া, হৃত-
তেজা সূর্য্য প্রতিও চাহিতে পারে না।

সেই সময়ে যদি কালিমাখা কাঁচ ত্যাগ করিয়া, উত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা সূর্য্য প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তবে কতকগুলি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়। পূর্ণ গ্রাসের সময়ে, অর্থাৎ যখন চন্দ্রান্তরালে সূর্য্যমণ্ডল লুক্কায়িত হয়, সেই সময়ে দেখা যাইবে যে, লুক্কায়িত মণ্ডলের চারিপার্শ্বে, অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় কিরীটী মণ্ডল তাহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ইহাকে "করোনা" বলেন। কিন্তু এই কিরীটী মণ্ডল ভিন্ন, আর এক অদ্ভুত বস্তু কখন২ দেখা যায়। কিরীটীমূলে, ছায়াবৃত সূর্য্যের অঙ্গের উপরে সংলগ্ন, অথচ তাহার বাহিরে, কোন দুর্জ্ঞেয় পদার্থ উ-

দগত দেখা যায়। যথা (ক)। ঐ সকল উ-

দগত পদার্থ দেখিতে এত ক্ষুদ্র যে, তাহা দূর-বীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে দেখা যায় না। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় বলিয়াই তাহা বৃহৎ অনুমান করিতে হইতেছে। উহা কখন২ অর্দ্ধ লক্ষ মাইল উচ্চ দেখা গিয়াছে। ছয়টি পৃথিবী উপর্য্যুপরি সাজাইলে এত উচ্চ হয়
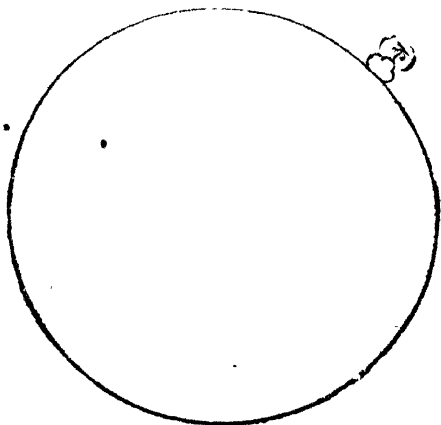
না। এই সকল উদ্গত পদার্থের আকার কখন পর্ব্বত শৃঙ্গবৎ, কখন অন্যপ্রকার কখন সূর্য্য হইতে বিযুক্ত দেখা গিয়াছে। তাহার বর্ণ কখন উজ্জ্বলরক্ত, কখন গোলাপী, কখন নীলকপিশ।

পণ্ডিতেরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা স্থির, করিয়াছেন যে, এ সকল সূর্য্যের অংশ। প্রথমে কেহ২ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, এ সকল সৌর পর্ব্বত। পরে সূর্য্য হইতে তাহার বিয়োগ দেখিয়া সে মত ত্যাগ করিলেন।

এক্ষণে নিঃসংশয় প্রমাণ হইয়াছে যে, এই সকল বৃহৎ পদার্থ সূর্য্যগর্ভ হইতে উৎক্ষিপ্ত। যেরূপ পার্থিব আগ্নেয় গিরি হইতে দ্রব বা বায়বীয় পদার্থ সকল উৎপতিত হইয়া, গিরিশৃঙ্গের উপরে মেঘাকারে দৃষ্ট হইতে পারে, এই সকল সৌরমেঘও তদ্রূপ। উৎক্ষিপ্ত বস্তু

যত ক্ষণ না সূর্য্যোপরি পুনঃ পতিত হয়, তত-ক্ষণ পর্য্যন্ত স্তূপাকারে পৃথিবী হইতে লক্ষ্য হইতে থাকে।

এক্ষণে পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, এইরূপ একখানি সৌরমেঘ বা স্তূপ দূরবীক্ষণে দেখিলে কি বুঝিতে হয়। বুঝিতে হয় যে, এক প্রকাণ্ড প্রদেশ লইয়া এক বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। সেই সকল উৎপাত-কালে সূর্য্যগর্ভনিক্ষিপ্ত পদার্থরাশি, এতাদৃশ বহুদূরব্যাপী হয়, যে তন্মধ্যে এই পৃথিবীর ন্যায় অনেক গুলিন পৃথিবী ডুবিয়া থাকিতে পারে।

এইরূপ সৌরোৎপাত অনেকেই প্রফেসর ইয়ঙের পূর্ব্বে দেখিয়াছেন; কিন্তু প্রফেসর ইয়ঙ্ যাহা দেখিয়াছেন, তাহা আবার বিশেষ

বিস্ময়কর। গত ৭ই সেপ্টেম্বরে, বেলা দুই প্রহরের সময়ে তিনি সূর্য্যমণ্ডল দূরবীক্ষণদ্বারা অবেক্ষণ করিতেছিলেন। তৎকালে গ্রহণাদি কিছু ছিল না। পূর্ব্বে গ্রহণের সাহায্য ব্যতীত কেহ কখন এই সকল ব্যাপার নয়নগোচর করে নাই, কিন্তু ডাক্তার হাগিন্স প্রথমে বিনা গ্রহণে এ সকল ব্যাপার দেখিবার উপায় প্রদর্শন করেন। প্রফেসর ইয়ঙ্ এরূপ বিজ্ঞানকুশলী যে, তিনি সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজের সময়েও ঐ সকল সৌরস্তূপের আতপচিত্র পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কথিত সময়ে প্রফেসর ইয়ঙ্ দূরবীক্ষণে দেখিতেছিলেন যে, সূর্য্যের উপরি ভাগে এক খানি মেঘবৎ পদার্থ দেখা যাইতেছে। অন্যান্য উপায় দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, পৃথিবী যেরূপ বায়বীয় আবরণে বেষ্টিত, সূর্য্যম-

গুলও তদ্রূপ। ঐ মেঘবৎ পদার্থ সৌরবায়ুর উপরে ভাসিতেছিল। পাঁচটি স্তম্ভের ন্যায় আধারের উপরে উহা আরূঢ় দেখা যাইতেছিল। প্রফেসর ইয়ঙ্ পূর্ব্ব দিন বেলা দুই প্রহর হইতে ঐ রূপই দেখিতেছিলেন। তদবধি তাহার পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণই দেখেন নাই। স্তম্ভগুলিন উজ্জ্বল, মেঘখানি বৃহৎ—তদ্ভিন্ন মেঘের নিবিড়তা বা উজ্জ্বলতা কিছুই ছিল না। সূক্ষ্ম২ সূত্রাকার কতকগুলি পদার্থের সমষ্টির ন্যায় দেখাইতেছিল। এই অপূর্ব্ব মেঘ সৌরবায়ুর উপরে পঞ্চদশ সহস্র মাইল ঊর্দ্ধে ভাসিতেছিল। ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রফেসর ইয়ঙ্ ইহার দৈর্ঘ্য প্রস্থও মাপিয়াছিলেন। তাহার দৈর্ঘ্য লক্ষ মাইল—প্রস্থ ৫৪০০০মাইল। বারটি পৃথিবী সারি২ সাজাইলে, তাহার দৈর্ঘ্যের সমান হয় না—ছয়টি

পৃথিবী সারি২ সাজাইলে, তাহার প্রস্থের স-
মান হয় না।

দুই প্রহর বাজিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা হইলে, মেঘ
এবং তন্মূলস্বরূপ স্তম্ভগুলির অবস্থাপরিবর্ত্ত-
নের কিছু২ লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল।
সেইসময়ে প্রফেসর ইয়ঙ্ সাহেবকে দূরবীক্ষণ
রাখিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইল। একটা
বাজিতে পাঁচ মিনিট থাকিতে, যখন তিনি প্র-
ত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন দেখিলেন, যে চমৎ-
কার! নিম্ন হইতে উৎক্ষিপ্ত কোন ভয়ঙ্কর ব-
লের বেগে মেঘখণ্ড ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে,
তৎপরিবর্ত্তে সৌর গগন ব্যাপিয়া ঘনবিকীর্ণ
উজ্জ্বল সূত্রাকার পদার্থ সকল ঊর্দ্ধে ধাবিত হই
তেছে। ঐ সূত্রাকার পদার্থ সকল অতি প্র-
বল বেগে ঊর্দ্ধে ধাবিত হইতেছিল।

সর্ব্বাপেক্ষা এই বেগই চমৎকার। আ-

লোক, বা বৈদ্যুতীয় শক্তি প্রভৃতি ভিন্ন, গুরুত্ববিশিষ্ট পদার্থের এরূপ বেগ শ্রুতিগোচর হয় না। ইয়ঙ্ সাহেব যখন প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তখন ঐ সকল উজ্জ্বল সূত্রাকার পদার্থ লক্ষ মাইলের ঊর্দ্ধে উঠে নাই। পরে দশ মিনিটের মধ্যে যাহা লক্ষ মাইলে ছিল, তাহা দুই লক্ষ মাইলে উঠিল। দশ মিনিটে লক্ষ মাইল গতি হইলে, প্রতি সেকেণ্ডে ১৬৫ মাইল গতি হয়। অতএব উৎক্ষিপ্ত পদার্থের দৃষ্ট গতি এই।

এই গতি কি ভয়ঙ্কর, তাহা মনেরও অচিন্ত্য। কামানের গোলা অতিবেগবান হইলেও কখন এক সেকেণ্ডে অর্দ্ধ মাইল যাইতে পারে না। সচরাচর কামানের গোলার বেগের বহু শত গুণ এই সৌর পদার্থের বেগ, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

দুই লক্ষ মাইল ঊর্দ্ধেও এই বেগ দেখা গিয়াছিল। যে উৎক্ষিপ্ত পদার্থ দুই লক্ষ মাইল ঊর্দ্ধে এত বেগবান্, নির্গমকালে তাহার বেগ কিরূপ ছিল? সকলেই জানেন যে; যদি আমরা একটা ইষ্টক খণ্ড ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত করি, তাহাহইলে যে বেগে তাহা নিক্ষিপ্ত হয়, সেই বেগ শেষপর্য্যন্ত থাকে না, ক্রমে মন্দীভূত হইয়া, পরিশেষে একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, ইষ্টক খণ্ডও ভূপতিত হয়। ইষ্টকবেগের হ্রাসের দুই কারণ, প্রথম পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তি, দ্বিতীয় বায়ুজনিত প্রতিবন্ধকতা। এই দুই কারণই সূর্য্যলোকে বর্ত্তমান। যে বস্তু যত গুরু, তাহার মাধ্যাকর্ষণী শক্তি তত বলবতী। পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণী শক্তি সূর্য্যের নাড়ীমণ্ডলে ২৮ গুণ অধিক। তদুল্লঙ্ঘন করিয়া লক্ষ ক্রোশ পর্য্যন্ত যদি

কোন পদার্থ উত্থিত হয়, তবে তাহা যখন সূর্য্যকে ত্যাগ করে, তৎকালে তাহার গতি প্রতি সেকেণ্ডে অবশ্যই ১৬৬ মাইল ছিল। ইহা গণনা দ্বারা সিদ্ধ। কিন্তু যদিও এই বেগে উৎক্ষিপ্ত হইলে, ক্ষিপ্ত বস্তু লক্ষ ক্রোশ উঠিতে পারিবে, তাহা যে ঐ লক্ষ ক্রোশের শেষার্দ্ধ লঙ্ঘনকালে প্রতি সেকেণ্ডে ১৬৬ মাইল ছুটিবে, এমত নহে! শেষার্দ্ধ বেগ গড়ে ৬৫ মাইল মাত্র হইবে। প্রাক্টর সাহেব গুড্ওয়ার্ডসে লিখিয়াছেন যে, যদি বিবেচনা করা যায় যে সূর্য্যলোকে বায়বীয় প্রতিবন্ধকতা নাই, তাহাহইলে এই উৎক্ষিপ্ত পদার্থ সূর্য্যমধ্য হইতে যে বেগে নির্গত হইয়াছিল, তাহা প্রতি সেকেণ্ডে ২৫৫ মাইল। কর্ণহিলের একজন লেখক বিবেচনা করেন যে, এই পদার্থ প্রতি সেকেণ্ডে ৫০০ মাইলের অধিক

বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু সূর্য্যলোকে যে বায়বীয় পদার্থ নাই, এমত কথা বিবেচনা করিতে পারা যায় না। সূর্য্য যে গাঢ় বাষ্পমণ্ডল পরিবৃত, তাহা নিশ্চিত হইয়াছে। প্রাক্টর সাহেব সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীতে বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার যেরূপ বল, সৌর বায়ুর প্রতিবন্ধকতার যদি সেইরূপ বল হয়, তাহাহইলে এই পদার্থ, যখন সূর্য্য হইতে নির্গত হয়, তখন তাহার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে আনুমানিক সহস্র মাইল ছিল।

এই বেগ মনের অচিন্ত্য। এরূপ বেগে নিক্ষিপ্ত পদার্থ এক সেকেণ্ডে ভারতবর্ষ পার হইতে পারে—পাঁচ সেকেণ্ডে কলিকাতা হইতে বিলাত পহুঁছিতে পারে, এবং ২৪ সেকেণ্ডে, অর্থাৎ অর্দ্ধ মিনিটের কমে, পৃথিবী

বেষ্টন করিয়া আসিতে পারে।

আর এক বিচিত্র কথা আছে। আমরা যদি কোন মৃৎপিণ্ড ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করি, তাহা আবার ফিরিয়া আসিয়া পৃথিবীতে পড়ে। তাহার কারণ এই যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তির বলে, এবং বায়বীয় প্রতিবন্ধকতায়, ক্ষেপণীর বেগ ক্রমে বিনষ্ট হইয়া, যখন ক্ষেপণী একবারে বেগহীন হয়, তখন মাধ্যাকর্ষণের বলে পুনর্ব্বার তাহা ভূপতিত হয়। সূর্য্যলোকেও অবশ্য তাহাই হওয়া সম্ভব। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণী শক্তি বা বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার শক্তি কখন অসীম নহে। উভয়েরই সীমা আছে। অবশ্য এমত কোন বেগবতী গতি আছে যে তদ্দারা উভয় শক্তিই পরাভূত হইতে পারে। এই সীমা কোথায়, তাহাও গণনা দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। যে বস্তু নির্গম

কালে প্রতি সেকেণ্ডে ৩৮০ মাইল গমন করে, তাহা মাধ্যাকর্ষণী শক্তি এবং বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার বল অতিক্রম করিয়া যায়। অতএব উপরিবর্ণিত বেগবান্ উৎক্ষিপ্ত পদার্থ, আর সূর্য্যলোকে ফিরিয়া আইসে না। সুতরাং প্রফেসর ইয়ঙ্ যে সৌরোৎপাত দৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদুৎক্ষিপ্ত পদার্থ আর সূর্য্যলোকে ফিরে নাই। তাহা অনন্তকাল অনন্ত আকাশে বিচরণ কবিয়া, ধূমকেতু বা অন্য কোন খেচর রূপে পরিগণিত হইবে কি, কি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে!

প্রাক্টর সাহেব সিদ্ধান্ত করেন যে, উৎক্ষিপ্ত বস্তু লক্ষ ক্রোশ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল বটে, কিন্তু অদৃশ্যভাবে যে তদধিক দূর ঊর্দ্ধগত হয় নাই, এমত নহে। যতক্ষণ উহা উত্তপ্ত এবং জ্বালাবিশিষ্ট ছিল, ততক্ষণ তাহা

দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, ক্রমে শীতল হইয়া অনুজ্জ্বল হইলে, আর তাহা দেখা যায় নাই। তিনি স্থির করিয়াছেন যে, উহা সার্দ্ধ তিন লক্ষ মাইল উঠিয়াছিল। অতএব এই সৌরোৎপাতনিক্ষিপ্ত পদার্থ অদ্ভুত বটে—লক্ষ যোজনব্যাপী, মনোগতি, এক নূতন সৃষ্টির আদি।

আকাশে কত তারা আছে?

ঐ যে নীল নৈশ নভোমণ্ডলে অসংখ্য বিন্দু জ্বলিতেছে, ও গুলি কি?

ও গুলি তারা। তারা কি? প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে পাঠশালার ছাত্র মাত্রেই তৎক্ষণাৎ বলিবে যে, তারা সব সূর্য্য। সব সূর্য্য! সূর্য্য ত দেখিতে পাই বিশ্বদাহকর, প্রচণ্ড কিরণমালার আকর: তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবারও মনুষ্যের শক্তি নাই; কিন্তু তারা সব ত

বিন্দু মাত্র; অধিকাংশ তারাই নয়নগোচর হইয়া উঠে না। এমন বিসদৃশের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়? কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলিব যে এ গুলি সূর্য্য? এ কথার উত্তর পাঠশালার ছাত্রের দেয় নহে। এবং যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করেন নাই, তাঁহারা এই কথাই অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিবেন। তাঁহাদিগকে আমরা এক্ষণে ইহাই বলিতে পারি যে, এ কথা অলঙ্ঘ্য প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে। সেই প্রমাণ কি, তাহা বিবৃত করা এস্থলে আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। যাঁহারা ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যার সম্যগ্ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে সেই প্রমাণ এখানে বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা জ্যোতিষ সম্যগ্‌ অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহাদের

পক্ষে সেই প্রমাণ বোধগম্য করা অতি দুরূহ ব্যাপার। বিশেষ দুইটী কঠিন কথা তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে; প্রথমতঃ কি প্রকারে নভঃস্থ জ্যোতিষ্কের দূরতা পরিমিত হয়; দ্বিতীয় আলোক পরীক্ষক নামক আশ্চর্য্য যন্ত্র কি প্রকার, এবং কি প্রকারে ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং সে বিষয়ে অদ্য আমরা প্রবৃত্ত হইলাম না। অদ্য সন্দিহান পাঠকগণের প্রতি আমাদিগের অনুরোধ এই, তাঁহারা ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উপর বিশ্বাস করিয়া বিবেচনা করুন যে, এই আলোকবিন্দু গুলিন সকলই সৌর প্রকৃত। কেবল আত্যন্তিক দূরতা বশতঃ আলোক বিন্দুবৎ দেখায়।

এখন কত সূর্য্য এই জগতে আছে? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করাই অদ্য আমাদিগের উদ্দেশ্য। আমরা পরিষ্কার চন্দ্রবিযুক্তা নি-

শীতে নির্ম্মল নিরম্বুদ আকাশমণ্ডল প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া দেখিতে পাই যে, আকাশে নক্ষত্র যেন আর ধরে না। আমরা বলি, নক্ষত্র অসংখ্য। বাস্তবিক কি নক্ষত্র অসংখ্য! বাস্তবিক শুধু চক্ষে আমরা যে নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহা কি গণিয়া সংখ্যা করা যায় না?

ইহা অতি সহজ কথা। যে কেহ অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া স্থির চিত্তে গণিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তিনিই সফল হইবেন। বস্তুতঃ দূরবীক্ষণ ব্যতীত যে তারা গুলিন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অসংখ্য নহে—সংখ্যায় এমন অধিকও নহে। তবে তারা সকল যে অসংখ্য বোধ হয়, তাহা উহার দৃশ্যতঃ বিশৃঙ্খলতা জন্য মাত্র। যাহা শ্রেণীবদ্ধ এবং বিন্যস্ত, তাহার অপেক্ষা যাহা শ্রেণীবদ্ধ নহে এবং অবিন্যস্ত, তাহা সংখ্যায় অধিক বোধ হয়। তারা সকল

আকাশে শ্রেণীবদ্ধ এবং বিন্যস্ত নহে বলিয়াই আশু অসংখ্য বলিয়া বোধ হয়।

বস্তুতঃ যত তারা দূরবীক্ষণ ব্যতীত দৃষ্টি-গোচর হয়, তাহা ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কর্ত্তৃক পুনঃ২ গণিত হইয়াছে। বর্লিন নগরে যত তারা ঐ রূপে দেখা যায়, অর্গেলন্দর তাহার সংখ্যা করিয়া তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই তালিকায় ৩২৫৬টি মাত্র তারা আছে। পারিস নগর হইতে যত তারা দেখা যায়, হম্বোল্‌টের মতে তাহা ৪১৪৬টি মাত্র। গেলামির আকাশ মণ্ডল নামক গ্রন্থে চক্ষুর্দৃশ্য তারার যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এই প্রকার;

১ম শ্রেণী	...	...	২০
২য় শ্রেণী	...	...	৬৫
৩য় শ্রেণী	...	...	২০০

৫ম শ্রেণী	...	...	১১০০
৬ষ্ঠ শ্রেণী	...	...	৩২০০
			৪৫৮৫

এই তালিকায় চতুর্থ শ্রেণীর তারার সংখ্যা নাই। তৎসমেত আন্দাজ ৫০০০ পাঁচ হাজার তারা শুধু চক্ষে দৃষ্ট হয়।

কিন্তু বিষুব রেখার যত নিকটে আসা যায়, তত অধিক তারা নয়নগোচর হয়। বর্লিন ও পারিস নগর হইতে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, এ দেশে তাহার অধিক তারা দেখা যায়। কিন্তু এদেশেও ছয় সহস্রের অধিক দেখা যাওয়া সম্ভবপর নহে।

এক কালীন আকাশের অর্দ্ধাংশ ব্যতীত আমরা দেখিতে পাই না। অপরার্দ্ধ অধস্তলে থাকে। সুতরাং মুষ্যচক্ষে এককালীন যত

তারা দেখা যায়, তাহা তিন সহস্রের অধিক নহে।

এতক্ষণ আমরা কেবল শুধু চক্ষের কথা বলিতেছিলাম। যদি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আকাশ মণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, তারা অসংখ্যই বটে। শুধু চোখে যেখানে দুই একটি মাত্র তারা দেখিয়াছি, দূরবীক্ষণে সেখানে সহস্র তারা দেখা যায়।

গেলামী এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য মিথুন রাশির একটি ক্ষুদ্রাংশের দুইটি চিত্র দিয়াছেন। ঐ স্থান বিনা দূরবীক্ষণে যেরূপ দেখা যায়, প্রথম চিত্রে তাহাই চিত্রিত আছে। তাহাতে পাঁচটি মাত্র নক্ষত্র দেখা যায়। দ্বিতীয় চিত্রে ইহা দূরবীক্ষণে যেরূপ দেখা যায়,

তাহাই অঙ্কিত হইয়াছে। তাহাতে পাঁচটি তারার স্থানে তিন সহস্র দুই শত পাঁচটি তারা দেখা যায়!

দূরবীক্ষণের দ্বারাই বা কত তারা মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহারও সংখ্যা ও তালিকা হইয়াছে। সুবিখ্যাত সর উইলিয়ম হর্শেল প্রথম এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি বহুকালাবধি প্রতিরাত্রে আপন দূরবীক্ষণসমীপাগত তারা সকল গণনা করিয়া তাহার তালিকা করিতেন। এইরূপে ৩৪০০ বার আকাশ পর্য্যবেক্ষণের ফল তিনি প্রচার করেন। যতটা আকাশ চন্দ্র কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ আট শত গাগনিক খণ্ড মাত্র তিনি এই ৩৪০০ বারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহাতে আকাশের ২৫০ ভাগের এক ভাগের অধিক হয় না। আকাশের এই ২৫০ ভাগের এক

ভাগ মাত্রে তিনি ৯০০০০ অর্থাৎ প্রায় এক লক্ষ তারা গণনা করিয়াছিলেন। স্ত্রুব নামা বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ গণনা করিয়াছেন যে, এই রূপে সমুদায় আকাশ মণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তালিকা নিবদ্ধ করিতে অশীতি বৎসর লাগে।

তাহার পরে সর উইলিয়মের পুত্র সর্ জন হর্শেল ঐরূপ আকাশ সন্ধানে ব্রতী হয়েন। তিনি ২৩০০ বার আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আরও সপ্ততি সহস্র তারা সংখ্যা করিয়াছিলেন।

অর্গেলন্দর নবম শ্রেণী পর্য্যন্ত তারা স্বীয় তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। তাহাতে সপ্তম শ্রেণীর ১৩০০০ তারা, অষ্টম শ্রেণীর ৪০০০০ তারা, এবং নবম শ্রেণীর ১৪২০০০ তারা। উচ্চতম শ্রেণীর সংখ্যা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এসকল সংখ্যাও সামান্য। আ-

কাশে পরিষ্কার রাত্রে এক স্থূল শ্বেত রেখা নদীর ন্যায় দেখা যায়। আমরা সচরাচর তাহাকে ছায়াপথ বলি। ঐ ছায়াপথ কেবল দৌরবীক্ষণিক নক্ষত্র সমষ্টি মাত্র। উহার অসীম দূরতাবশতঃ নক্ষত্র সকল দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তাহার আলোকসমবায়ে ছায়াঃপথ শ্বেতবর্ণ দেখায়। দূরবীক্ষণে উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাময় দেখায়। সর্ উইলিয়ম হর্শেল গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কেবল ছায়াপথ মধ্যে ১৮,০০০,০০০ এক কোটি আশি লক্ষ তারা আছে।

স্ত্রূব গণনা করেন যে, সমগ্র আকাশ মণ্ডলে দুইকোটি নক্ষত্র আছে।

মসূর শাকোর্ণাক্ বলেন, "সর উইলিয়ম্ হর্শেলের আকাশ সন্ধান এবং রাশিচক্রের চিত্রাদি দেখিয়া, বেসেলের কৃত কটিবন্ধ সক-

লের তালিকার ভূমিকাতে যেরূপ গড়পড়তা করা আছে, তৎসম্বন্ধে উইসের কৃত নিয়মাবলম্বন করিয়া আমি ইহা গণনা করিয়াছি যে, সমুদায় আকাশে সাত কোটি সত্তর লক্ষ নক্ষত্র আছে।”

এই সকল সংখ্যা শুনিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। যেখানে আকাশে তিন হাজার নক্ষত্র দেখিয়া আমরা অসংখ্য নক্ষত্র বিবেচনা করি, সেখানে সাত কোটি সপ্ততি লক্ষের কথা দূরে থাক, দুই কোটিই কি ভয়ানক ব্যাপার।

কিন্তু ইহাতে আকাশের নক্ষত্র সংখ্যার শেষ হইল না। দূরবীক্ষণের সাহায্যে গগনাভ্যন্তরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ধূম্রাকার পদার্থ দৃষ্ট হয়। উহাদিগকে নীহারিকা নাম প্রদত্ত হইয়াছে। যে সকল দূরবীক্ষণ অত্যন্ত শক্তিশালী, তাহার সাহায্যে এক্ষণে দেখা গিয়াছে

যে বহু সংখ্যক নীহারিকা কেবল নক্ষত্র পুঞ্জ। অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্ বলেন, যে সকল নক্ষত্র আমরা শুধু চক্ষে বা দূরবীক্ষণ দ্বারা গগনে বিকীর্ণ দেখিতে পাই, তৎসমুদ্রায় একটিমাত্র নাক্ষত্রিক জগৎ। অসংখ্য নক্ষত্রময় ছায়াপথ এই নাক্ষত্রিক বিশ্বের অন্তর্গত। এমন অন্যান্য নাক্ষত্রিক জগৎ আছে। এই সকল দূর-দৃষ্ট তারাপুঞ্জময়ী নীহারিকা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাক্ষত্রিক জগৎ। সমুদ্রতীরে যেমন বালি, বনে যেমন পাতা, মালার রাশিতে যেমন ফুল, এক একটি নীহারিকাতে নক্ষত্র রাশি তেমনি অসংখ্য এবং ঘনবিন্যস্ত। এই সকল নীহারিকান্তর্গত নক্ষত্র সংখ্যা ধরিলে সাত কোটি সত্তর লক্ষ কোথায় ভাসিয়া যায়! কোটি কোটি নক্ষত্র আকাশ মণ্ডলে বিচরণ করিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার

ভাবিতে ভাবিতে মনুষ্য বুদ্ধি চিন্তায় অশক্ত হইয়া উঠে। চিত্ত বিস্ময়বিহ্বল হইয়া যায়। সর্ব্বত্রগামিনী মনুষ্যবুদ্ধিরও গমনসীমা দেখিয়া চিত্ত নিরস্ত হয়।

এই কোটি কোটি নক্ষত্র সকলই সূর্য্য। আমরা যে এক সূর্য্যকে সূর্য্য বলি, সে কত বড় প্রকাণ্ড বস্তু, তাহা সৌরবিপ্লব সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পৃথিবী অপেক্ষা ত্রয়োদশ লক্ষ গুণ বৃহৎ। নাক্ষত্রিক জগৎ মধ্যস্থ অনেক গুলি নক্ষত্র যে এ সূর্য্যাপেক্ষাও বৃহৎ, তাহা এক প্রকার স্থির হইয়াছে। এমন কি, সিরিয়স (Sirius) নামে নক্ষত্র এই সূর্য্যের ২৬৬৮ গুণ বৃহৎ, ইহা স্থির হইয়াছে। কোন কোন নক্ষত্র যে এ সূর্য্যাপেক্ষা আকারে কিছু ক্ষুদ্রতর, তাহাও গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে। এইরূপ ছোট বড় মহাভয়ঙ্কর আকারবিশিষ্ট,

মহাভয়ঙ্কর তেজোময় কোটি কোটি সূর্য্য অনন্ত আকাশে বিচরণ করিতেছে। যেমন আমাদিগের সৌরজগতের মধ্যবর্ত্তী সূর্য্যকে ঘেরিয়া গ্রহ উপগ্রহাদি বিচরণ করিতেছে, তেমনি ঐ সকল সূর্য্যপার্শ্বে গ্রহ উপগ্রহাদি ভ্রমিতেছে, সন্দেহ নাই। তবে জগতে জগতে কত কোটি কোটি সূর্য্য, কত কোটি কোটি কোটী পৃথিবী, তাহা কে ভাবিয়া উঠিতে পারে! এ আশ্চর্য্য কথা কে বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পারে? যেমন পৃথিবীর মধ্যে এক কণা বালুকা, জগৎ মধ্যে এই সসাগরা পৃথিবী তদপেক্ষাও সামান্য, রেণুমাত্র,—বালুকার বালুকাও নহে। তদুপরি মনুষ্য কি সামান্য জীব! এ কথা ভাবিয়া কে আর আপন মনুষ্যত্ব লইয়া গর্ব্ব করিবে?

ধূলা।

ধূলার মত সামান্য পদার্থ আর সংসারে নাই। কিন্তু আচার্য্য টিণ্ডল ধূলা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। আচার্য্যের ঐ প্রবন্ধটি দীর্ঘ এবং দুরূহ, তাহা সংক্ষেপে এবং সহজে বুঝান অতি কঠিন কর্ম্ম। আমরা কেবল টিণ্ডল সাহেব কৃত সিদ্ধান্ত গুলিই এ প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিব, যিনি তাঁহার প্রমাণ জিজ্ঞাসু হইবেন, তাঁহাকে আচার্য্যের প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইবে।

১। ধূলা, এই পৃথিবীতলে এক প্রকার সর্ব্বব্যাপী। আমরা যাহা যত পরিষ্কার করিয়া রাখি না কেন, তাহা মুহূর্ত্ত জন্য ধূলা ছাড়া নহে। যত "বাবুগিরি" করি না কেন, কিছুতেই ধূলা হইতে নিষ্কৃতি নাই। যে বায়ু অত্যন্ত পরি-

ষ্কার বিবেচনা করি, তাহাও ধূলায় পূর্ণ। সচরাচর ছায়ামধ্যে কোন রন্ধ্রনিপতিত রৌদ্রে দেখিতে পাই যে, যে বায়ু পরিষ্কার দেখাইতেছিল, তাহাতেও ধূলা চিক্ চিক্ করিতেছে। সচরাচর বায়ু যে এরূপ ধূলাপূর্ণ, তাহা জানিবার জন্য আচার্য্য টিণ্ডলের উপদেশের আবশ্যক নাই, সকলেই তাহা জানে। কিন্তু বায়ু ছাঁকা যায়। আচার্য্য বহুবিধ উপায়ের দ্বারা বায়ু অতি পরিপাটি করিয়া ছাঁকিয়া দেখিয়াছেন। তিনি অনেক চোঙ্গার ভিতর দ্রাবকাদি পূরিয়া তাহার ভিতর দিয়া বায়ু ছাঁকিয়া লইয়া গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহাও ধূলায় পরিপূর্ণ। এইরূপ ধূলা অদৃশ্য, কেন না তাহার কণা সকল অতি ক্ষুদ্র। রৌদ্রেও উহা অদৃশ্য। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারাও অদৃশ্য, কিন্তু বৈদ্যুতিক প্রদীপের আলোক রৌ-

দাপেক্ষাও উজ্জ্বল। উহার আলোক ঐ ছাঁকা বায়ুর মধ্যে প্রেরণ করিয়া তিনি দেখিয়াছেন যে, তাহাতেও ধূলা চিক্‌চিক্‌ করিতেছে। যদি এত যত্নপরিষ্কৃত বায়ুতেও ধূলা, তবে সচরাচর ধনী লোকে যে ধূলা নিবারণ করিবার উপায় করেন, তাহাতে ধূলা নিবারণ হয় না, ইহা বলা বাহুল্য। ছায়ামধ্যে রৌদ্র না পড়িলে রৌদ্রে ধূলা দেখা যায় না, কিন্তু রৌদ্র মধ্যে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে রেখা প্রেরণ করিলে ঐ ধূলা দেখা যায়। অতএব আমরা যে বায়ু মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নিশ্বাসে গ্রহণ করিতেছি, তাহা ধূলিপূর্ণ। যাহা কিছু ভোজন করি, তাহা ধূলিপূর্ণ, কেন না বায়ুস্থিত ধূলিরাশি দিবারাত্র সকল পদার্থের উপর বর্ষণ হইতেছে। আমরা যে কোন জল পরিষ্কৃত করি না কেন, উহা ধূলিপূর্ণ। কলিকাতার

জল পলতার কলে পরিষ্কৃত হইতেছে বলিয়া তাহা ধূলিশূন্য নহে। ছাঁকিলে ধূলা যায় না।

২। এই ধূলা বাস্তবিক সমুদয়াংশই ধূলা নহে। তাহার অনেকাংশ জৈব পদার্থ। যে সকল অদৃশ্য ধূলি কণার কথা উপরে বলা গেল, তাহার অধিক ভাগ ক্ষুদ্র২ জীব। যে ভাগ জৈব নহে, তাহা অধিকতর গুরুত্ব বিশিষ্ট; এজন্য তাহা বায়ূপরি তত ভাসিয়া বেড়ায় না। অতএব আমরা প্রতি নিশ্বাসে শত২ ক্ষুদ্র২ জীব দেহ মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকি; জলের সঙ্গে সহস্র২ পান করি; রাক্ষসবৎ অনেককে আহার করি। লণ্ডনের আটটি কোম্পানির কলে ছাঁকা পানীয় জল টিণ্ডল সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন তিনি আর অনেক প্রকার জল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত

করিয়াছেন যে, জল সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা মনুষ্য সাধ্যাতীত। যে জল স্ফাটিক পাত্রে রাখিলে বৃহৎ হীরক খণ্ডের ন্যায় স্বচ্ছ বোধ হয়, তাহাও সমল, কীটাণুপূর্ণ। জৈনেরা এ কথা স্মরণ রাখিবেন।

৩। এই সর্ব্বব্যাপিধূলিকণা সংক্রামক পীড়ার মূল। অনতি পূর্ব্বে সর্ব্বত্র এই মত প্রচলিত ছিল যে, কোন এক প্রকার পচনশীল নির্জ্জীব জৈব পদার্থ (Malaria) কর্ত্তৃক সংক্রামক পীড়ার বিস্তার হইয়া থাকে। এ মত ভারতবর্ষে অদ্যাপি প্রবল। ইউরোপে এ বিশ্বাস একপ্রকার উচ্ছিন্ন হইতেছে। আচার্য্য টিণ্ডল প্রভৃতির বিশ্বাস এই যে, সংক্রামক পীড়ার বিস্তারের কারণ সজীব পীড়াবীজ (Germ)। ঐ সকল পীড়াবীজ বায়ুতে এবং জলে ভাসিতে থাকে; এবং শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট

হইয়া তথায় জীবজনক হয়। জীবের শরীর মধ্যে অসংখ্য জীবের আবাস। কেশে উৎকুণ, উদরে কৃমি, ক্ষতে কীট, এই কয়টী মনুষ্য শরীরে সাধারণ উদাহরণ। পশু মাত্রেরই গাত্র মধ্যে কীট সমূহের আবাস। জীবতত্ত্ববিদেরা অবধারিত করিয়াছেন যে, ভূমে, জলে, বা বায়ুতে যত জাতীয় জীব আছে, তদপেক্ষা অধিক জাতীয় জীব অন্য জীবের শরীরবাসী। যাহাকে উপরে "পীড়াবীজ" বলা হইয়াছে তাহাও জীবশরীরবাসী জীব বা জীবোৎপাদক বীজ। শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তদুৎপাদ্য জীবের জন্ম হইতে থাকে। এই সকল শোণিতনিবাসী জীবের জনকতা শক্তি অতি ভয়ানক। যাহার শরীরমধ্যে ঐ প্রকার পীড়াবীজ প্রবিষ্ট হয়, সে সংক্রামক পীড়াগ্রস্ত হয়। ভিন্ন২ পীড়ার ভিন্ন২ বীজ। সংক্রামক জ্বরের

বীজে জ্বর উৎপন্ন হয়; বসন্তের বীজে বসন্ত জন্মে; ওলাউঠার বীজে ওলাউঠা; ইত্যাদি।

৪। পীড়াবীজে কেবল সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হয়, এমত নহে। ক্ষতাদি যে শুকায় না, ক্রমে পচে, দুর্গন্ধ হয়, দুরারোগ্য হয়, ইহাও অনেক সময়ে এই সকল ধূলিকণা রূপী পীড়াবীজের জন্য।* ক্ষতমুখ কখনই এমত আচ্ছন্ন রাখা যাইতে পারে না, যে অদৃশ্য ধূলা তাহাতে লাগিবে না। নিতান্ত পক্ষে তাহা ডাক্তারের অস্ত্র মুখে ক্ষতমধ্যে প্রবেশ করিবে। ডাক্তার যতই অস্ত্র পরিষ্কার রাখুন না কেন, অদৃশ্য ধূলিপুঞ্জের কিছুতেই নিবারণ হয় না। কিন্তু ইহার একটী সুন্দর উপায় আছে। ডাক্তারেরা প্রায় তাহা অবলম্বন করেন। কার্ব্বণিক আসিড নামক দ্রাবক বীজঘাতী; তাহা জল মিশাইয়া ক্ষত মুখে বর্ষণ করিতে

থাকিলে প্রবিষ্ট বীজ সকল মরিয়া যায়। ক্ষতমুখে পরিষ্কৃত তুলাবাঁধিয়া রাখিলেও অনেক উপকার হয়, কেন না তুলা বায়ু পরিষ্কৃত করিবার একটী উৎকৃষ্ট উপায়।

গগন পর্য্যটন।

পুরাণ ইতিহাসাদিতে কথিত আছে পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় রাজগণ আকাশ মার্গে রথ চালাইতেন। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের কথা স্বতন্ত্র, তাঁহারা সচরাচর এ পাড়া ও পাড়ার ন্যায়, স্বর্গলোকে বেড়াইতে যাইতেন, কথায় কথায় সমুদ্রকে গণ্ডূষ করিয়া ফেলিতেন; কেহ জগদীশ্বরকে অভিশপ্ত করিতেন, কেহ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতেন। প্রাচীন

ভারতবর্ষীয়দিগের কথা স্বতন্ত্র; সামান্য মনুষ্য-দিগের কথা বলা যাউক।

সামান্য মনুষ্যের চিরকাল বড় সাধ গগন পর্য্যটন করে। কথিত আছে, তারন্তম নগর-বাসী আর্কাইতস নামক এক ব্যক্তি ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে একটি কাষ্ঠের পক্ষী প্রস্তুত করিয়াছিল; তাহা কিয়ৎক্ষণ জন্য আকাশে উঠিতে পারিয়াছিল। ৬৬খ্রীষ্টাব্দে, সাইমন নামক এক ব্যক্তি রোম নগরে প্রাসাদ হইতে প্রাসাদে উড়িয়া বেড়াইবার উদ্যোগ পাইয়াছিল। এবং তৎপরে কনস্তান্তিনোপল নগরে একজন মুসলমান ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দান্তে নামক একজন গণিতশাস্ত্র-বিৎ পক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া আপন অঙ্গে সমাবেশ করিয়া থ্রাসিমীন হ্রদের উপর উঠিয়া গগনমার্গে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঐরূপ

করিতে করিতে এক দিন এক উচ্চ অট্টালিকার উপর পড়িয়া তাঁহার পদ ভঙ্গ হয়। মাম্স্‌বরি নিবাসী অলিবর নামক একজন ইংরেজেরও সেই দশা ঘটে। ১৬৩৮ শালে গোল্ডউইন নামক একব্যক্তি শিক্ষিত হংসদিগের সাহায্যে উড়িতে চেষ্টা করেন। ১৬৭৮ শালে বেনিয়র নামক একজন ফরাশী পক্ষ প্রস্তুত পূর্ব্বক হস্ত পদে বাঁধিয়া উড়িয়াছিল। ১৭১০ শালে লরেন্ত দে গুজ্‌মান নামক একজন ফরাসি দারুনির্ম্মিত বায়ুপূর্ণ পক্ষীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আকাশে উঠিয়াছিল। মার্কুইস্‌ দে বাকবিল নামক একজন আপন অট্টালিকা হইতে উড়িতে চেষ্টা করিয়া নদীগর্ত্তে পতিত হন। বানসার্ডেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল।

১৭৬৭ শালে বিখ্যাত রসায়ন বিদ্যার আচার্য্য ডাক্তার ব্লাক প্রচার করেন যে জল-

জন বায়ু পরিপূর্ণ পাত্র আকাশে উঠিতে পারে। আচার্য্য কাবালো ইহা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণীকৃত করেন, কিন্তু তখনও ব্যোমযানের কল্পনা হয় নাই।

ব্যোমযানের সৃষ্টিকর্ত্তা মোনগোলফীর নামক ফরাশী। কিন্তু তিনি জলজন বায়ুর সাহায্য অবলম্বন করেন নাই। তিনি প্রথমে কাগজের বা বস্ত্রের গোলক নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে উত্তপ্ত বায়ু পূরিতেন। উত্তপ্ত হইলে বায়ু লঘুতর হয়, সুতরাং তৎসাহায্যে গোলক সকল ঊর্দ্ধে উঠিত। আচার্য্য চার্লস প্রথমে জলজন বায়ুপূরিত ব্যোমযানের সৃষ্টি করেন। গ্লোব নামক ব্যোমযানে উক্ত বায়ু পূর্ণ করিয়া প্রেরণ করেন; তাহাতে সাহস করিয়া কোন মনুষ্য আরোহণ করে নাই। রাজপুরুষেরাও প্রাণিহত্যার ভয় প্রযুক্ত কাহাকেও আরোহণ

করিতে দেন নাই। এই ব্যোমযান কিয়দ্দূর উঠিয়া ফাটিয়া যায়, জলজন বাহির হইয়া যাওয়ায়, ব্যোমযান তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হয়। গোনেস নামক ক্ষুদ্র গ্রামে উহা পতিত হয়। অদৃষ্টপূর্ব্ব খেচর দেখিয়া গ্রাম্য লোকে ভীত হইয়া, মহা কোলাহল আরম্ভ করে।

অনেকে একত্রিত হইয়া গ্রাম্য লোকেরা দেখিতে আইল যে, কিরূপ জন্তু আকাশ হইতে নামিয়াছে। দুই জন ধর্ম্মযাজক বলিলেন, যে ইহা কোন অলৌকিক জীবের দেহাবশিষ্ট চর্ম্ম। শুনিয়া গ্রামবাসিগণ তাহাতে ঢিল মারিতে আরম্ভ করিল, এবং খোঁচা দিতে লাগিল। তন্মধ্যে ভূত আছে, বিবেচনা করিয়া, গ্রাম্য লোকেরা ভূত শান্তির জন্য দলবদ্ধ হইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল, পরিশেষে মন্ত্রবলে ভূত ছাড়িয়া পলায়

কিনা, দেখিবার জন্য আবার ধীরে ধীরে সেই-
খানে ফিরিয়া আসিল। ভূত তথাপি যায়
না—বায়ু সংস্পর্শে নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করে।
পরে একজন গ্রাম্যবীর, সাহস করিয়া তৎ-
প্রতি বন্দুক ছাড়িল। তাহাতে ব্যোমযানের
আবরণ ছিদ্রবিশিষ্ট হওয়াতে, বায়ু বাহির
হইয়া, রাক্ষসের শরীর আরও শীর্ণ হইল।
দেখিয়া সাহস পাইয়া, আর একজন বীর গিয়া
তাহাতে অস্ত্রাঘাত করিল। তখন ক্ষত মুখ
দিয়া বহুল পরিমাণে জলজন নির্গত হওয়ায়,
বীরগণ তাহার দুর্গন্ধে ভয় পইয়া রণে ভঙ্গ
দিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু এজাতীয় রাক্ষ-
সের শোণিত ঐ বায়ু। তাহা ক্ষতমুখে নির্গত
হইয়া গেলে, রাক্ষস ছিন্নমুণ্ড ছাগের ন্যায়
"ধড় ফড়" করিয়া মরিয়া গেল। তখন বীর-
গণ প্রত্যাগত হইয়া তাহাকে অশ্বপুচ্ছে বন্ধন

পূর্ব্বক লইয়া গেলেন। এদেশে হইলে সঙ্গে২ একটি রক্ষাকালী পূজা হইত, এবং ব্রাহ্মণেরা চণ্ডীপাঠ করিয়া কিছু লাভ করিতেন। তার পরে, মোনগোল্‌ফীর আবার আগ্নেয় ব্যোমযান(অর্থাৎ যাহাতে জলজন না পূরিয়া, উত্তপ্ত সামান্য বায়ুপূরিত হয়) বর্ষেল হইতে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে আধুনিক বেলুনের ন্যায় একখানি "রথ" সংযোজন করিয়া দেওয়া হইয়া ছিল। কিন্তু সেবারও মনুষ্য উঠিল না। সেই রথে চড়িয়া একটি মেষ, একটি কুক্কুট, ও একটি হংস স্বর্গ পরিভ্রমণে গমন করিয়াছিল। পরে স্বচ্ছন্দে গগন বিহার করিয়া, তাহারা স্বশরীরে মর্ত্ত্য ধামে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহারা পুণ্যবান্ সন্দেহ নাই।

এক্ষণে ব্যোমযানে মনুষ্য উঠিবার প্রস্তাব

হইতে লাগিল। কিন্তু প্রাণিহত্যার আশঙ্কায় ফ্রান্সের অধিপতি, তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় যে, যদি ব্যোম যানে মনুষ্য উঠে, তবে যাহারা বিচারালয়ে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাধীন হইয়াছে, এমত দুই ব্যক্তি উঠুক—মরে মরিবে। শুনিয়া পিলা-তর দে রোজীর নামক একজন বৈজ্ঞানিকের বড় রাগ হইল—"কি! আকাশ মার্গে প্রথম ভ্রমণ করার যে গৌরব, তাহা দুর্ব্বৃত্ত নরাধম দিগের কপালে ঘটিবে!" একজন রাজপুরস্ত্রীর সাহায্যে রাজার মত ফিরাইয়া তিনি মার্কুইস দার্লান্দের সমভিব্যাহারে ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া আকাশ পথে পর্য্যটন করেন। সে বার নির্ব্বিঘ্নে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছি-লেন, কিন্তু তাহার দুই বৎসর পরে—আবার ব্যোমযানে আরোহণ পূর্ব্বক, সমুদ্র পার হ-

ইতে গিয়া, অধঃপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। যাহাহউক, তিনিই মনুষ্য মধ্যে প্রথম গগনপর্য্যটক। কেন না, দুষ্মন্ত পুরুরবা, কৃষ্ণার্জ্জুন প্রভৃতিকে মনুষ্য বিবেচনা করা, অতি ধৃষ্টের কাজ! আর যিনি জয় রাম বলিয়া পঞ্চমবায়ুপথে সমুদ্র পার হইয়াছিলেন, তিনিও মনুষ্য নহেন, নচেৎ তাঁহাকে এই পদে অভিষিক্ত করার আমাদিগের আপত্তি ছিল না।

দে রোজীরের পরেই চার্লস্ ও রবর্ট একত্রে, রাজভবন হইতে, ছয় লক্ষ দর্শকের সমক্ষে জলজনীয় ব্যোমযানে উড্ডীন হয়েন। এবং প্রায় ১৪০০০ ফীট ঊর্দ্ধে উঠেন।

ইহার পরে ব্যোমযানারোহণ বড় সচরাচর ঘটিতে লাগিল। কিন্তু অধিকাংশই আমোদের জন্য। বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব পরীক্ষার্থ যাঁহারা আকাশ পথে বিচরণ করিয়াছেন, ত-

মধ্যে ১৮০৪ শালে গাই লুসাকের আরোহণই বিশেষ বিখ্যাত। তিনি একাকী ২৩০০০ ফিট ঊর্দ্ধে উঠিয়া নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছিলেন। ১৮৩৬ শালে গ্রীন এবং হলণ্ড সাহেব, পনের দিবসের খাদ্যাদি বেলুনে তুলিয়া লইয়া, ইংলণ্ড হইতে গগনারোহণ করেন। তাঁহারা সমুদ্র পার হইয়া, আঠার ঘণ্টার মধ্যে জর্ম্মাণীর অন্তর্গত উইলবর্গ নামক নগরের নিকট অবতরণ করেন। গ্রীন অতি প্রসিদ্ধ গগন পর্য্যটক ছিলেন। তিনি প্রায় চতুর্দ্দশ শত বার গগনারোহণ করিয়াছিলেন। তিনবার, বায়ুপথে সমুদ্র পার হইয়াছিলেন—অতএব, কলিযুগেও রামায়ণের দৈববলসম্পন্ন কার্য্য সকল পুনঃসম্পাদিত হইতেছে। গ্রীন, দুইবার সমুদ্র মধ্যে পতিত হয়েন—এবং কৌশলে প্রাণরক্ষা করেন।

কিন্তু বোধ হয় জেম্‌স্‌গ্লেশর অপেক্ষা কেহ অধিক ঊর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। তিনি ১৮৬২ শালে উল্বর্হাম্‌টন হইতে উড্‌ডীন হইয়া প্রায় সাত মাইল ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। তিনি বহুশতবার গগনোপরি ভ্রমণপূর্ব্বক, বহুবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমেরিকার গগনপর্য্যটক ওয়াইজ সাহেব, ব্যোমযানে আমেরিকা হইতে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া ইউরোপে আসিবার কল্পনায়, তাহার যথাযোগ্য উদ্যোগ করিয়া, যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু সমুদ্রোপরি আসিবার পূর্ব্বে বাত্যামধ্যে পতিত হইয়া অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সাহস অতি ভয়ানক!

পাঠকদিগের অদৃষ্টে সহসা যে গগনপর্য্যটন সুখ ঘটিবে, এমত বোধ হয় না, এজন্য

গগনপর্য্যটকেরা আকাশে উঠিয়া কিরূপ দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের প্রণীত পুস্তকাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া এস্থলে সন্নিবেশ করিলে, বোধ হয়, পাঠকেরা অসন্তুষ্ট হইবেন না। সমুদ্র নামটি কেবল জল সমুদ্রের প্রতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু যে বায়ু কর্ত্তৃক পৃথিবী পরিবেষ্টিত তাহাও সমুদ্র বিশেষ; জলসমুদ্র হইতে ইহা বৃহত্তর। আমরা এই বায়বীয় সমুদ্রের তলচর জীব। ইহাতেও মেঘের উপদ্বীপ, বায়ুর স্রোতঃ প্রভৃতি আছে। তদ্বিষয়ে কিছু জানিলে ক্ষতি নাই।

ব্যোমযান অল্প উচ্চ গিয়াই মেঘ সকল বিদীর্ণ করিয়া উঠে। মেঘের আবরণে পৃথিবী দেখা যায় না, অথবা কদাচিৎ দেখা যায়। পদতলে অচ্ছিন্ন, অনন্ত দ্বিতীয় বসুন্ধরাবৎ মেঘজাল বিস্তৃত। এই বাষ্পীয় আবরণে

ভূগোলক আবৃত; যদি গ্রহান্তরে জ্ঞানবান্ জীব থাকে, তবে তাহারা পৃথিবীর বাষ্পীয়াবরণই দেখিতে পায়; পৃথিবী তাহাদিগের প্রায় অদৃশ্য। তদ্রূপ আমরাও বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণের রৌদ্‌প্রদীপ্ত, রৌদ্‌প্রতিঘাতী, বাষ্পীয় আবরণই দেখিতে পাই। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের এইরূপ অনুমান।

এইরূপ, পৃথিবী হইতে সম্বন্ধরহিত হইয়া, মেঘময় জগতের উপরে স্থিত হইয়া দেখা যায়, যে সর্ব্বত্র, জীবশূন্য, শব্দশূন্য, গতিশূন্য, স্থির, নীরব। মস্তকোপরে, আকাশ অতি নিবিড় নীল—সে নীলিমা আশ্চর্য্য। আকাশ বস্তুতঃ চিরান্ধকার—উহার বর্ণ গভীর কৃষ্ণ। অমাবশ্যার রাত্রে প্রদীপশূন্য গৃহমধ্যে সকল দ্বার ও গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া থাকিলে যেরূপ অন্ধকার দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশের প্র-

কৃত বর্ণ তাহাই। তন্মধ্যে, স্থানে স্থানে নক্ষত্র সকল, প্রচণ্ড জ্বালা বিশিষ্ট। কিন্তু তদালোকে অনন্ত আকাশের অনন্ত অন্ধকার বিনষ্ট হয় না—কেন না এই সকল প্রদীপ বহুদূরস্থিত। তবে যে আমরা আকাশকে অন্ধকারময় না দেখিয়া উজ্জ্বল দেখি, তাহার কারণ বায়ু। সকলেই জানেন সূর্য্যালোক সপ্তবর্ণময়। স্ফটিকের দ্বারা বর্ণগুলি পৃথক্ করা যায়—সপ্ত বর্ণের সংমিশ্রণে সূর্য্যালোক। বায়ু জড় পদার্থ কিন্তু বায়ু আলোকের পথ রোধ করে না। বায়ু, সূর্য্যালোকের অন্যান্য বর্ণের পথ ছাড়িয়া দেয় কিন্তু নীলবর্ণকে রুদ্ধ করে। রুদ্ধ বর্ণ, বায়ু হইতে প্রতিহত হয়। সেই সকল প্রতিহত বর্ণাত্মক আলোক রেখা আমাদের চক্ষুতে প্রবেশ করায়, আকাশ উ-জ্জ্বল নীলিমাবিশিষ্ট দেখি—অন্ধকার দেখি

না।* কিন্তু যত ঊর্দ্ধে উঠা যায়, বায়ুস্তর তত-ক্ষীণতর হয়, গাগনিক উজ্জ্বল নীলবর্ণ ক্ষীণ-তর হয়; আকাশের কৃষ্ণত্ব কিছু কিছু সেই আবরণ ভেদ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য ঊর্দ্ধলোকে গাঢ় নীলিমা।

শিরে এই গাঢ় নীলিমা—পদতলে, তুঙ্গ শৃঙ্গ বিশিষ্ট পর্ব্বত মালায় শোভিত মেঘলোক—সে পর্ব্বত মালাও বাস্পীয়—মেঘের পর্ব্বত—পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত, তদুপরি আরও পর্ব্বত—কেহবা কৃষ্ণমধ্য, পার্শ্বদেশ রৌদ্রের প্রভাবিশিষ্ট—কেহবা রৌদ্রস্নাত, কেহ যেন শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত, কেহ যেন হীরক নির্ম্মিত। এই সকল মেঘের মধ্যদিয়া ব্যোমযান চলে।

* কেহ কেহ বলেন যে বায়ুমধ্যস্থ জল বাষ্প হইতে প্রতিহত নীল রশ্মি রেখাই আকাশের উজ্জ্বল নীলিমার কারণ।

তখন, নীচে মেঘ, উপরে মেঘ, দক্ষিণে মেঘ, বামে মেঘ, সম্মুখে মেঘ, পশ্চাতে মেঘ। কোথাও বিদ্যুৎ চমকিতেছে, কোথাও ঝড় বহিতেছে, কোথাও বৃষ্টি হইতেছে, কোথাও বরফ পড়িতেছে। মসূর ফন্ বিল একবার একটি মেঘগর্ভস্থ রন্ধ্র দিয়া ব্যোমযানে গমন করিয়াছিলেন; তাঁহার কৃত বর্ণনা পাঠ করিয়া বোধ হয় যেমন মুঙ্গেরের পথে পর্ব্বতমধ্যদিয়া, বাষ্পীয় শকট গমন করে, তাঁহার ব্যোমযান মেঘ মধ্য দিয়া সেইরূপ পথে গমন করিয়াছিল।

এই মেঘলোকে সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্ত অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য—ভূলোকে তাহার সাদৃশ্য অনুমিত হয় না। ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া অনেকে একদিনে দুইবার সূর্য্যাস্ত দেখিয়াছেন। এবং কেহ কেহ একদিনে দুইবার

সূর্য্যোদয় দেখিয়াছেন। একবার সূর্য্যাস্তের পর রাত্রি সমাগম দেখিয়া আবার ততোধিক ঊর্দ্ধে উঠিলে দ্বিতীয়বার সূর্য্যাস্ত দেখা যাইবে। এবং একবার সূর্য্যোদয় দেখিয়া আবার নিম্নে নামিলে সেই দিন দ্বিতীয় সূর্য্যোদয় অবশ্য দেখা যাইবে।

ব্যোমযান হইতে যখন পৃথিবী দেখা যায় তখন উহা বিস্তৃত মানচিত্রের ন্যায় দেখায়; সর্ব্বত্র সমতল—অট্টালিকা, বৃক্ষ, উচ্চভূমি, এবং অল্পোন্নত মেঘও, যেন সকলই অনুচ্চ, সকলই সমতল, ভূমিতে চিত্রিতবৎ দেখায়। নগর সকল যেন ক্ষুদ্র২ গঠিত প্রতিকৃতি, চলিয়া যাইতেছে বোধ হয়। বৃহৎ জনপদ উদ্যানের মত দেখায়। নদী শ্বেত সূত্র বা উরগের মত দেখায়। বৃহৎ অর্ণবযান সকল বালকের ক্রীড়ার জন্য নির্ম্মিত তরণীর মত

দেখায়। যাঁহারা লণ্ডন বা পারিস্ নগরীর উপর উত্থান করিয়াছেন, তাঁহারা দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন,—তাঁহারা প্রশংসা করিয়া ফুরাইতে পারেন নাই। গ্লেশর সাহেব লিখিয়াছিলেন যে তিনি লণ্ডনের উপরে উঠিয়া এককালে ত্রিশলক্ষ মনুষ্যের বাসগৃহ নয়নগোচর করিয়াছিলেন। রাত্রিকালে মহানগরী সকলের রাজপথস্থ দীপমালা সকল অতি রমণীয় দেখায়।

যাঁহারা পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে যত ঊর্দ্ধে উঠা যায়, তত তাপের অল্পতা। শিমলা দারজিলিং প্রভৃতি পার্ব্বত্য স্থানের শীতলতার কারণ এই, এবং এইজন্য হিমালয় তুষার মণ্ডিত। (আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে হিমকে ভারতবর্ষীয় কবি "একোহি দোষোগুণসন্নিপাতে" বিবেচনা করিয়া-

ছিলেন, আধুনিক রাজপুরুষেরা, তাহাকেও গুণ বিবেচনা করিয়া তথায় রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছেন।) ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থান করিলেও ঐরূপ ক্রমে হিমের আতিশয্য অনুভূত হয়। তাপ, তাপমান যন্ত্রের দ্বারা মিত হইয়া থাকে। যন্ত্র ভাগে ভাগে বিভক্ত। মনুষ্য শোণিত কিছু উষ্ণ, তাহার পরিমাণ ৯৮ ভাগ। ২১২ ভাগ তাপে জল বাস্প হয়। ৩২ ভাগ তাপে জল তুষারত্ব প্রাপ্ত (তাপে জল তুষার হয় এ কোন কথা? বাস্তবিক তাপে জল তুষার হয় না, তাপাভাবেই হয়। ৩২ ভাগ তাপ জলের স্বাভাবিক তাপের অভাব বাচক।)

পূর্ব্বে বিজ্ঞানবিদ্‌গণের সংস্কার ছিল যে ঊর্দ্ধে তিনশত ফিট প্রতি এক ভাগ তাপ কমে। অর্থাৎ তিনশত ফিট উঠিলে এক

ভাগ তাপহানি হইবে—ছয়শত ফিট উঠিলে দুই ভাগ তাপ কমিবে—ইত্যাদি। কিন্তু গ্লেশর সাহেব বহুবার পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে ঊর্দ্ধে তাপহানি এরূপ একটি সরল নিয়মানুগামী নহে। অবস্থা বিশেষে তাপহানির লাঘব গৌরব ঘটিয়া থাকে। মেঘ থাকিলে, তাপহানি অল্প হয়—কারণ, মেঘ তাপরোধক এবং তাপগ্রাহক। আবার দিবা-ভাগে যেরূপ তাপহানি ঘটে, রাত্রে সেরূপ নহে। গ্লেশর সাহেবের পরীক্ষার ফল নিম্ন-লিখিত মত—

ভূমি হইতে হাজার ফিট পর্য্যন্ত মেঘাচ্ছন্নাবস্থায় তাপহানির পরিমাণ ৪·৫ ভাগ; মেঘ না থাকিলে ৬·২ ভাগ, দশ হাজার ফিট পর্য্যন্ত, মেঘাচ্ছন্নাবস্থায় ২·২ ভাগ, মেঘ না থাকিলে ২ ভাগ। বিশ হাজার ফিট ঊর্দ্ধে,

মেঘাচ্ছন্ন ১.১ ভাগ; মেঘ শূন্যে ১.২ ভাগ। ত্রিশ হাজার ফিট ঊর্দ্ধে মোট ৬২ ভাগ তাপ-হ্রাস পরীক্ষিত হইয়া ছিল। ইত্যাদি। তাপহ্রাস হেতু ঊর্দ্ধে স্থানে২ তুষার কণা (Snow) দৃষ্ট হয়; এবং ব্যোমযান কখন২ তন্মধ্যে পতিত হয়। ঊর্দ্ধে শীতাধিক্য, অনেক সময়ে যানারোহীদিগের কষ্টকর হইয়া উঠে —এমন কি অনেক সময়ে হাত পা অবশ হয়, এবং চেতনা অপহৃত হয়।

ঊর্দ্ধে তাপাভাবের কারণ তপ্ত বা তাপ্য সামগ্রীর অভাব। রৌদ্র ভূমে যেমন প্রখর, ঊর্দ্ধে বরং ততোধিক প্রখরতর বোধ হয়। কিন্তু তাহাতে কি তপ্ত হইবে? ভূমি অতি দূরে, বায়ু অতিক্ষীণ,—অল্প পরমাণু। দশ বারটি তুলার বস্তা উপর্য্যুপরি রাখিয়া দেখি-বেন—উপরিস্থ তুলার ভারে, নিম্নস্থ বস্তার

তুলা গাঢ়তর হইয়াছে। তেমনি নিম্নস্থ বায়ুই গাঢ়—উপরিস্থ বায়ু ক্ষীণ। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে—যে এক ইঞ্চ দীর্ঘ প্রস্থে, এরূপ ভূমির উপরে যে ভার, তাহার পরিমাণ সাড়ে সাতসের। আমরা মস্তকের উপর অহরহঃ এই ভার বহন করিতেছি—তজ্জন্য কোন পীড়া বোধ করি না কেন? উত্তর, "অগাধ জল সঞ্চারী" মৎস্য উপরিস্থ বারিরাশির ভারে পীড়িত হয় না কেন? উপরিস্থ বায়ুস্তর সমূহের ভারে নিম্নস্থ বায়ুস্তর সকল ঘনীভূত—যত ঊর্দ্ধে যাওয়া যায়, বায়ু তত ক্ষীণ হইতে থাকে। গগনপর্য্যটকেরা ইহা পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন গুরুতা অনুসারে, ৩৮০ মাইল ঊর্দ্ধের মধ্যেই অর্দ্ধেক বায়ু আছে; এবং পাঁচ ছয় মাইলের মধ্যেই সমুদায় বায়ুর তিন ভাগের দুই ভাগ আছে।

এইজন্য ঊর্দ্ধে উঠিতে গেলে, নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য অত্যন্ত কষ্ট হয়। মসূর ফ্লামারিয় দশসহস্র ফীট ঊর্দ্ধে উঠিয়া, প্রথম বারে, যেরূপ কষ্ট অনুভূত করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা এইরূপ করিয়াছেন, যথা—

"সাতটা বাজিতে এক পোওয়া থাকিতে আমার শরীর মধ্যে এক অপূর্ব্ব আভ্যন্তরিক শীতলতা অনুভূত করিতে লাগিলাম। তৎসহিত তন্দ্রা আসিল। কষ্টে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলাম। কর্ণমধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ হইতে লাগিল এবং আধ মিনিট কাল, আমার হৃদ্রোগ উপস্থিত হইল। কণ্ঠ শুষ্ক হইল। আমি এক পাত্র জল পান করিলাম—তাহাতে উপকার বোধ হইল। যে বোতলে জল ছিল —তাহার ছিপি খুলিবার সময়ে, যেমন শ্যাম্পেনের বোতলের ছিপি সশব্দে বেগে উঠিয়া

পড়ে, জলের বোতলের ছিপি খুলিতে সেই রূপ হইল। ইহার কারণ সহজেই বুঝা যাইতে পারে। তখন আমাদিগের মস্তকের উপর বায়ু, এক ভাগ কম হইয়াছিল। যখন বোতলে ছিপি আঁটিয়া গগনে যাত্রা করিয়াছিলাম, তখনকার অপেক্ষা এখনকার বায়ুর ভার এক ভাগ কম হইয়াছিল।"

দুই একবার গগন মার্গে যাতায়াত করিলে এ সকল কষ্ট সহ্য হইয়া আইসে, কিন্তু অধিক উর্দ্ধে উঠিলে সহিষ্ণু ব্যক্তিরও কষ্ট হয়। গ্লেশর সাহেব এ সকল কষ্ট বিশেষ সহিষ্ণু ছিলেন, কিন্তু ছয় মাইল উর্দ্ধে উঠিয়া তিনিও চেতনাশূন্য ও মুমূর্ষু হইয়াছিলেন। ২৯০০০ ফিট উপরে উঠিলে পর, তাঁহার দৃষ্টি অস্পষ্ট হইয়া আইসে। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আর তাপমান যন্ত্রের পারদ-স্তম্ভ অথবা ঘড়ির কাঁটা

দেখিতে সক্ষম হইলেন না। টেবিলের উপর এক হাত রাখিলেন। যখন টেবিলের উপর হাত রাখিলেন, তখন হস্ত সম্পূর্ণ সবল; কিন্তু তখনই সে হাত আর উঠাইতে পারিলেন না —তাহার শক্তি অন্তর্হিতা হইয়াছিল। তখন দেখিলেন দ্বিতীয় হস্তও সেই দশাপন্ন হই-য়াছে—অবশ। তখন একবার গাত্রালোড়ন করিলেন, গাত্র চালনা করিতে পারিলেন, কিন্তু বোধ হইল যেন হস্ত পদাদি নাই। ক্রমে এইরূপে তাঁহার সকল অঙ্গ অবশ হ-ইয়া পড়িল; ভগ্নগ্রীবের ন্যায় মস্তক লম্বিত হইয়া পড়িল, এবং দৃষ্টি একেবারে বিলুপ্ত হ-ইল। এইরূপে তিনি অকস্মাৎ মৃত্যুর আ-শঙ্কা করিতেছিলেন, এমত সময়ে, হঠাৎ তাঁ-হার চৈতন্যও বিলুপ্ত হইল। পরে ব্যোমযা-নের "সারথি," রথ নামাইলে তিনি পুনর্ব্বার

জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন।

রথ নামাইল কি প্রকারে? ব্যোমযানের গতি দ্বিবিধ, প্রথম, ঊর্দ্ধ হইতে অধঃ বা অধঃ হইতে ঊর্দ্ধ। দ্বিতীয় দিগন্তরে; যেমন শকটাদি অভিলষিত দিকে যায় সেই রূপ। ব্যোমযান অভিলষিত দিগন্তরে চালনা করা এ পর্য্যন্ত মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত হয় নাই—চালক মনে করিলে, উত্তরে, পশ্চিমে, বামে বা দক্ষিণে, সম্মুখে বা পশ্চাতে যান চালাইতে পারেন না। বায়ুই ইহার যথার্থ সারথি, বায়ুসারথি যে দিকে লইয়া যায়, ব্যোমযান সেই দিকে চলে। কিন্তু অধোর্দ্ধ গতি মনুষ্যের আয়ত্ত। ব্যোমযান লঘু করিতে পারিলেই ঊর্দ্ধে উঠিবে এবং পার্শ্ববর্ত্তী বায়ুর অপেক্ষা গুরু করিতে পারিলেই নামিবে। ব্যোমযানের "রথে" কতকটা বালুকা বোঝাই থাকে; তাহার কিয়দংশ

নিক্ষিপ্ত করিলেই পূর্ব্বাপেক্ষা লঘুতা সম্পাদিত হয়—তখন ব্যোমযান আরও ঊর্দ্ধে উঠে। এইরূপে ইচ্ছাক্রমে ঊর্দ্ধে উঠা যায়। আর যে লঘু বায়ু কর্ত্তৃক বেলুন পরিপূরিত থাকায় তাহা গগনমণ্ডলে উঠিতে সক্ষম, তাহার কিয়দংশ নির্গত করিতে পারিলেই উহা নামে। ঐ বায়ু নির্গত করিবার জন্য ব্যোমযানের শিরোভাগে একটি ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্র সচরাচর আবৃত থাকে, কিন্তু তাহার আবরণে একটি দড়ি বাঁধা থাকে; সেই দড়ি ধরিয়া টানিলেই লঘু বায়ু বাহির হইয়া যায়; ব্যোমযান নামিতে থাকে।

দিগন্তরে গতি মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে বটে, কিন্তু মনুষ্য বায়ুর সাহায্য অবলম্বন করিতে সক্ষম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন দিগভিমুখে বায়ু

বহিতে থাকে। যখন ব্যোমারোহী ভূমির উপরে দক্ষিণ বায়ু দেখিয়া, যানারোহণ করিলেন তখনই হয়ত, কিয়দ্দূর উঠিয়া দেখিলেন যে বায়ু উত্তরে; আরও উঠিলে হয়ত দেখিবেন যে বায়ু পূর্ব্বে কি পুনশ্চ দক্ষিণে। ইত্যাদি। কোন্ স্তরে কোন্ সময়ে কোন্ দিকে বায়ু বহে, ইহা যদি মনুষ্যের জানা থাকিত, তাহা হইলে ব্যোমযান মনুষ্যের আজ্ঞাকারী হইত। যাঁহারা সুচতুর, তাঁহারা কখন কখন বায়ুর গতি অবধারিত করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে গগন পর্য্যটন করিয়াছেন। ১৮৬৮ শালের আগষ্ট মাসে মসূর তিসান্দির কালে নগর হইতে নেপ্চ্যুননামক বেলুনে গগনারোহণ করেন। চারি হাজার ফিট্ ঊর্দ্ধে উঠিয়া দেখিলেন যে তাঁহাদিগের গতি উত্তর সমুদ্রে! অপরাহ্নে এই রূপ তাঁহারা অকস্মাৎ

অনিচ্ছার সহিত, অনন্ত সাগরের উপর যাত্রা করিলেন। কিন্তু তখন উপায়ান্তর ছিলনা। এই শঙ্কটে তাঁহারা দেখিলেন যে নিম্নে মেঘ সকল দক্ষিণগামী। তখন তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া সমুদ্র বিহারে চলিলেন। এই রূপে তাঁহারা ২১ মাইল পর্য্যন্ত সমুদ্রোপরে বাহির হইয়া যান। তাহার পর লঘু বায়ু নির্গত করিয়া দিয়া, নীচে নামেন। বায়ুর সেই নিম্ন স্তরে দক্ষিণ বায়ু পাইয়া তৎকর্ত্তৃক বাহিত হইয়া পুনর্ব্বার ভূমির উপরে আসেন। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ অবতরণ করেন না। তার পর সন্ধ্যা হইয়া অন্ধকার হইল। বাস্পের গাঢ়তা বশতঃ নিম্নে ভূতল দেখা যাইতেছিল না। এমত অবস্থায় তাঁহারা কোথায় যাইতে-ছিলেন, তাহা জানিতে পারেন নাই। অকস্মাৎ নিম্ন হইতে গম্ভীর সমুদ্র কল্লোল উত্থিত হ-

হইল। তখন অন্ধকারে পুনর্ব্বার অনন্ত সা, গরোপরে বিচরণ করিতেছেন জানিতে পারিয়া, তাঁহারা আবার নিম্নে নামিলেন। আবার দক্ষিণবায়ুর সাহায্যে ভূমি প্রাপ্ত হইলেন।

উত্তর সমুদ্রে বিচরণ কালে তাঁহারা কয়েকটি অদ্ভুত ছায়া দেখিয়াছিলেন। দেখিলেন যে সমুদ্রে যে সকল বাষ্পীয়াদি জাহাজ চলিতেছিল, ঊর্দ্ধে মেঘমধ্যে তাহার প্রতিবিম্ব। মেঘমধ্যে তেমনি সমুদ্র চিত্রিত হইয়াছে— সেই চিত্রিত সমুদ্রে তেমনি প্রকৃত জাহাজের ন্যায় ছায়ার জাহাজ চলিতেছে। সেই সকল জাহাজের তলদেশ ঊর্দ্ধে, মাস্তুর নিম্নে; বিপরীত ভাবে, জাহাজ চলিতেছে। মেঘরাশি বৃহদ্দর্পণ স্বরূপ সমুদ্রকে প্রতিবিম্বিত করিয়াছিল।

মসূর. ফ্লামারিয়ঁ আর একটি আশ্চর্য্য প্র-

তিবিম্ব দেখিয়াছিলেন। দিবাভাগে, প্রায় পাঁচ সহস্র ফিট, ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, তাঁহাদিগের প্রায় শত ফিট মাত্র দূরে, দ্বিতীয় একটি বেলুন চলিয়াছে। আরও দেখিলেন, যে সেই দ্বিতীয় বেলুনটির আকৃতি তাঁহাদিগের বেলুনেরই আকৃতি, যেমন তাঁহাদিগের বেলুনের নিম্নে "রথ" যুক্ত ছিল, এবং তাহাতে যাঁহারা দুই জন আরোহী বসিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বেলুনেও সেইরূপ রথ, এবং সেইরূপ দুই জন আরোহী! আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে সেই দুইজন আরোহীর অবয়ব—তাঁহাদিগেরই অবয়ব! তাঁহারাই সেই দ্বিতীয় বেলুনে বসিয়া আছেন! একটি বেলুনে যেখানে যাহা ছিল—যেখানে যে দড়ি, যেখানে যে সূতা, যেখানে যে যন্ত্র, দ্বিতীয় বেলুনে ঠিক তাহাই আছে! মসূর৹ ফ্লামারিয়ঁ

দক্ষিণ হস্তোত্তোলন করিলেন—ভৌতিক ফ্লা- মারিয়া বাম হস্তোত্তোলন করিল! তাঁহার সঙ্গী একটা পতাকা উড়াইলেন—ভৌতিক সঙ্গী একটা তদ্রূপ পতাকা উড়াইল।

আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে সেই ভৌতিক ব্যোমযানের ভৌতিক রথের চতুঃ পার্শ্বে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল সকল প্রতি- ভাত হইতেছিল। মধ্যে হরিৎ শ্বেতাভ মণ্ডল, তন্মধ্যে রথ। তৎপার্শ্বে ক্ষীণ নীল মণ্ডল; তাহার বাহিরে হরিদ্রাবর্ণ মণ্ডল; তৎপরে কপিশ রক্তাভ মণ্ডল, শেষে অতসীকুসুমবৎ বর্ণ; তাহা ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া মেঘের সঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে।

এইবৃত্তান্ত বুঝাইবার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রব ন্ধের মধ্যে হইতে পারে না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে ইহা জলবাষ্পের উপর প্রতি-

সৌর বিম্ব* মাত্র।

গগনপথে পার্থিব শব্দ সহজে গমন করে, কিন্তু সকল সময়ে নহে, এবং সকল শব্দের গতি তুল্য রূপ নহে। মেঘাচ্ছন্নে শব্দরোধ ঘটে। গ্লেশর সাহেব চারি মাইল ঊর্দ্ধ হইতে রেইলওয়ে ট্রেনের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন। এবং বিশহাজার ফিট উপরে থাকিয়া কামানের শব্দ শুনিয়াছিলেন। একটি ক্ষুদ্র কুক্কুরের রব দুই মাইল উপর হইতে শুনিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু চারি হাজার ফিট উপরে থাকিয়া বহুসংখ্যক মনুষ্যের কোলাহল শুনিতে পান নাই। মসূর ফ্লমারিয়ঁ আকাশ হইতে ভূমণ্ডলের বাদ্য শুনিতে পাইতেন। তাঁহার বোধ হইত যেন মেঘমধ্যে কে সঙ্গীত করিতেছে।

* Ant' helia

অনেকেই অবগত আছেন, যে যখন পারিশ অবরুদ্ধ হয়, তখন ব্যোমযানযোগে পারিশ হইতে গ্রাম্য প্রদেশে ডাক যাইত। শিক্ষিত পারাবত সকল সেই সকল ব্যোমযানে চড়িয়া যাইত; তাহাদের পুচ্ছে উত্তর বাঁধিয়া দিলে লইয়া ফিরিয়া আসিত। লঘুতার অনুরোধে সেই সকল পত্র ফটোগ্রাফের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্রাকারে লিখিত হইত—অতি-বৃহৎ পত্র এক ইঞ্চির মধ্যে সমাবিষ্ট হইত। পড়িবার সময়ে অনুবীক্ষণ ব্যবহার করিতে হইত। স্থানাভাব বশতঃ এই কৌতুকাবহ তত্ত্ব আমরা সবিস্তারে লিখিতে পারিলাম না।

উপসংহার কালে বক্তব্য যে ব্যোমযান এখনও সাধারণের গমনাগমনের উপযোগী বা যথেচ্ছ বিহারের উপায় স্বরূপ হয় নাই। গ্লেশর সাহেব বলেন, যে বেলুনের দ্বারা সে

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না; যানান্তর ইহার দ্বারা সূচিত হইতে পারে; যানান্তর সূচিত না হইলে সে আশা পূর্ণ হইবে না। মনুষ্য কখন উড়িতে পারিবে কি না, মসূর্ ফুমারিয়ঁ এই তত্ত্বের সবিস্তারে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে একদিন মনুষ্যগণ অবশ্য পক্ষীদিগের ন্যায় উড়িতে পারিবে; কিন্তু আত্মবলে নহে। যখন মনুষ্য, পক্ষ বা পক্ষবৎ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া, বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক বলে তাহা সঞ্চালন করিতে পারিবে, তখন মনুষ্যের বিহঙ্গ পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। দে লোম নামক একজন ফরাশী একটি মৎস্যাকার বেলুন কল্পনা করিয়াছেন, তিনি বিবেচনা করেন তৎসাহায্যে মনুষ্য যথেচ্ছা আকাশ পথে যাতায়াত করিতে পারিবে। কিন্তু সে যন্ত্র হইতে এপর্য্যন্ত কোন ফলোদয় হয় নাই

বলিয়া আমরা তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম না।

চঞ্চল জগৎ।

সচরাচর মনুষ্যের বোধ এই যে গতি জগতের বিশেষ অবস্থা; স্থিরতা জগতের স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে, যে গতিই স্বাভাবিক অবস্থা; স্থিরতা কেবল গতির রোধ মাত্র। যাহা গতিবিশিষ্ট কারণ বশতঃ তাহার গতির রোধ হইলে,তাহার অবস্থাকে আমরা স্থিরতা বা স্থিতি বলি। যে শিলা খণ্ড, বা অট্টালিকাকে অচল বিবেচনা করিতেছি, বাস্তবিক তাহার মাধ্যাকর্ষণের বলে গতিবিশিষ্ট; নিম্নস্থ ভূমি তাহার গতি রোধ করিতেছে বলিয়া তাহাকে স্থির

বলিতেছি। এ স্থিরতাও কাল্পনিক; পৃথিবী-তলস্থ অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিতেছি যে এই পর্ব্বত বা এই অট্টালিকা, অচল, গতিশূন্য—বস্তুতঃ উহার কেহই অচল বা গতিশূন্য নহে, পৃথিবীর উপরে থাকিয়া উহা পৃথিবীর সঙ্গে আবর্ত্তন করিতেছে। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিতে গেলে জগতে কিছুই গতিশূন্য নহে।

কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্। যাহা পৃথিবীর গতিতে গতিবিশিষ্ট তাহাকে চঞ্চল বলিবার প্রয়োজন করে না। তথাপিও পৃথিবীতে এমত কোন বস্তু নাই, যে মুহূর্ত্তজন্য স্থির।

চারিপার্শ্বে চাহিয়া দেখ, বায়ু বহিতেছে, বৃক্ষপত্র সকল নাচিতেছে, জল চলিতেছে, জীব সকল নিজ নিজ প্রয়োজন সম্পাদনার্থ

বিচরণ করিতেছে। পরন্তু ইহার মধ্যেও কোন২ বস্তু গতিশূন্য দেখা যাইতেছে। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণে বা অন্যপ্রকারে রুদ্ধ বাহ্যিকগতি ভিন্ন, ঐ সকল বস্তুর অন্য গতি আছে। সেই সকল গতি আভ্যন্তরিক।

বস্তু মাত্রেরই কিয়ৎ পরিমাণে তাপ আছে। যাহাকে শীতল বলি, তাহা বস্তুতঃ তাপশূন্য নহে। তাপের অল্পতাকেই শীতলতা বলি, তাপের অভাব কিছুতেই নাই। যে তুষার-খণ্ডের স্পর্শে অঙ্গচ্ছেদের ক্লেশানুভব করিতে হয়, তাহাতেও তাপের অভাব নাই—অল্পতা মাত্র।

যাহাকে তাপ বলি, তাহা পরামাণুগণের আন্দোলন মাত্র। কোন বস্তুর পরমাণু সকল পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট এবং সন্তাড়িত হইলে, তাহা তরঙ্গবৎ আন্দোলিত হইতে থাকে।

সেই ক্রিয়াই তাপ। যেখানে সকল বস্তুই তাপযুক্ত, সেখানে সকল বস্তুর পরমাণুই অহরহ পরস্পর কর্ত্তৃক আকৃষ্ট, সন্তাড়িত, এবং সঞ্চালিত। অতএব পৃথিবীস্থ, সকল বস্তুই আভ্যন্তরিক গতিবিশিষ্ট।

আলোক সম্বন্ধেও সেই কথা। ইথর নামক বিশ্বব্যাপী আকাশীয় তরল পদার্থের পরমাণু সমষ্টির তরঙ্গবৎ আন্দোলনই আলোক। সেই গতিবিশিষ্ট পরমাণু সকলের সঙ্গে নয়নেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আলোক অনুভূত হয়। সেই প্রকার তাপীয় তরঙ্গসহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে তাপ অনুভূত করি। এই সকল আন্দোলন ক্রিয়া মনুষ্যের দৃষ্টির অগোচর—উহা তাপরূপে এবং আলোকরূপেই আমরা ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক গ্রহণ করিতে পারি—অন্য রূপে নহে। তবে এই আন্দোলন ক্রিয়ার

অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কারণ কি? ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদেরা তাহা স্বীকার করিবার বিশেষ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা এস্থলে বর্ণনীয় নহে।

পৃথিবীতলে আলোক সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। অতি অন্ধকার অমাবস্যার রাত্রে, পৃথিবীতল একেবারে আলোকশূন্য নহে। অতএব সর্ব্বত্রেই সর্ব্বদা আলোকীয় আন্দোলনের গতি বর্ত্তমান।

বিজ্ঞানবিদেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে আলোক, তাপ, এবং মাধ্যাকর্ষণ তিনটিই পরমাণুর গতি মাত্র। অতএব পৃথিবীর সকল বস্তুই আভ্যন্তরিক গতি বিশিষ্ট। যৌগিক আকর্ষণের বলে সেই সকল গতি সত্ত্বেও কোন বস্তুর পরমাণু সকল বিস্রস্ত ও পৃথগ্‌ভূত হয় না।

পৃথিবীতলে এইরূপ। তারপর, পৃথিবীর বাহিরে কি?

পৃথিবী স্বয়ং অত্যন্ত প্রখর বেগ বিশিষ্টা, এবং অনন্তকাল আকাশমার্গে ধাবমানা। পৃথিবীর ন্যায় অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি যাহা সৌর জগতের অন্তর্গত তাহাও পৃথিবীর মত অবস্থাপন্ন সন্দেহ নাই। সেই সকল গ্রহ উপগ্রহে যে সকল পদার্থ আছে, তাহাও পার্থিবপদার্থের ন্যায় সর্ব্বদা বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক গতি বিশিষ্ট। জ্যোতির্ব্বিদ্গণের দৌরবীক্ষণিক অনুসন্ধানে সে কথার অনেক প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে।

সূর্য্য নামে যে বৃহৎ বস্তু এই সৌরজগতের কেন্দ্রীভূত, তাহা যেরূপ চাঞ্চল্যপূর্ণ, তাহা মনুষ্যের অনুভব শক্তির অতীত। যে সূর্য্যমণ্ডলের তাপ, আলোক, আকর্ষণ এবং বৈদ্যু-

তাদিকী শক্তি পৃথিবীস্থ গতি মাত্রেরই কারণ, সেই সূর্য্যমণ্ডলোপরে বা তদভ্যন্তরে যে নানাবিধ ভয়ঙ্কর এবং অদ্ভুত গতি নিয়ত বর্ত্তিবে, তাহা বলা বাহুল্য। সেই চাঞ্চল্যের একটি উদাহরণ বঙ্গদর্শনের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায় "আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত" নামক প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছিল।

কিন্তু সূর্য্যোপরে এবং সূর্য্যগর্ভে যে নিয়ত গতির আধিপত্য, কেবল ইহাই নহে। সূর্য্য স্বয়ং গতি বিশিষ্ট। বিজ্ঞানবিদেরা স্থির করিয়াছেন, যে সূর্য্য স্বয়ং এই তাবৎ সৌরজগৎ সঙ্গে লইয়া প্রতি সেকেণ্ডে ৪৮০ মাইল অর্থাৎ ঘণ্টায় ১৭১০০ মাইল আকাশ পথে ধাবিত হইতেছে। এই ভয়ঙ্কর বেগে এই পদার্থরাশি কোথায় যাইতেছে? কেহ বলিতে পারে না কোথায় যাইতেছে। আকাশের

একটি নাক্ষত্রিক প্রদেশকে ইউরোপীয়েরা হরকুালিজ বলেন। সূর্য্য তন্মধ্যস্থ লাম্‌ড্রা নামক নক্ষত্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, কেবল এই পর্য্যন্ত নিশ্চিত হইয়াছে।

কিন্তু সূর্য্য এবং সৌরজগৎ ত বিশ্বের অতি ক্ষুদ্রাংশ। অন্ধকার রাত্রে অনন্ত আকাশমণ্ডল ব্যাপিয়া যে সকল জ্যোতিষ্ক জ্বলিতে থাকে, তাহারা সকলেই এক একটি সৌর জগতের কেন্দ্রীভূত। সে সকল কি? গতি শূন্য? তাহাদিগেরও প্রাত্যহিক উদয়াস্তাদি গতি দেখিতে পাই, সেও পৃথিবীর প্রাত্যহিক আবর্ত্তনজনিত চাক্ষুস ভ্রান্তি মাত্র। নাক্ষত্রিক লোকেও কি জগৎ চঞ্চল?

জ্যোতির্ব্বিদ্যার দ্বারা যত দূর অনুসন্ধান হইয়াছে, ততদূর জানিতে পারা গিয়াছে, যে নক্ষত্র লোকেও গতি সর্ব্বময়ী। যত অনুস-

ন্ধান হইয়াছে, ততই বুঝা গিয়াছে যে সূর্য্যের যে প্রকৃতি নক্ষত্র মাত্রেরই সেই প্রকৃতি। গ্রহ-ভিন্ন অন্য তারাকে নক্ষত্র বলিতেছি।

কতকগুলি নক্ষত্র সৌর গ্রহগণের ন্যায় বর্ত্তনশীল। যেখানে আমরা চক্ষে একটি নক্ষত্র দেখিতে পাই, দূরবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলে তথায় কখন২ দুইটি, তিনটি বা ততোধিক নক্ষত্র দেখা যায়। কখন২ ঐ দুই তিনটি নক্ষত্র পরস্পরের সহিত সম্বন্ধরহিত, এবং পরস্পর হইতে দূরস্থিত, অথচ দর্শক যেখান হইতে দেখিতেছেন, সেখান হইতে দেখিতে গেলে আকাশের একদেশে স্থিত দেখায়, এবং একটি সরল রেখার মধ্যবর্ত্তী হইয়া যুগ্ম নক্ষত্রের ন্যায় দেখায়। কিন্তু কখন২ দেখা যায় যে, যে নক্ষত্রদ্বয় দেখিতে যুগ্ম, তাহা বাস্তবিক যুগ্মই বটে,—পরস্পরের নিকট-

বর্ত্তী এবং পরস্পারের সহিত নৈসর্গিক সম্বন্ধ বিশিষ্ট। এই সকল যুগ্মাদি নক্ষত্র সম্বন্ধে আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদেরা পর্য্যবেক্ষণা ও গণনার দ্বারা স্থিরীকৃত করিয়াছেন.যে উহারা পরস্পরকে বেড়িয়া বর্ত্তন করিতেছে। অর্থাৎ যদি ক, খ, এই দুইটি নক্ষত্রে একটি যুগ্ম নক্ষত্র হয়, তবে ক, খ, উভয়ের মাধ্যাকর্ষণিক কেন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে ক, খ, উভয় নক্ষত্র বর্ত্তন করিতেছে। কখনং দেখা গিয়াছে, যে এই রূপ দুইটি কেন, বহু নক্ষত্রে এক একটি নাক্ষত্রিক জগৎ। তন্মধ্যস্থ বিভক্ত নক্ষত্রগুলি সকলই ঐ প্রকার আবর্ত্তনকারী। বিচিত্র এই যে নিউটন, পৃথিবীতে বসিয়া, পার্থিব পদার্থের গতি দেখিয়া, পার্থিব উপগ্রহ চন্দ্রের গতিকে উপলক্ষ করিয়া, যে সকল মাধ্যাকর্ষণিক গতির নিয়ম আবিষ্কৃত করিয়া ... ...,

দূরবর্ত্তী এবং সৌরজগতের বহিঃস্থ এই সকল নক্ষত্রের গতিও সেই সকল নিয়মাধীন।

নক্ষত্রগণের প্রকৃতি এবং সূর্য্যের প্রকৃতি যে এক, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। ডাক্তার হুগিন্স্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা আলোক পরীক্ষক যন্ত্রের সাহায্যে জানিয়াছেন, যে, যে সকল বস্তুতে সূর্য্য নির্ম্মিত, অন্যান্য নক্ষত্রেও সেই সকল বস্তু লক্ষিত হয়। অতএব সূর্য্যোপরি ও সূর্য্যগর্ব্ভে যে প্রকার ভয়ঙ্কর কোলাহল, ও বিপ্লব, নিত্য বর্ত্তমান বলিয়া বোধ হয়, তারাগণেও সেই রূপ হইতেছে, সন্দেহ নাই। যে নক্ষত্র দূরবীক্ষণ সাহায্যেও অস্পষ্ট দৃষ্ট আলোকবিন্দু বলিয়া বোধ হয়, তাহাতে ক্ষণমাত্রে যে সকল উৎপাত ঘটিতেছে, পৃথিবীতলে দশবর্ষের নৈসর্গিক ক্রিয়া একত্রিত করিলেও তাহার তুল্য হইবে না। সূর্য্যমণ্ডলে

সামান্য মাত্র কোন পরিবর্ত্তনে যে বিপ্লব ও নৈসর্গিক শক্তিব্যয় সূচিত হয়, তাহাতে পলক মাত্রে এই পৃথিবী ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে। প্রচণ্ড বাত্যার কল্লোল অথবা কর্ণবিদারক অ-শনি সম্পাত শব্দ হইতে লক্ষ লক্ষ লক্ষগুণে ভীমতর কোলাহল অনবরত সেই সৌরময়গুলে নির্ঘোষিত হইতেছে সন্দেহ নাই। আর এই যে সহস্র সহস্র, স্থির, শীতল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কগণ দেখিতেছি, তাহাতেও সেইরূপ হইতেছে, কেননা সকলই সূর্য্যপ্রকৃতি বিশিষ্ট, বরং আমাদিগের সূর্য্য অনেক অনেক নক্ষত্রের অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং হীনতেজা। সিরিয়স না-মক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র, আমাদিগের নয়ন হইতে যত দূরে আছে, আমাদিগের সূর্য্য ততদূরে প্রেরিত হইলে, উহা তৃতীয়শ্রেণীর ক্ষুদ্র নক্ষ-ত্রের ন্যায় দেখাইত; আকাশের কতশত ন-

ক্ষত্র তদপেক্ষা উজ্জ্বল জ্বালায় জ্বলিত! কিন্তু যদি সূর্য্যকে অল্‌দেবরণ (রোহিণী?) কস্তুর, বেটেলগুস্‌ প্রভৃতি নক্ষত্রের স্থানে প্রেরণ করা যায়, তবে সূর্য্যকে দেখা যাইবে কি না সন্দেহ। প্রক্‌টর সাহেব বলেন যে আকাশে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, বোধ হয় তা-হার মধ্যে পঞ্চাশটিও আমাদের সূর্য্যাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইবে না। অতএব সূর্য্যমণ্ডলে যেরূপ চাঞ্চল্যের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়, অধি-কাংশ নক্ষত্রে ততোধিক চাঞ্চল্য বর্ত্তমান, সন্দেহ নাই।

কেবল তাহাই নহে, সূর্য্য যেমন অতি প্রচণ্ডবেগে, গ্রহগণ সহিত, আকাশ পথে ধাব-মান, অন্যান্য নক্ষত্রগণও তদ্রূপ। বরং অ-নেক নক্ষত্রের বেগ সূর্য্যাপেক্ষা প্রচণ্ডতর। সিরিয়সের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ২০ মাইল,

ঘণ্টায় ৭২০০০ মাইল। বেগা নামক উজ্জ্বল নক্ষত্রের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৫০ মাইল, ঘণ্টায় ১৮০০০০ মাইল; কাষ্টর প্রতি সেকেণ্ডে ২৫ মাইল, ঘণ্টায় ৩৬০০০ মাইল। পোলাক্সের গতি সেকেণ্ডে ৪৯ মাইল, প্রায় বেগার ন্যায়। সপ্তর্ষির মধ্যের পাঁচটির গতি সিরিয়সের ন্যায়, একটির গতি বেগার ন্যায়। এই বেগ অতি ভয়ঙ্কর, বিশেষ যখন মনে করা যায় যে এই সকল প্রচণ্ডবেগশালী পদার্থের আকার অতি প্রকাণ্ড (সিরিয়স সূর্য্যাপেক্ষা সহস্রগুণ বৃহৎ) তখন বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না।

নক্ষত্র সকল অদ্ভুত গতিবিশিষ্ট হইলেও, চারি সহস্র বৎসরেও তত্তাবতের স্থানভ্রংশ মনুষ্যচক্ষে লক্ষিত হয় নাই। ঐ সকল নক্ষত্রের অসীম দূরতাই ইহার কারণ। উৎকৃষ্ট

দূরবীক্ষণ সাহায্যে, আশ্চর্য্য মান যন্ত্র ও বিদ্যা কৌশলের বলে আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদেরা কিঞ্চিৎ স্থানচ্যুতি পর্য্যবেক্ষিত করিয়াছেন। তাহাতেই ঐ সকল গতি স্থিরীকৃত হইয়াছে।

নাক্ষত্রিক গতিতত্ত্ব অতি আশ্চর্য্য। গগনের এক দেশে স্থিত নক্ষত্র ও একদিকেই ধাবমান না হইয়াও নানাদিকে ধাবমান। কখন বা একদিকেই ধাবমান। কোথায় ধাবমান? কেন ধাবমান? সে সকল তত্ত্বের আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজনীয়, এবং এক প্রকার অসাধ্য।

যাহা বলা গেল, তাহাতে প্রতীয়মান হইতেছে, যে গতিই জাগতিক নিয়ম—স্থিতি নিয়ম রোধের ফলমাত্র। জগৎ সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা, চঞ্চল। সেই চাঞ্চল্য বিশেষ করিয়া বুঝিতে গেলে, অতি বিস্ময়কর বোধ হয়।

জীবনাধারে, শোণিতাদির চাঞ্চল্যই জীবন। হৃৎপিণ্ড বা শ্বাসযন্ত্রের চাঞ্চল্য রহিত হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। মৃত্যু হইলে পরেও, দৈহিক পরমাণু মধ্যে রাসায়নিক চাঞ্চল্য সঞ্চার হইয়া, দেহ ধ্বংস হয়। যেখানে দৃষ্টিপাত করিব, সেইখানে চাঞ্চল্য, সেই চাঞ্চল্য মঙ্গল-কর। যে বুদ্ধি চঞ্চলা, সেই বুদ্ধি চিন্তাশালিনী! যে সমাজ গতি বিশিষ্ট, সেই সমাজ উন্নতিশীল। বরং সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ভাল, তথাপি স্থিরতা ভাল নহে।

কত কাল মনুষ্য।

প্রথম সংখ্যা।

জলে যেরূপ বুদ্বুদ উঠিয়া তখনই বিলীন হয়, পৃথিবীতে মনুষ্য সেই রূপ জন্মিতেছে ও মরিতেছে। পুত্রের পিতা ছিল; তাহার

পিতা ছিল, এই রূপ অনন্ত মনুষ্য শ্রেণী পরম্পরা সৃষ্ট এবং গত হইয়াছে, হইতেছে, এবং যত দূর বুঝা যায়, ভবিষ্যতেও হইবে। ইহার আদি কোথা? জগদাদির সঙ্গে কি মনুষ্যের আদি, না পৃথিবীর সৃষ্টির বহুপরে প্রথম মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে? পৃথিবীতে মনুষ্য কত কাল আছে?

খ্রীষ্টান দিগের প্রাচীন গ্রন্থানুসারে মনুষ্যের সৃষ্টি, এবং জগতের সৃষ্টি কালি পরশ্ব হইয়াছে। যেদিন জগদীশ্বর কুম্ভকার রূপে কাদা ছানিয়া পৃথিবী গড়িয়া, ছয়দিনে তাহাতে মনুষ্যাদি পুত্তল সাজাইয়া ছিলেন, খ্রীষ্টানেরা অনুমান করেন যে সে ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে। একথা খ্রীষ্টানেরাও আর বিশ্বাস করেন না। আমাদিগের ধর্ম্মপুস্তকের কথার প্রতি আমরাও সেইরূপ হতশ্রদ্ধা হইয়াছি। বি-

জ্ঞানের প্রবাহে সর্ব্বত্রেই ধর্ম্মপুস্তক সকল ভাসিয়া যাইতেছে। কিন্তু আমাদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থে এমত কোন কথা নাই যে তাহাতে বুঝায় যে আজি কালি, বা ছয় শত বৎসর বা ছয় সহস্র বৎসর, বা ছয় বৎসর পূর্ব্বে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে, অথবা অনন্ত কাল পূর্ব্বে জগতের সৃষ্টি। আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানেরও সেই মত।

তবে জগতের আদি আছে কি না, কেহ কেহ এই তর্ক তুলিয়া থাকেন। সৃষ্টি অনাদি, এ জগৎ নিত্য; ও সকল কথায় বুঝায় যে সৃষ্টির আরম্ভ নাই। কিন্তু সৃষ্টি একটি ক্রিয়া—ক্রিয়া মাত্র, কোন বিশেষ সময়ে কৃত হইয়াছে; অতএব সৃষ্টি কোন কাল বিশেষে হইয়া থাকিবে। অতএব সৃষ্টি অ-

নাদি বলিলে, অর্থ হয় না। যাঁহারা বলেন সৃষ্টি হইতেছে, যাইতেছে, আবার হইতেছে, এই রূপ অনাদি কাল হইতে হইতেছে, তাঁহারা প্রমাণ শূন্য বিষয়ে বিশ্বাস করেন। একথার নৈসর্গিক প্রমাণ নাই।

"অসৃজচ্চ জগৎসর্ব্বং সহ পুত্রৈঃ কৃতাত্মভিঃ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সূচিত হয়, যে জগৎ সৃষ্টি এবং মনুষ্য বা মনুষ্য জনক দিগের সৃষ্টি এক কালেই হইয়াছিল। এরূপ বাক্য হিন্দু গ্রন্থে অতি সচরাচর দেখা যায়। যদি এ কথা যথার্থ হয়, তাহা হইলে, যত কাল চন্দ্র সূর্য্য, ততকাল মনুষ্য। বৈজ্ঞানিকেরা এতদ্বি কি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই সমালোচিত করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞানের অদ্যাপি এমত শক্তি হয় নাই যে জগৎ অনাদি কি সাদি তাহার মীমাংসা

করেন। কোন কালে সে মীমাংসা হইবে কি না, তাহাও সন্দেহের স্থল। তবে এক কালে, জগতের যে এরূপ ছিল না, বিজ্ঞান ইহা বলিতে সক্ষম। ইহা বলিতে পারে, যে এই পৃথিবী এইরূপ তৃণ শস্য বৃক্ষময়ী, সাগর পর্ব্বতাদি পরিপূর্ণা, জীবসঙ্কুলা, জীব বাসোপযোগিনী ছিলনা; গগন এককালে এরূপ সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রাদি বিশিষ্ট ছিল না। একদিন—তখন দিন, হয় নাই—এককালে জল ছিল না, ভূমি ছিল না—বায়ু ছিল না। কিন্তু যাহাতে এই চন্দ্র সূর্য্য তারা হইয়াছে, যাহাতে জল বায়ু ভূমি হইয়াছে—যাহাতে নদ নদী সিন্ধু—বন বিটপী বৃক্ষ—তৃণ লতা পুষ্প—পশু পক্ষী মানব হইয়াছে তাহা ছিল। জগতের রূপান্তর ঘটিয়াছে, ইহা বিজ্ঞান বলিতে পারে। কবে ঘটিল, কি প্রকারে ঘটিল, তাহা বিজ্ঞান বলিতে

পারে না। তবে ইহাই বলিতে পারে যে সকলই নিয়মের বলে ঘটিয়াছে—ক্ষণিক ইচ্ছাধীন নহে। যে সকল নিয়মে অদ্যাপি জড় প্রকৃতি শাসিতা হইতেছে, সেই সকল নিয়মের ফলেই এই ঘোর রূপান্তর ঘটিয়াছে। সেই সকল নিয়মে? তবে আর সেরূপ রূপান্তর দেখি না কেন? দেখিতেছি। তিল তিল করিয়া, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জগতের রূপান্তর ঘটিতেছে। কোটি কোটি বৎসর পরে, পৃথিবী কি ঠিক এই রূপ থাকিবে? তাহা নহে।

কিরূপে এই ঘোর রূপান্তর ঘটিল, এ প্রশ্নের একটি উত্তর অতি বিখ্যাত। আমরা লাপ্লাসের মতের কথা বলিতেছি। লাপ্লাসের মত ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও জানেন—সংক্ষেপে বর্ণিত করিলেই হইবে। লাপ্লাস সৌরজগতের উৎপত্তি বুঝাইয়াছেন। তিনি

বলেন, মনে কর, আদৌ সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহাদি নাই, কিন্তু সৌরজতের প্রান্ত অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্র সমভাবে, সৌরজগতের পরমাণু সকল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। জড় পরমাণু মাত্রেরই, পরস্পরাকর্ষণ, তাপক্ষয়, সঙ্কোচন প্রভৃতি যে সকল গুণ আছে, ঐ জগদ্ব্যাপী পরমাণুর ও থাকিবে। তাহার ফলে, ঐ পরমাণুরাশি, পরমাণুরাশির কেন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া ঘূর্ণিত হইতে থাকিবে। এবং তাপক্ষতির ফলে ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে। সঙ্কোচনকালে, পরমাণু জগতের বহিঃপ্রদেশ সকল মধ্যভাগ হইতে বিযুক্ত হইতে থাকিবে। বিযুক্ত ভগ্নাংশ পূর্ব্ব সঞ্চিত বেগের গুণে মধ্য প্রদেশকে বেড়িয়া ঘূরিতে থাকিবে। যে সকল কারণে বৃষ্টিবিন্দু গোলত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই সকল কারণে ঘূরিতে ঘূরিতে সেই ঘূর্ণিত বিযুক্ত ভগ্নাংশ,

গোলাকার প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে এক এ-
কটি গ্রহের উৎপত্তি। এবং তাহা হইতে
উপগ্রহগণেরও এরূপে উৎপত্তি। অবশিষ্ট
মধ্যভাগ, সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান সূর্য্যে
পরিণত হইয়াছে।

যদি স্বীকার করা যায়, যে আদৌ পরমাণু
মাত্র, আকার শূন্য হইয়া জগৎ ব্যাপিয়া ছিল
—জগতে আর কিছুই ছিল না—তাহাহইলে
ইহা সিদ্ধ হয় যে প্রচলিত নৈসর্গিক নিয়মের
বলে জগৎ সূর্য্য,* চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু-
বিশিষ্ট হইবে—ঠিক্ এখন যেরূপ, সেইরূপ
হইবে। প্রচলিত নিয়ম ভিন্ন অন্য প্রকার
ঐশিক আজ্ঞার সাপেক্ষ নহে। এই গুরুতর

*গতিশূন্য নক্ষত্র মাত্রেই সূর্য্য। জগতে কোটি কোটি
সূর্য্য।

তত্ত্ব, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বুঝাইবার সম্ভাবনা নহে —এবং ইহা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হইতেও পারে না। আমাদের সে উদ্দেশ্যও নহে। যাঁহারা বিজ্ঞানালোচনায় সক্ষম তাঁহারা এই নৈহারিক উপপাদ্য সম্বন্ধে হর্বট্ স্পেন্সেরের বিচিত্র প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। দেখিবেন, যে স্পেন্সের কেবল আকার শূন্য পরমাণু সমষ্টির অস্তিত্ব মাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাহাহইতে জাগতিক ব্যাপারের সমুদায়ই সিদ্ধ করিয়াছেন। স্পেন্সরের সকল কথাগুলি প্রামাণিক না হইলে হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির কৌশল আশ্চর্য্য।

এইরূপে যে বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে, এমত কোন নৈসর্গিক প্রমাণ নাই। অন্য কোন প্রকারে, যে সৃষ্টি হয় নাই, তাহার কোন নৈসর্গিক প্রমাণ নাই। তবে লাপ্লাসের মতে

প্রমাণ বিরুদ্ধও কিছু নাই।* অসম্ভব কিছু নাই। এ মত সম্ভব, সঙ্গত—অতএব ইহা প্রমাণের অতীত হইলেও গ্রাহ্য।

এই মত, প্রকৃত হইলে, স্বীকার করিতে হয় যে আদৌ পৃথিবী ছিল না। সূর্য্যাঙ্গ হইতে পৃথিবী বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। পৃথিবী যখন বিক্ষিপ্ত হয়, তখন ইহা বাস্পরাশি মাত্র—নহিলে বিক্ষিপ্ত হইবে না। অতএব পৃথিবীর প্রথমাবস্থা, উত্তপ্ত বাস্পীয় গোলক।

একটি উত্তপ্ত বাস্পীয় গোলক—আকাশ পথে বহুকাল বিচরণ করিলে কি হইবে? প্রথমে তাহার তাপহানি হইবে। যেখানে তাপের আধার মাত্র নাই—সেখানে তাপ লেশ নাই; তাহা অচিন্তনীয় শৈত্য বিশিষ্ট।

* কোম্‌ৎ, মিল, স্পেন্সর প্রভৃতি এই মত অনুমোদন করেন। সর্ জন হর্শেল বলেন, এ মত প্রমাণ বিরুদ্ধ।

আকাশে তাপাধার কিছু নাই—অতএব আ-কাশমার্গ অচিন্তনীয় শৈত্য বিশিষ্ট। এই শৈত্য বিশিষ্ট আকাশে বিচরণ করিতে করিতে তপ্ত বাষ্পীয় গোলকের অবশ্য তাপক্ষয় হ-ইবে। তাপক্ষয় হইলে কি হইবে?

জলের উত্তপ্ত বাষ্প সকলেই দেখিয়াছেন। সকলেই দেখিয়াছেন যে ঐ বাষ্প শীতল হ-ইলে জল হয়। আরও শীতল হইলে, জল বরফ হয়। সকল পদার্থের এই নিয়ম। যাহা উত্তপ্ত অবস্থায় বাষ্পাকৃত, তাপক্ষয়ে তাহা গাঢ়তা এবং কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়। অত-এব বাষ্পীয় গোলকাকৃতা পৃথিবীর তাপক্ষয় হইলে, কালে তাহা এক্ষণকার গাঢ়তা এবং কঠিনাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

পৃথিবী কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াও কিছুকাল অগ্নিতপ্ত ছিল বিবেচনা হয়। অপেক্ষাকৃত

শীতলতা ঘটিলেই কঠিনতা জন্মিবে, কিন্তু কঠিনতা জন্মিলেই তাহার সঙ্গে জীবাবাস-যোগ্য শীতলতা ছিল বিবেচনা করা যায় না। সেও কালে ঘটিয়াছিল। তাপক্ষতি হেতু যে শীতলতা, তাহা উপরিভাগেরই প্রথমে ঘটে, উপরি ভাগ শীতল হইলেও, ভিতর তপ্ত থাকে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে অদ্যাপি বিষম তাপ আছে। ভূতত্ত্ববিদেরা ইহা পুনঃ পুনঃ প্রমাণীকৃত করিয়াছেন।

সেই উত্তপ্ত আদিমাবস্থায়, পৃথিবীতলে কোন জীব বা উদ্ভিদের বাসের সম্ভাবনা ছিল না। উত্তপ্ত বাষ্পীয় গোলক জীবাবাসোপ-যোগী শীতলতা এবং কঠিনতা প্রাপ্ত হইতে লক্ষ লক্ষ যুগ অতিবাহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই—কেননা আমাদের দুধের বাটী জুড়া-ইতে যে কালবিলম্ব হয়, তাহাতেই আমাদের

ধৈর্য্যচ্যুতি জন্মে। অতএব পৃথিবীর উৎপত্তির লক্ষ লক্ষ যুগ পরেও জীব বা উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় নাই।

যাঁহারা ভূতত্ত্বের কিছুমাত্র জানেন, তাঁহারাও অবগত আছেন, যে পৃথিবীর উপরে নানাবিধ মৃত্তিকা এবং প্রস্তর স্তরে স্তরে সন্নিবেশিত আছে। এইরূপ স্তর সন্নিবেশ কিয়দ্দূর মাত্র পাওয়া যায়, তাহার পরে যে সকল প্রস্তর পাওয়া যায়, তাহা স্তরত্ব শূন্য।

নীচে স্তরত্বশূন্য প্রস্তর, তদুপরি স্তরে স্তরে নানাবিধ প্রস্তর, গৈরিক বা মৃত্তিকা। এই সকল স্তরনিবদ্ধ প্রস্তর, গৈরিক বা মৃত্তিকাভ্যন্তরে এমত অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, যে তাহা এক কালে সমুদ্রতলে ছিল। এমন কি অনেকগুলি স্তর কেবল ক্ষুদ্র২ সমুদ্রচর

জীবের শরীরের সমষ্টি মাত্র। চাখড়ি নামে যে গৈরিক বা প্রস্তর প্রচলিত, তাহা ইউরোপ খণ্ডের অধিকাংশের এবং আসিয়ার কিয়দং-শের নিম্নে স্তরনিবদ্ধ আছে। এক্ষণে বর্ত্তমান অনেকগুলি পর্ব্বত কেবল চাখড়ি। এই চা-খড়ি কেবল এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমুদ্রতল-চর জীবের (Globigerinae) মৃত দেহের সমষ্টি মাত্র।

অতএব এই সকল গৈরিকস্তর এক কালে সমুদ্রতলস্থ ছিল। ভূভাগের কোন স্থান কখন সমুদ্রতলস্থ হইতেছে; আবার কাল সহকারে সমুদ্র সে স্থান হইতে সরিয়া যাইতেছে; স-মুদ্রতল শুষ্ক ভূমিখণ্ড হইতেছে। ভূগর্ব্ভস্থ রুদ্ধবায়ু, বা অন্য কারণে কোথাও ভূমি কাল সহকারে উন্নত, কালসহকারে অবনত হই-তেছে। যেখানে ভূমি উন্নত হইল, সেখান

হইতে সমুদ্র সরিয়া গেল, যেখানে অবনত হইল, তাহার উপরে সাগরজলরাশি আসিয়া পড়িল। তাহার উপরে সমুদ্রবাহিত মৃত্তিকা, জীবদেহাদি পতিত হইয়া একটী নূতন স্তর সৃষ্ট হইল। মনে কর, আবার কালে, সমুদ্র সরিয়া গেল—সমুদ্রের তল শুষ্ক ভূমি হইল—তাহার উপর বৃক্ষাদি জন্মিয়া—জীবসকল জন্ম গ্রহণ করিয়া বিচরণ করিল। আবার যদি কখন উহা সমুদ্র গর্ব্ভস্থ হয়, তবে তদুপরি নূতন স্তর সংস্থাপিত হইবে, এবং তথায় যে সকলজীব বিচরণ করিত, তাহাদিগের দেহাবশেষ সেই স্তরে প্রোথিত হইবে। জীবের অস্থি ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না—কিন্তু অতি দীর্ঘকাল প্রোথিত থাকিলে একরূপ প্রস্তরত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অস্থ্যাদিকে “ফসিল” বলা যায়। পাতুরিয়া কয়লা, ফসিল কাষ্ঠ।

যে কয়টী কথা উপরে বলিলাম তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে

১। সর্ব্বনিম্নে স্তরত্বশূন্য প্রস্তর। তদুপরি অন্যান্য গৈরিকাদি স্তরে স্তরে সন্নিবিষ্ট।

২। স্তর পরম্পরা, সাময়িক সম্বন্ধ বিশিষ্ট। যে স্তরটি নিম্নে, সেটি আগে, যেটি তাহার উপরে, সেটি তাহার পরে হইয়াছে।

৩। যে স্তরে যে জীবের ফসিল অস্থি পাওয়া যায়, সেই স্তর যখন শুষ্ক ভূমি বা জলতল ছিল, তখন সেই জীব বর্ত্তমান ছিল। যদি কোন স্তরে কোন জীব বিশেষের ফসিল একেবারে পাওয়া না যায়, তবে সেই স্তর সৃজনকালে সেই জীব ছিল না।

৪। যদি কোন স্তরে ক নামক জীবের ফসিল পাওয়া যায়, খ নামক জীবের ফসিল পাওয়া যায় না; তাহার উপরিস্থ কোন স্তরে

যদি ঐ খ নামক জীবের ফসিল পাওয়া যায়, তবে সিদ্ধ হইতেছে খ নামক জন্তু ক নামক জন্তুর পরে সৃষ্ট।

সর্ব্বনিম্নস্থ স্তরত্বশূন্য প্রস্তরে কোন ফসিল ছিল না। অতএব সিদ্ধ হইতেছে, যে পৃথিবীর প্রথম ভূমিতে কোন জীব বিচরণ করে নাই। তখন পৃথিবী জীব শূন্য ছিল।

যখন প্রথম স্তরমধ্যে জীবদেহের ফসিল দেখা যায়, তখন মনুষ্যের অবস্থানের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। মনুষ্য দূরে থাকুক, কোন বৃহৎ বা ক্ষুদ্র চতুষ্পদ জন্তুর ফসিল পাওয়া যায় না। মৎস্য বা সরীসৃপের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। যে সকল ক্ষুদ্র কীটাদিবৎ জীবের দেহাবশেষ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শম্বুকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অতএব আদিম জীবলোকে শম্বুকেরা প্রভু ছিল।

তৎপরে মৎস্য দেখা দিল। ক্রমে উপরে উঠিতে সরীসৃপ জাতীয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালীয় সরীসৃপ, অতি ভয়ঙ্কর, তাদৃশ বিচিত্র, বৃহৎ এবং ভয়ঙ্কর সরীসৃপ এক্ষণে পৃথিবীতে নাই। সরীসৃপের রাজ্যের পরে, স্তন্যপায়ী জীবের দেখা পাওয়া যায়। ক্রমে নানাবিধ, হস্তী ঋক্ষ, গণ্ডার, সিংহ, হরিণ জাতীয় প্রভৃতি দেখা যায়, তথাপি মনুষ্য দেখা যায় না। মনুষ্যের চিহ্ন কেবল সর্ব্বোর্দ্ধ স্তরে, অর্থাৎ আধুনিক মৃত্তিকায়। তন্নিম্নস্থ অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরেও কদাচিৎ মনুষ্যের চিহ্ন পাওয়া যায়। অতএব মনুষ্যের সৃষ্টি সর্ব্বশেষে; মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক জীব।*

*এ কথায় এমত বুঝায় না, যে মনুষ্যের পর কোন জীবের উৎপত্তি হয় নাই। বোধ হয়, বিড়াল মনুষ্যের কনিষ্ঠ।

"আধুনিক" শব্দে এস্থলে কি বুঝায় তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। যে সকল স্তরের কথা বলিলাম, সে গুলির সমবায়, পৃথিবীর ত্বগের স্বরূপ। একটি স্তরের উৎপত্তি ও সমাপ্তিতে কত লক্ষ বৎসর, কত কোটি বৎসর লাগিয়াছে, তাহা কে বলিবে? তাহা গণনা করিবার উপায় নাই। তবে কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে, যে সে কাল অপরিমিত—বুদ্ধির ধারণার অতীত। সর্ব্বোর্দ্ধ স্তরেই মনুষ্য চিহ্ন, এই কথা বলিলে, এমত বুঝায় না, যে বহু সহস্র বৎসর মনুষ্য পৃথিবীবাসী নহে। তবে পৃথিবীর বয়ঃক্রমের সঙ্গে তুলনা করিলে বোধ হয়, মনুষ্যের উৎপত্তি এই মুহূর্ত্তে হইয়াছে। এই জন্য মনুষ্যকে আধুনিক জীব বলা যাইতেছে।

মিসরদেশের রাজাবলীর যেসকল তালিকা

প্রচলিত আছে, তাহাতে যদি বিশ্বাস করা যায়, তবে মিশরদেশে দশ সহস্র বৎসরাবধি রাজশাসন প্রচলিত আছে। হোমর, খ্রীষ্টের নয়শত বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী বিদিত মহাকাব্যদ্বয় রচনা করেন; ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। হোমরের গ্রন্থে মিসরের রাজধানী শতদ্বার বিশিষ্টা থিবস্ নগরীর মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। মনুষ্যজাতি সভ্যাবস্থায় একবার উন্নতির পথে পদার্পণ করিলে, উন্নতি শীঘ্র শীঘ্র লাভ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু অসভ্যদিগের স্বতঃ সম্পন্ন যে উন্নতি তাহা অচিন্তনীয় কাল বিলম্বে ঘটিয়া থাকে। ভারতীয় বন্যজাতিগণ চারি সহস্র বৎসর সভ্যজাতির প্রতিবেশী হইয়াও বিশেষ কিছু উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। অতএব সহজে বুঝিতে পারা যায় যে মিসরদেশে সভ্যতা স্বতঃ জন্মিয়া

যেকালে, শতদ্বার বিশিষ্টা নগরী সংস্থাপনে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ বহু সহস্র বৎসর। মিসরতত্ত্বজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন, যে মেম্ফিজ প্রভৃতি নগরী থিব্‌স্‌ হইতে প্রাচীনা। এই সকল নগরীতে যে দেবালয়াদি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহাতে যুদ্ধজয়াদির উৎসবের প্রতিকৃতি আছে। সর জর্জ কর্ণওয়াল লুইস বলেন ঐতিহাসিক সময়ে মিসর দেশীয়দিগকে কখন যুদ্ধপরায়ণ দেখা যায় না। অথচ কোন কালে তাহারা যুদ্ধপরায়ণ না থাকিলে, তন্নির্ম্মিত মন্দিরাদিতে যুদ্ধ জয়োৎসবের প্রতিকৃতি থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। অতএব বিবেচনা করিতে হইবে যে ঐতিহাসিক কালের পূর্ব্বেই মিসর দেশীয়েরা এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, যে প্রকাণ্ড মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া জাতীয় কীর্ত্তি সকল তাহাতে চিত্রিত

করিত। অসভ্যজাতি কেবল আপন প্রতিভাকে সহায় করিয়া যে এত দূর উন্নতি লাভ করে অনেক সহস্র বৎসরের কাজ। তাহার পর ঐতিহাসিক কাল অনেক সহস্র বৎসর। অতএব বহু সহস্র বৎসর হইতে মিসরদেশে মনুষ্যজাতি সমাজ বদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে। সে দশ সহস্র বৎসর, কি ততোধিক, কি তাহার কিছু নূন্য তাহা বলা যায় না।

মিসরদেশ নীলনদী নির্ম্মিত। বৎসর বৎসর নীলনদীর জলে আনীত কর্দ্দমরাশিতে এই দেশ গঠিত হইয়াছে। থীব্স্ মেম্ফিজ প্রভৃতি নগরী নীলনদী পলির উপর স্থাপিত হইয়াছিল। এই নদী কর্দ্দম নির্ম্মিত প্রদেশ ১৮৫১ও১৮৫৪ সালে রাজব্যয়ে সুযোগ্য তত্ত্বাবধারকের তত্ত্বাবধারণায় নিখাত হইয়াছিল। নানা স্থানে খনন করা যায়। যেখানে খনন

করা হইয়া গিয়াছিল, সেইখান হইতেই ভগ্ন মৃৎপাত্র, ইষ্টকাদি উঠিয়াছিল। এমন কি ষাট ফিট নীচে হইতে ইষ্টক উঠিয়াছিল। সকল স্থানে এইরূপ ইষ্টকাদি পাওয়া গিয়াছিল, অতএব ঐ সকল ইষ্টক পূর্ব্বতন কূপাদি নিহিত বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। এই সকল খনন কার্য্য হেকেকিয়ান বে নামক একজন সুশিক্ষিত আরমাণি জাতীয় কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধারণায় হইয়াছিল। লিনাণ্টবে নামক অপর একজন কর্ম্মচারী ৭২ ফিট নিম্নে ইষ্টক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মস্যুর গিরার্ড অনুমান করেন যে নীলের কর্দ্দম, শত বৎসরে পাঁচ ইঞ্চি মাত্র নিক্ষিপ্ত হয়। যদি শত বৎসরে পাঁচ ইঞ্চিও ধরিয়া লওয়া যায়, তাহাহইলে হেকেকিয়ান ৬০ ফিট নীচে যে ইট পাইয়াছিলেন, তাহার বয়ঃক্রম

অন্যূন দ্বাদশ সহস্র বৎসর। মস্তর রজার হিসাব করিয়া বলিয়াছেন, যে নীলের কাদা শত বৎসরে ২।০ ইঞ্চি মাত্র জমে। যদি এ কথা সত্য হয় তবে লিনাণ্টবের ইষ্টকের বয়স্ ত্রিশ হাজার বৎসর।

অতএব যদি কেহ বলেন, যে ত্রিশ হাজার বৎসরেরও অধিক কাল মিসরে মনুষ্যের বাস তবে তাঁহার কথা নিতান্ত প্রমাণশূন্য বলা যায় না।

মিসরে যেখানে, যত দূর খনন করা গিয়াছে, সেইখানেই, পৃথিবীস্থ বর্ত্তমান জন্তুর অস্থ্যাদি ভিন্ন লুপ্ত জাতির অস্থ্যাদি কোথাও পাওয়া যায় নাই। অতএব যে সকল স্তর মধ্যে লুপ্ত জাতির অস্থ্যাদি পাওয়া যায়, তদপেক্ষা এই নীল কর্দ্দমস্তর অত্যন্ত আধুনিক। আর যদি সেই সকল লুপ্ত জন্তুর দেহাবশেষ বিশিষ্ট

স্তর মধ্যে মনুষ্যের তৎসহ সমসাময়িকতার চিহ্ন পাওয়া যায়, তবে কত সহস্র বৎসর পৃথিবীতল মনুষ্যের আবাসভূমি কে তাহার পরিমাণ করিবে?

এরূপ সমসাময়িকতার চিহ্ন ফ্রান্স ও বেল্‌জ্যমে পাওয়া গিয়াছে।

জৈবনিক।

ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ, মরুৎ, এবং আকাশ, বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে ভৌতিক সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহারাই পঞ্চভূত— আর কেহ ভূত নহে। এক্ষণে ইউরোপ হইতে নূতন বিজ্ঞান শাস্ত্র আসিয়া তাঁহাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছেন। ভূত বলিয়া আর

কেহ তাঁহাদিগকে বড় মানে না। নূতন বি-
জ্ঞান শাস্ত্র বলেন, আমি বিলাত হইতে নূতন
ভূত আনিয়াছি, তোমরা আবার কে? যদি
ক্ষিত্যাদি জড়সড় হইয়া বলেন, যে আমরা
প্রাচীন ভূত, কনাদকপিলাদির দ্বারা ভৌতিক
রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রতি জীবশরীরে বাস
করিতেছি, বিলাতী বিজ্ঞান বলেন, তোমরা
আদৌ ভূত নও। আমরা "Elementary Subs-
tances" দেখ—তাহারাই ভূত; তাহার মধ্যে
তোমরা কই! তুমি, আকাশ, তুমি কেহই নও
—সম্বন্ধ বাচক শব্দমাত্র। তুমি, তেজঃ, তুমি
কেবল একটি ক্রিয়া,—গতি বিশেষ মাত্র।
আর, ক্ষিতি, অপ্, মরুৎ, তোমরা এক একজন
দুই তিন বা ততোধিক ভূতে নির্ম্মিত। তো-
মরা আবার কিসের ভূত? সিংহাসন ছাড়!
আমার সূতবটটি পুত্তলী উহাতে বসাইব?

যদি ভারতবর্ষ, এমন সহজে ভূতছাড়া হইত তবে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এখনও অনেকে পঞ্চভূতের প্রতি ভক্তিবিশিষ্ট। বাস্তবিক ভূতছাড়াইলে একটু বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। ভূতবাদীরা বলিবেন যে যদি ক্ষিত্যাদি ভূত নহে, তবে আমাদিগের এশরীর কোথা হইতে? কিসে নির্ম্মিত হইল? নূতন বিজ্ঞান বলেন, যে "তোমাদের পুরাণ কথায় একেবারে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চাহি না। জীবশরীরের একটি প্রধান ভাগ যে জল, ইহা অবশ্য স্বীকার করিব। আর মরুতের সঙ্গে শরীরের একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে, —এমনকি শরীরের বায়ুকোষে বায়ু না গেলে প্রাণের ধ্বংস হয়, ইহাও স্বীকার করি। তেজঃ সম্বন্ধে ইহা স্বীকার করিতে তোমাদের বৈশেষিকেরা যে জঠরাগ্নি কল্পনা করিয়াছেন, তাহার

অস্তিত্ব আমার লিবিগ অতি সুকৌশলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আর যদি সন্তাপকেই তেজঃ বল, তবে মানি যে ইহা জীবদেহে অহরহঃ বিরাজ করে, ইহার লাঘব হইলে প্রাণের ধ্বংস হয়। সোডা পোতাস প্রভৃতি পৃথিবী বটে, তাহা অত্যল্প পরিমাণে শরীরমধ্যে আছে। আর আকাশ ছাড়া কিছুই নাই, কেন না আকাশ সম্বন্ধজ্ঞাপক শব্দ মাত্র। অতএব শরীরে পঞ্চভূতের অস্তিত্ব এপ্রকারে স্বীকার করিলাম। কিন্তু আমার প্রধান আপত্তি তিনটি। প্রথম, শরীরের সারাংশ এ সকলে নির্ম্মিত নহে; এ সকল ভিন্ন অন্য অনেক প্রকার উপকরণ আছে। দ্বিতীয়, ইহাদের ভূত বল কেন? তৃতীয়, ইহার সঙ্গে প্রাণাপানাদি বায়ু প্রভৃতি যে কতক গুলি কথা বল, বোধহয়, হিন্দু-রাজাদিগের আমলে আবকারির আ-

ইন প্রচলিত থাকিলে, সে কথাগুলির প্রচার হইত না।”

“দেখ, এই তোমার সম্মুখে ইষ্টক নির্ম্মিত মনুষ্যের বাসগৃহ। ইহা ইষ্টকনির্ম্মিত, সুতরাং ইহাতে পৃথিবী আছে। গৃহস্থ ইহাতে পানাদির জন্য কলসী কলসী জল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। পাকার্থ, এবং আলোকের জন্য, অগ্নি জ্বালিয়াছে, সুতরাং তেজও বর্ত্তমান। আকাশ, গৃহমধ্যে সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। সর্ব্বত্র বায়ু যাতায়াত করিতেছে। সুতরাং এ গৃহও পঞ্চভূতনির্ম্মিত? তুমি যেমন বল, মনুষ্যের এস্থানে প্রাণ বায়ু, ওস্থানে অপান বায়ু, ইত্যাদি, আমিও তেমনি বলিতেছি, এই দ্বার পথে যে বায়ু বহিতেছে, তাহা প্রাণবায়ু, ও বাতায়ন পথে যাহা বহিতেছে, তাহা অপান বায়ু ইত্যাদি। তোমারও নির্দ্দেশ যেমন

অমূলক ও প্রমাণশূন্য, আমার নির্দ্দেশ তেমনি প্রমাণশূন্য। তুমি জীব শরীর সম্বন্ধে যাহা বলিবে, আমি এই অট্টালিকা সম্বন্ধে তাহাই বলিব। তুমি যদি আমার কথা অপ্রমাণ করিতে যাও, তোমার স্বপক্ষের কথাও অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। তবে কি, তুমি আমার এই অট্টালিকাটি জীব বলিয়া স্বীকার করিবে?"

প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে এবং আধুনিক বিজ্ঞানে এই প্রকার বিবাদ। ভারতবর্ষবাসীরা মধ্যস্থ। মধ্যস্থেরা তিন শ্রেণীভুক্ত। এক শ্রেণীর মধ্যস্থেরা বলেন, যে "প্রাচীন দর্শন, আমাদের দেশীয়। যাহা আমাদের দেশীয় তাহাই ভাল, তাহাই মান্য এবং যথার্থ। আধুনিক বিজ্ঞান বিদেশী, যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে, সন্ধ্যা আহ্নিক করে না, উহারাই তাহাকে মানে। আমাদের দর্শন সিদ্ধ ঋষিপ্রণীত,

তাঁহাদিগের মনুষ্যাতীত জ্ঞান ছিল, দিব্য চক্ষে সকল দেখিতে পাইতেন কেন না তাঁহারা প্রাচীন এবং এদেশীয়। আধুনিক বিজ্ঞান যাঁহাদিগের প্রণীত, তাঁহারা সামান্য মনুষ্য। সুতরাং প্রাচীন মতই মানিব।”

আর এক শ্রেণীর মধ্যস্থ আছেন, তাঁহারা বলেন, “কোনটি মানিতে হইবে, তাহা জানি না। দর্শনে কি আছে, তাহা জানি না, বিজ্ঞানে কি আছে তাহাও জানি না। কালেজে তোতা পাখীরমত কিছু বিজ্ঞান শিখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা কর কেন সে সব মানি, তবে আমার কোন উত্তর নাই। যদি দুই মানিলে চলে, তবে দুই মানি। তবে, যদি নিতান্ত পীড়াপীড়ি কর, তবে বিজ্ঞানই মানি, কেননা তাহা না মানিলে, লোকে আজি কালি মূর্খ বলে। বিজ্ঞান মানিলে লোকে

বলিবে এ ইংরেজি জানে, সে গৌরব ছাড়িতে পারি না। আর, বিজ্ঞান মানিলে বিনা কষ্টে হিন্দুয়ানির বাঁধাবাঁধি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সে অল্প সুখ নহে। সুতরাং বিজ্ঞা-নই মানিব।”

তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যস্থেরা বলেন, “প্রাচীন দর্শন শাস্ত্র দেশী বলিয়া তৎপ্রতি আমাদিগের বিশেষ প্রীতি বা অপ্রীতি নাই। আধুনিক বিজ্ঞান সাহেবি বলিয়া তাহাকে ভক্তি বা অ-ভক্তি করি না। যেটি যথার্থ হইবে তাহাই মানিব—ইহাতে কেহ খ্রীষ্টান, বা কেহ মূর্খ বলে, তাহাতে ক্ষতি বোধ করি না। কোন্‌টি যথার্থ, কোন্‌টি অযথার্থ তাহা মীমাংসা করিবে কে? আমরা আপনার বুদ্ধিমত মীমাংসা ক-রিব;—পরের বুদ্ধিতে যাইব না। দার্শনি-কেরা আমাদিগের দেশী লোক বলিয়া তাঁহা-

দিগকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করিব না—ইংরেজেরা রাজা বলিয়া তাঁহাদিগকে অভ্রান্ত মনে করি না। "সর্ব্বজ্ঞ" বা "সিদ্ধ" মানি না; আধুনিক মনুষ্যাপেক্ষা প্রাচীন ঋষিদিগের কোন প্রকার বিশেষ জ্ঞানের উপায় ছিল, তাহা মানি না—কেন না যাহা অনৈসর্গিক তাহা মানিব না। বরং ইহাই বলি, যে প্রাচীনাপেক্ষা আধুনিকদিগের অধিক জ্ঞানবত্তার সম্ভাবনা। কেন না, কোন বংশে যদি পুরুষানুক্রমে সকলেই কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া যায়, তবে প্রপিতামহ অপেক্ষা প্রপৌত্র ধনবান্ হইবে সন্দেহ নাই। তবে, আপনার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে এ সকল গুরুতর তত্ত্বের মীমাংসা করিব কিপ্রকারে? প্রমাণানুসারে। যিনি প্রমাণ দেখাইবেন, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিব। যিনি কেবল আনুমানিক কথা বলিবেন,

তাহার কোন প্রমাণ দেখাইবেন না, তিনি পিতৃ পিতামহ হইলেও তাঁহার কথায় অশ্রদ্ধা করিব। দার্শনিকেরা, কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলেন, ক হইতে খ হইয়াছে, গরমধ্যে ঘ আঁছে, ইত্যাদি। তাঁহারা তাহার কোন প্রমাণ নির্দ্দেশ করেন না; কোন প্রমাণের অনুসন্ধান করিয়াছেন, এমত কথা বলেন না, সন্ধান করিলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি কখন প্রমাণ নির্দ্দেশ করেন, সে প্রমাণও আনুমানিক বা কাল্পনিক, তাহার আবার প্রমাণের প্রয়োজন; তাহাও পাওয়া যায় না। অতএব আজন্ম মূর্খ হইয়া থাকিতে হয়, সেও ভাল, তথাপি দর্শন মানিব না। এদিকে বিজ্ঞান আমাদিগকে বলিতেছেন, "আমি তোমাকে সহসা বিশ্বাস করিতে বলি না, যে সহসা বিশ্বাস করে, আমি তাহার

প্রতি অনুগ্রহ করি না; সে যেন আমার কাছে আইসে না। আমি যাহা তোমার কাছে প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিব, তুমি তাহাই বিশ্বাস করিও, তাহার তিলার্দ্ধ অধিক বিশ্বাস করিলে তুমি আমার ত্যজ্য। 'আমি যে প্রমাণ দিব, তাহা প্রত্যক্ষ। একজনে সকল কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, এজন্য কতকগুলি তোমাকে অন্যের প্রত্যক্ষের কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্তু যেটিতে তোমার সন্দেহ হইবে, সেইটি তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিও। সর্ব্বদা আমার প্রতি সন্দেহ করিও। দর্শনের প্রতি সন্দেহ করিলেই, সে ভস্ম হইয়া যায়, কিন্তু সন্দেহেই আমার পুষ্টি। আমি জীবশরীর সম্বন্ধে যাহা বলিতেছি, আমার সঙ্গে শবচ্ছেদ গৃহে, ও রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় আইস। সকলই প্রত্যক্ষ দেখাইব।" এইরূপ অভি-

হিত হইয়া, বিজ্ঞানের গৃহে গিয়া সকলই প্রমাণসহিত দেখিয়া আসিয়াছি। সুতরাং বিজ্ঞানেই আমাদের বিশ্বাস।"

যাঁহারা এই সকল কথা শুনিয়া কুতূহল বিশিষ্ট হইবেন, তাঁহারা বিজ্ঞান মাতার আহ্বানানুসারে তাঁহার শবচ্ছেদ গৃহে এবং রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় গিয়া দেখুন, পঞ্চ ভূতের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে। জীব শরীরের ভৌতিকতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যদি দুই একটা কথা বলিয়া রাখি, তবে তাঁহাদিগের পথ একটু সুগম হইবে।

বিষয় বাহুল্য ভয়ে কেবল একটি তত্ত্বই আমরা সংক্ষেপে বুঝাইব। আমরা অনুমান করিয়া রাখিলাম—যে পাঠক, জীবের শারীরিক নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। গঠনের কথা বলিব না—গঠনের সামগ্রীর কথা বলিব।

একবিন্দু শোণিত লইয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা কর। তাহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র২ চক্রাকার বস্তু দেখিবে। অধিকাংশই রক্ত-বর্ণ, এবং সেই চক্রাণুসমূহের বর্ণ হেতুই শোণি-তের বর্ণ রক্ত, তাহাও দেখিবে। তন্মধ্যে, মধ্যে,২ আর কতকগুলি দেখিবে, তাহা রক্ত-বর্ণ নহে,—বর্ণহীন, রক্তচক্রাণু হইতে কিঞ্চিৎ বড়, প্রকৃত চক্রাকার নহে—আকারের কোন নিয়ম নাই। শরীরাভ্যন্তরে, যে তাপ, পরী-ক্ষ্যমাণ রক্তবিন্দু যদি সেই রূপ তাপ সংযুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, এই বর্ণহীন চক্রাণু সকল সজীব পদার্থের ন্যায় আচরণ করিবে। আপনারা যথেচ্ছা চলিয়া বেড়াইবে, আকার পরিবর্ত্তন করিবে, কখন কোন অঙ্গ বাড়াইয়া দিবে, কখন কোন ভাগ সঙ্কীর্ণ করিয়া লইবে। এইগুলি যে পদার্থের

সমষ্টি, তাহাকে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা প্রোটোপ্লাস্ম্ বা বিজ প্লাস্ম্ বলেন। আমরা ইহাকে "জৈবনিক" বলিলাম। ইহাই জীব শরীর নির্ম্মাণের একমাত্র সামগ্রী। যাহাতে ইহা আছে তাহাই জীব, যাহাতে ইহা নাই তাহা জীব নহে। দেখা যাউক, এই সামগ্রীটি কি।

এক্ষণকার বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা অনেকেই দেখিয়াছেন, আচার্য্যেরা বৈদ্যুতীয় যন্ত্র সাহায্যে জল, উড়াইয়া দেন। বাস্তবিক জল উড়িয়া যায় না; জল অন্তর্হিত হয় বটে, কিন্তু তাহার স্থানে দুইটী বায়বীয় পদার্থ পাওয়া যায়—পরীক্ষক সেই দুইটী পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে ধরিয়া রাখেন। সেই দুইটি পুনর্ব্বার একত্রিত করিয়া আগুনদিলে আবার জল হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে এই দুইটি পদা-

র্থের রাসায়নিক সংযোগে জলের জন্ম। ইহার একটির নাম অম্লজান বায়ু; দ্বিতীয়টির নাম জলজান বায়ু।

যে বায়ু পৃথিবী ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ইহাতেও অম্লজান আছে। অম্লজান ভিন্ন আর একটি বায়বীয় পদার্থও তাহাতে আছে। সেটি যবক্ষারেও আছে, বলিয়া তাহার নাম যবক্ষারজান হইয়াছে। অম্লজান ও যবক্ষারজান সাধারণ বায়ুতে রাসায়নিক সংযোগে যুক্ত নহে। মিশ্রিত মাত্র। যাঁহারা রসায়নবিদ্যা প্রথম শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা শুনিয়া চমৎকৃত হয়েন যে হীরক ও অঙ্গার একই বস্তু। বাস্তবিক এ কথা সত্য, এবং পরীক্ষাধীন। যে দ্রব্য উভয়েরই সার, তাহার নাম হইয়াছে অঙ্গারজান। কাষ্ঠ তৃণ তৈলাদি যাহা দাহ করা যায়, তাহার দাহ্যভাগ এই অঙ্গার-

জান। অঙ্গারজানের সহিত অম্লজানের রাসায়নিক যোগ ক্রিয়াকে দাহ বলে। এই চারিটি পদার্থ সর্ব্বদা পরস্পরে রাসায়নিক যোগে সংযুক্ত হয়। যথা, অম্লজানে জলজানে জল হয়। অম্লজানে যবক্ষারজানে নাইট্রিক আসিড নামক প্রসিদ্ধ ঔষধ হয়। অম্লজানে, অঙ্গারজানে আঙ্গারিক অম্ল (কার্ব্বণিক আসিড) হয়। যে বাষ্পের কারণ সোডা ওয়াটার উছলিয়া উঠে, সে এই পদার্থ। দীপশিখা হইতে এবং মনুষ্য নিশ্বাসে ইহা বাহির হইয়া থাকে। যবক্ষারজান এবং জলজানে আমনিয়া নামক প্রসিদ্ধ তেজস্বী ঔষধ হইয়া থাকে। অঙ্গারজান এবং জলজানে তারপিন তৈল প্রভৃতি অনেকগুলি তৈলবৎ এবং অন্যান্য সামগ্রী হয়। ইত্যাদি।

এই চারিটি সামগ্রী যেমন পরস্পরের সহিত রাসায়নিক যোগে যুক্ত হয়, সেইরূপ

অন্যান্য সামগ্রীর সহিত যুক্ত হয় এবং সেই সংযোগেই এই পৃথিবী নির্ম্মিত। যথা সডিয়মের সঙ্গে ও ক্লোরাইনের সঙ্গে অম্লজানের সংযোগ বিশেষে লবণ; চূণের সঙ্গে অম্লজান ও অঙ্গারজানের সংযোগ বিশেষে মর্ম্মরাদি নানাবিধ প্রস্তর হয়; সিলিকন এবং আলুমিনার সঙ্গে অম্লজানের সংযোগে নানাবিধ মৃত্তিকা।

ছুইটি সামগ্রীর রাসায়নিক সংযোগে যে এক ফল হয় এমত নহে। নানা মাত্রায় নানা দ্রব্যের সংযোগে নানা দ্রব্য হইয়া থাকে।

জলজান, অম্লজান, অঙ্গারজান, এবং যবক্ষারজান, এই চারিটিই একত্রে সংযুক্ত হইয়া থাকে। সেই সংযোগের ফল জৈবনিক। জৈবনিকে এই চারিটি সামগ্রীই থাকে, আর কিছুই থাকে না এমত নহে; অম্লজানাদির সঙ্গে

কখন২ গন্ধক, কখন পোতাস ইত্যাদি সামগ্রী থাকে। কিন্তু যে পদার্থে এই চারিটীই নাই, তাহা জৈবনিক নহে; যাহাতে এই চারিটীই আছে তাহাই, জৈবনিক। জীবমাত্রেই এই জৈবনিকে গঠিত; জীব ভিন্ন আর কিছুতেই জৈবনিক নাই। এই স্থলে জীব শব্দে কেবল প্রাণী বুঝাইতেছে এমত নহে। উদ্ভিদ্ও জীব, কেন না তাহাদিগেরও জন্ম, বৃদ্ধি, পুষ্টি ও মৃত্যু আছে। অতএব উদ্ভিদের শরীরও জৈবনিকে নির্ম্মিত। কিন্তু সচেতন ও অচেতন জীবে এ বিষয়ে একটু বিশেষ প্রভেদ আছে।

জৈবনিক জীবশরীরমধ্যেই পাওয়া যায়, অন্যত্র পাওয়া যায় না। জীবশরীরে কোথা হইতে জৈবনিক আইসে? জৈবনিক জীবশরীরে প্রস্তুত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্ জীব, ভূমি এবং বায়ু হইতে অম্লজানাদি গ্রহণ করিয়া আ-

পন শরীর মধ্যে তৎসমুদায়ের রাসায়নিক সং-
যোগ সম্পাদন করিয়া জৈবনিক প্রস্তুত করে;
সেই জৈবনিকে আপন শরীর নির্ম্মাণ করে।
কিন্তু নির্জ্জীব পদার্থ হইতে জৈবনিক পদার্থ
প্রস্তুত করার যে শক্তি, তাহা উদ্ভিদেরই
আছে। সচেতন জীবের এই শক্তি নাই;
ইহারা স্বয়ং জৈবনিক প্রস্তুত করিতে পারে
না; উদ্ভিদ্‌কে ভোজন করিয়া প্রস্তুত জৈব-
নিক সংগ্রহ পূর্ব্বক শরীর পোষণ করে।
কোন সচেতন জীব মৃত্তিকা খাইয়া প্রাণ ধারণ
করিতে পারে না, কিন্তু তৃণ ধান্য প্রভৃতি সেই
মৃত্তিকার রস পান করিয়া জীবন ধারণ করি-
তেছে, কেন না উহারা তাহা হইতে জৈবনিক
প্রস্তুত করে; বৃষ মৃত্তিকা খাইবে না, কিন্তু
সেই তৃণ ধান্যাদি খাইয়া তাহা হইতে জৈব-
নিক গ্রহণ করিবে, ব্যাঘ্র আবার সেই বৃষকে

খাইয়া জৈবনিক সংগ্রহ করিবে। যাঁহারা এদেশের জমীদারগণের দ্বেষক, তাঁহারা বলিতে পারেন, যে উদ্ভিদ্ জীবেরা এ জগতে চাসা, তাহারা উৎপাদন করে; অপরেরা জমীদার, তাহারা চাসার উপার্জ্জন কাড়িয়া খায়, আপনারা কিছু করে না।

এখন দেখ, এক জৈবনিকে সর্ব্বজীব নির্ম্মিত। যে ধান ছড়াইয়া তুমি পাখীকে খাওয়াইতেছ, সে ধান যে সামগ্রী, পাখীও সেই সামগ্রী, তুমিও সেই সামগ্রী। যে কুসুম, ঘ্রাণ মাত্র লইয়া, লোকমোহিনী সুন্দরী ফেলিয়া দিতেছেন, সুন্দরীও যাহা, কুসুমও তাই। কীটও যাহা, সম্রাট্ও তাই। যে হংসপুচ্ছ লেখনীতে আমি লিখিতেছি সেও যাহা আমিও তাই। সকলই জৈবনিক। প্রভেদও গুরুতর। জয়পুরী শ্বেত প্রস্তরে তোমার

জলপান পাত্র বা ভোজন পাত্র নির্ম্মিত হই-
য়াছে; সেই প্রস্তরে তাজমহল এবং জমা
মসজিদও নির্ম্মিত হইয়াছে। উভয়ে প্রভেদ
নাই কে বলিবে? গোষ্পদেও জল, সমুদ্রেও
জল, গোষ্পদে সমুদ্রে প্রভেদ নাই কে ব-
লিবে?

কিন্তু স্থূল কথা বলিতে বাঁকি আছে।
জৈবনিক ভিন্ন জীবন নাই, যেখানে জীবন
সেইখানে জৈবনিক তাহার পূর্ব্বগামী। "অ-
ন্যথা সিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্ব্ববর্ত্তিতা কার-
ণত্বং" এ কথা যদি সত্য হয়, তবে জৈবনিকই
জীবনের কারণ। জৈবনিক ভিন্ন জীবন কু-
ত্রাপি সিদ্ধ নহে, এবং জৈবনিক জীবনের
নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী বটে। অতএব আমাদের
এই চঞ্চল, সুখদুঃখবহুল, বহু স্নেহাস্পদ
জীবন, কেবল জৈবনিকের ক্রিয়া, রাসায়নিক

সংযোগসমবেত জড় পদার্থের ফল। নিউটনের বিজ্ঞান, কালিদাসের কবিতা, হম্বোল্‌ট্‌ বা শঙ্করাচার্য্যের পাণ্ডিত্য—সকলই জড় পদার্থের ক্রিয়া; শাক্যসিংহের ধর্ম্মজ্ঞান, আকবরের শৌর্য্য, কোমতের দর্শনবিদ্যা সকলই জড়ের গতি। তোমার বনিতার প্রেম, বালকের অমৃত ভাষা, পিতার সদুপদেশ—সকলই জড়পদার্থের আকুঞ্চন সম্প্রসারণ মাত্র—জৈবনিক ভিন্ন ভিতরে আর ঐন্দ্রজালিক কেহ নাই। যে যশের জন্য তুমি প্রাণিপাত করিতেছ, সে এই জৈবনিকের ক্রিয়া—যেমন সমুদ্রগর্জ্জন এক প্রকার জড়পদার্থকৃত কোলাহল, যশ তেমনি জড়পদার্থকৃত অন্য প্রকার কোলাহল মাত্র। এই সর্ব্বকর্ত্তা জৈবনিক অম্লজান, জলজান, অঙ্গারজান এবং যবক্ষারজানের রাসায়নিক সমষ্টি। অতএব এই চা-

রিটি ভৌতিক পদার্থই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সর্ব্ব কর্ত্তা। ইহারা প্রকৃত ভূত, এবং এই ভূতের কাণ্ড সকল আশ্চর্য্য বটে। পাঠক দেখিবেন, যে আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত পঞ্চভূত হইতে এই আধুনিক ভূতগণের যে প্রভেদ তাহা কেবল প্রমাণগত। নচেৎ উভয়েরই ফল প্রকৃতিবাদ (Materialism) সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ হইতে আধুনিক প্রকৃতিবাদের প্রভেদ, প্রধানতঃ প্রমাণগত। তবে আধুনিক বলেন, ক্ষিত্যাদি ভূত নহে, আমাদিগের পরিচিত এই ভূত গুলিই ভূত। যেই ভূত হউক তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই,—কেন না মনুষ্যজাতি ভূত ছাড়া হইল না। যুবেনল্ হইতে কার্লাইল পর্য্যন্ত অনেকে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন—গালি দিয়াও মনুষ্যজাতির ভূত ছাড়াইতে পারেন নাই।

পরিমাণরহস্য

আমাদিগের সকল ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা চক্ষুর উপর বিশ্বাস অধিক। কিছুতে যাহা বিশ্বাস না করি, চক্ষে দেখিলেই তাহাতে বিশ্বাস হয়। অথচ চক্ষের ন্যায় প্রবঞ্চক কেহ নহে। যে সূর্য্যের পরিমাণ লক্ষ২ যোজনে হয় না, তাহাকে একখানি স্বর্ণথালির মত দেখি। প্রকাণ্ড বিশ্বকে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখি। যে চন্দ্রের দূরতা সূর্য্যের দূরতার চারি শত ভাগের এক ভাগও নহে, তাহা সূর্য্যের সমদূরবর্ত্তী দেখায়। যে পরমাণুতে এই জগৎ নির্ম্মিত তাহার একটিও দেখিতে পাই না। আনুবীক্ষণিক জীব জৈবনিকাদি কিছুই দেখিতে পাই না। এই অবিশ্বাস যোগ্য চক্ষুকেই আমাদের বিশ্বাস।

দর্শনেন্দ্রিয়ের এইরূপ শক্তিহীনতার গতিকে আমরা জগতের পরিমাণবৈচিত্র্য কিছুই বুঝিতে পারি না। জ্যোতিষ্কাদি অতি বৃহৎ পদার্থকে ক্ষুদ্র দেখি, এবং অতি ক্ষুদ্র পদার্থ সকলকে একেবারে দেখিতে পাই না। ভাগ্যক্রমে, মন বাহ্যেন্দ্রিয়াপেক্ষা দূরদর্শী; অদর্শনীয়ও বিজ্ঞান দ্বারা মিত হইয়াছে। সে পরিমাণ অতি বিস্ময়কর। দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

সকলে জানেন যে পৃথিবীর ব্যাস ৭০-৯১ মাইল। যদি পৃথিবীকে এক মাইল দীর্ঘ এক মাইল প্রস্থ, এমত খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা যায়, তাহাহইলে উনিশ কোটি ছয়ষট্টি লক্ষ, ছাব্বিশ হাজার এইরূপ বর্গ মাইল পাওয়া যায়। এক মাইল দীর্ঘ, এক মাইল প্রস্থে, এবং এক মাইল উর্দ্ধে এরূপ ২৫৯,৮০০,০০০,০০০ ঘন

মাইল পাওয়া যায়। ওজনে পৃথিবী যত টন হইয়াছে, তাহা নিম্নে অঙ্কের দ্বারা লিখিলাম। ৬,০৬৯,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০। এক টন সাতাইশ মনের অধিক।*

এই আকার কি ভয়ানক, তাহা মনে কল্পনা করা যায় না। সমগ্র হিমালয় পর্ব্বত ইহার নিকট বালুকাকণার অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। কিন্তু এই প্রকাণ্ড পৃথিবী সূর্য্যের আকারের সহিত তুলনায়, বালুকা মাত্র। চন্দ্র একটি প্রকাণ্ড উপগ্রহ, উহা পৃথিবী হইতে ২৪০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। সূর্য্য এ প্রকার প্রকাণ্ড পদার্থ, যে তাহা অন্তঃশূন্য করিয়া পৃথিবীকে চন্দ্রসমেত তাহার মধ্যস্থলে স্থাপিত করিলে, চন্দ্র এখন যেরূপ দূরে থাকিয়া পৃথিবীর পার্শ্বে বর্ত্তন করে, সূর্য্যগর্ব্ভেও সেইরূপ করিতে

* আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত দেখ।

পারে, এবং চন্দ্রের বর্ত্তনপথ ছাড়াও এক লক্ষ ষাট হাজার মাইল বেশী থাকে।

সূর্য্যের দূরতা কত মাইল, তাহা বালকেও জানে, কিন্তু সেই দূরতা অনুভূত করিবার জন্য, নিম্ন লিখিত গণনা উদ্ধৃত করিলাম।

"অস্মদাদির দেশে রেইলওয়ে ট্রেণ ঘণ্টায় ২০ মাইল যায়। যদি পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত রেইলওয়ে হইত তবে কত কালে সূর্য্যলোকে যাইতে পারিতাম? উত্তর—যদি দিন রাত্রি, ট্রেণ অবিরত ঘণ্টায় বিশ মাইল চলে, তবে ৫২০ বৎসর ৬ মাস ১৬ দিনে সূর্য্যলোকে পৌঁছান যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ট্রেণে চড়িবে, তাহার সপ্তদশ পুরুষ ঐ ট্রেণেই গত হইবে।"(১)

আর বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি গ্রহ সকলের

(১) আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত দেখ।

দূরতার সহিত তুলনায় এ দূরতাও সামান্য। বুর্বীর গণনা করিয়া বলিয়াছেন, যে রেইল যদি ঘণ্টায় ৩৩ মাইল চলে, তবে সূর্য্যলোক হইতে কেহ রেইলে যাত্রা করিলে, দিন রাত্র চলিয়া বৃহস্পতি গ্রহে ১৭১২ বৎসরে শনি গ্রহে ৩১১৩ বৎসরে, উরেনসে ৬২২৬ বৎসরে, নেপ্‌চ্যূনে ৯৬৮৫ বৎসরে পৌঁছিবে।

আবার এ দূরতা নক্ষত্র সূর্য্যগণের দূরতার তুলনায় কেশের পরিমাণ মাত্র। সকল নক্ষত্রের অপেক্ষা আল্‌ফা সেণ্টরাই আমাদিগের নিকটবর্ত্তী; তাহার দূরতা ৬১ সিগনাই নামক নক্ষত্রের পাঁচ ভাগের চারি ভাগ। এই দ্বিতীয় নক্ষত্রের দূরতা ৬৩,৬৫০,০০০,০০০,০০০ মাইল। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৯২,০০০ মাইল। সেই আলোক ঐ নক্ষত্র হইতে আসিতে দশ বৎসরের অধিক কাল

লাগে। বেগা নামক নক্ষত্রের দূরতা ১৩০,০০০ ০০০,০০০,০০০ মাইল; আলোক সেখান হইতে ২১ বৎসরে পৃথিবীতে পৌঁছে। ২১ বৎসর পূর্ব্বে ঐ নক্ষত্রের যে অবস্থা ছিল তাহা আমরা দেখিতেছি—উহার অদ্যকার অবস্থা আমাদিগের জানিবার সাধ্য নাই।

আবার নীহারিকাগণের দূরতার সঙ্গে তুলনায়, এ সকল নক্ষত্রের দূরতা সূত্র পরিমিত বোধ হয়। বীনা (Lyra) নামক নক্ষত্র সমষ্টির বিটা ও গামা নক্ষত্রের মধ্যবর্ত্তী অঙ্গুরীয়বৎ নীহারিকার দূরতা, সর্ উইলিয়ম হর্শেলের গণনানুসারে সিরিয়সের দূরতার ৯৫০ গুণ। ঐ বিটা নক্ষত্রের দক্ষিণ পূর্ব্বস্থিত গোলাকৃত নীহারিকা, ঐ মহাত্মার গণনানুসারে সৌরজগৎ হইতে ১,৩০০,০০০,০০০, ০০০,০০০ মাইল। ত্রিকোণ নামক নক্ষত্র

সমষ্টিস্থিত এক নীহারিকা, সিরিয়সের দূরতার ৩৪৪ গুণ দূরে অবস্থিত; এবং স্থবৈস্কির ঢাল নামক নক্ষত্র সমষ্টিতে ঘোড়ার লালের আকার যে, এক নীহারিকা আছে, তাহার দূরতা উক্ত ভীষণ মানদণ্ডের নয়শত গুণ অর্থাৎ ৫০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইলের কিছু ন্যূন।

পাদরি ডাক্তার স্কোরেসবি বলেন যে যদি আমাদিগের সূর্য্যকে এত দূরে লইয়া যাওয়া যায়, যে তথা হইতে পঁচিশ হাজার বৎসরে উহার আলোক আমাদিগের চক্ষে আসিবে, উহা তথাপি লর্ড রসের বৃহৎ দূরবীক্ষণে দৃশ্য হইতে পারে। যদি তাহা সত্য হয় তবে, যে সকল নীহারিকা হইতে সহস্র সহস্র প্রচণ্ড সূর্য্যের রশ্মি একত্রিত হইয়া আসিলেও, নীহারিকাকে ঐ দূরবীক্ষণে ধূমরেখা মাত্রবৎ দেখা

যায়, না জানি যে কত কোটি বৎসরে আলোক তথা হইতে আসিয়া আমাদিগের নয়নে লাগে। অথচ আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৯২০০০ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর পরিধির অষ্টগুণ, যায়।

পল্টন সাহেব জানিয়াছেন, যে রৌদ্রের আলোক, মডরেটর দীপের অপেক্ষা ৪৪৪ গুণ তীব্র। যদি কোন সামগ্রীর দুই ইঞ্চি দূরে ১৬০টা মমবাতী রাখা যায়, তবে তাহাতে যে আলো পড়ে সে রৌদ্রের মত উজ্জ্বল হয়। গণিত হইয়াছে যে, যদি সূর্য্য রশ্মিবিশিষ্ট পদার্থ না হইত, তবে তাহাকে মমবাতীর সাতকোটী বিশলক্ষ স্তরে আবৃত করিলে, অর্থাৎ নয় মাইল উচ্চ করিয়া বাতীতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ মুড়িয়া, সকল বাতী জ্বালিয়া দিলে রৌদ্রের ন্যায় আলো পৃথিবীতে পাওয়া যাইত। কি ভয়ঙ্কর তাপাধার! সিনসিনেটির ডাক্তার ভন

স্থির করিয়াছেন, যে এক ফুট দূরে ১৪০০০ বাতী রাখিলে যে তাপ পাওয়া যায় রৌদ্রের সেই তাপ। আর সূর্য্য আমাদিগের নিকট হইতে যত দূর আছে, ততদূরে থাকিলে ৩৫০০, ০০০০০০,০০০০০০,১০০০০০,০০০০০০ সংখ্যক বাতী এক কালীন না পোড়াইলে রৌদ্রের ন্যায় তাপ হয় না। এ কথার অর্থ এই হইতেছে যে, প্রত্যহ পৃথিবীর ন্যায় বৃহৎ দুইশত বাতীর গোলক পোড়াইলে যে তাপ সম্ভূত হয়, সূর্য্যদেব একদিনে তত তাপ খরচ করেন। তাঁহার তাপ যেরূপ খরচ হয়, সেইরূপ নিত্য২ উৎপন্ন হইয়া জমা হইয়া থাকে। তাহা না হইলে এই মহাতাপক্ষয়ে সূর্য্যও অল্পকালে অবশ্য তাপশূন্য হইতেন। কথিত হইয়াছে যে সূর্য্য দাহ্যমান পদার্থ হইলে এই তাপ ব্যয় করিতে দশ বৎসরে অপনি দগ্ধ হইয়া যাইতেন।

মসূরপূইলা গণনা করিয়াছেন, যে সতের মাইল উচ্চ কয়লার খনি পোড়াইলে যে তাপ জন্মে, এক বৎসরে সূর্য্য তত তাপ ব্যয় করেন। যদি সূর্য্যের তাপবাহিতা জলের ন্যায় হয়, তবে বৎসরে ২.৬ ডিগ্রী সূর্য্যের তাপ কমিবে। কুঞ্চন ক্রিয়াতে তাপ সৃষ্টি হয়। সূর্য্যের ব্যাস তাহার দশ সহস্রাংশের একাংশ কমিলেই, দুই সহস্র বৎসরে ব্যয়িত তাপ সূর্য্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে।

সূর্য্যের তাপশালিতার যে ভয়ানক পরিমাণ লিখিত হইল, স্থিরনক্ষত্রমধ্যে অনেকগুলিন তদপেক্ষা তাপশালী বোধ হয়। সে সকলের তাপ পরিমিত হইবার উপায় নাই, কেননা তাহার রৌদ্র পৃথিবীতে আসে না, কিন্তু তাহার আলোক পরিমিত হইতে পারে। কোন কোন নক্ষত্রের প্রভাশালিতা পরিমিত

হইয়াছে। আলফা সেণ্টরাই নামক নক্ষত্রের প্রভাশালিতা সূর্য্যের ২.৩২ গুণ। বেগা নক্ষত্র ষোড়শ সূর্য্যের প্রভাবিশিষ্ট এবং নক্ষত্ররাজ সিরিয়স দুই শত পঞ্চবিংশতি সূর্য্যের প্রভাবিশিষ্ট। এই নক্ষত্র আমাদিগের সৌরজগতের মধ্যবর্ত্তী হইলে পৃথিব্যাদি গ্রহ সকল অল্পকালমধ্যে বাষ্প হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইত।

এই সকল নক্ষত্রের সংখ্যা অতি ভয়ানক। সর উইলিয়ম হর্শেল গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে কেবল ছায়াপথে ১৮,০০০,০০০ নক্ষত্র আছে। স্ত্রুব বলেন আকাশে দুই-কোটি নক্ষত্র আছে। মসূর শাকর্ণাক বলেন, নক্ষত্র সংখ্যা সাত কোটি সত্তর লক্ষ। এ সকল সংখ্যার মধ্যে নীহারিকাভ্যন্তরবর্ত্তী নক্ষত্র সকল গণিত হয় নাই। যেমন সমুদ্র-

তীরে বালুকা, নীহারিকা সেইরূপ নক্ষত্র। এখানে অঙ্ক হারি মানে।

যদি অতি প্রকাণ্ড জগৎসকলের সংখ্যা এইরূপ অননুমেয়, তবে ক্ষুদ্র পদার্থের কথা কি বলিব? ইহ্রেণবর্গ বলেন যে এক ঘন ইঞ্চি বিলিন্ শ্লেট প্রস্তরে চল্লিশহাজার Gallionella নামক আনুবীক্ষণিক শম্বুক আছে —তবে এই প্রস্তরের একটি পর্ব্বতশ্রেণীতে কত আছে কে মনে ধারণা করিতে পারে? ডাক্তার টমাস টম্‌সন্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে সীসা, এক ঘন ইঞ্চির ৮৮৮,৪৯-২০০,০০,০০,০০০ ভাগের একভাগ পরিমিত হইয়া বিভক্ত হইতে পারে। উহাই সীসার পরমাণুর পরিমাণ। তিনিই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে গন্ধকের পরমাণু ওজনে এক গ্রেনের ২০০,০০,০০,০০০ ভাগের এক ভাগ।

(সমুদ্রের গভীরতার পরিমাণ।)

লোকের বিশ্বাস আছে, যে সমুদ্র কত গভীর, তাহার পরিমাণ নাই। অনেকের বিশ্বাস যে সমুদ্র "অতল।"

অনেক স্থানে সমুদ্রের গভীরতা পরিমিত হইয়াছে। আলেকজান্দ্র্যা নিবাসী প্রাচীন গণিত ব্যবসায়িগণ, অনুমান করিতেন, যে নিকটস্থ পর্ব্বত সকল যত উচ্চ, সমুদ্রও তত গভীর। ভূমধ্যস্থ (Mediteranean) সমুদ্রের অনেকস্থানে ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তথায় এ পর্য্যন্ত ১৫,০০০ ফিটের অধিক জল পরিমিত হয় নাই—আলপ্স পর্ব্বত শ্রেণীর উচ্চতাও ঐরূপ।

মিশর ও সাইপ্রস দ্বীপের মধ্যে ছয়সহস্র ফিট, আলেকজান্দ্র্যা ও রোড্‌শের মধ্যে নয় সহস্র নয় শত, এবং মাল্‌টায় পূর্ব্বে ১৫,০০০

ফিট জল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তদপেক্ষা অন্যান্য সমুদ্রে অধিকতর গভীরতা পাওয়া গিয়াছে। হম্বোলটের কস্মস্ গ্রন্থে লিখিত আছে, যে এক স্থানে ২৬,০০০ ফিট রশী নামাইয়া দিয়াও তল পাওয়া যায় নাই—ইহা চারি মাইলের অধিক। ডাক্তার স্কোরেস্‌বি লিখেন যে সাত মাইল রশী ছাড়িয়া দিয়াও তল পাওয়া যায় নাই। পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চতম পর্ব্বত শৃঙ্গ পাঁচ মাইল মাত্র উচ্চ।

কিন্তু গড়ে, সমুদ্র কত গভীর, তাহা না মাপিয়াও গণিতবলে জানা যাইতে পারে। জলোচ্ছ্বাসের কারণ সমুদ্রের জলের উপর সূর্য্য চন্দ্রের আকর্ষণ। অতএব জলোচ্ছ্বাসের পরিমাণের হেতু, (১) সূর্য্য চন্দ্রের গুরুত্ব,(২) তদীয় দূরতা,(৩) তদীয় সম্বর্ত্তন কাল,(৪) সমুদ্রের গভীরতা। প্রথম, দ্বিতীয়, এবং তৃতীয় তত্ত্ব আমরা জ্ঞাত আছি; চতুর্থ আমরা জা-

নিনা, কিন্তু চারিটির সমবায়ের ফল, অর্থাৎ জলোচ্ছ্বাসের পরিমাণ, আমরা জ্ঞাত আছি। এতএব অজ্ঞাত চতুর্থ সমবায়ী কারণ অনায়াসেই গণনা করা যাইতে পারে। আচার্য্য হটন এই প্রকারে গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে সমূদ্র, গড়ে, ৫.১২ মাইল, অর্থাৎ পাঁচ মাইলের কিছু অধিক মাত্র গভীর। লপ্লাস ব্রেষ্ট নগরে জলোচ্ছ্বাস পর্য্যবেক্ষণের বলে যে "Ratio of Semidiurnal Co-efficents" স্থির করিয়া ছিলেন, তাহা হইতেও এই রূপ উপলব্ধি করা যায়।

(শব্দ)

সচরাচর শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১০৩৮ ফিট গিয়া থাকে বটে, কিন্তু বের্থেম ও ব্রেগেট নামক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বৈদ্যুতিক তারে প্রতি সেকেণ্ডে, ১১, ৪৫৬ সেকেণ্ড বেগে

শব্দ প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতএব তারে, কেবল পত্র প্রেরণ হয় এমত নহে; বৈজ্ঞানিক শিল্প আরও কিছু উন্নতিপ্রাপ্ত হইলে মনুষ্য তারে কথোপকথন করিতে পারিবে।

মনুষ্যের কণ্ঠস্বর কত দূর যায়? বলা যায় না। কোন কোন যুবতীর ব্রীড়ারুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিবার সময়ে, বিরক্তি ক্রমে ইচ্ছা করে, যে নাকের চসমা খুলিয়া কাণে পরি, কোন কোন প্রাচীনার চীৎকারে বোধ হয়, গ্রামান্তরে পলাইলেও নিষ্কৃতি নাই। বিজ্ঞানবিদেরা এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দেখা যাউক।

প্রাচীনমতে আকাশ শব্দবহ; আধুনিক মতে বায়ু শব্দবহ। বায়ুর তরঙ্গে শব্দের সৃষ্টি ও বহন হয়। অতএব যেখানে বায়ু তরল ও ক্ষীণ, সেখানে শব্দের অস্পষ্টতা

সম্ভব। ব্রাঙ্ শৃঙ্গোপরি শব্দ অস্পষ্টশ্রাব্য বলিয়া শস্যোর বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন তথায় পিস্তল ছুড়িলে পটকার মত শব্দ হয়; এবং শ্যাম্পেন খুলিলে কাকের শব্দ প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু মার্শ্যাস বলেন যে তিনি সেই শৃঙ্গোপরেই ১৩৪০ ফিট হইতে মনুষ্যকণ্ঠ শুনিয়াছিলেন। এ বিষয় "গগনপর্য্যটন" প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ লেখা হইয়াছে।

যদি শব্দবহ বায়ুকে চোঙ্গার ভিতর রুদ্ধ-করা যায়, তবে মনুষ্য কণ্ঠ যে অনেক দূর হইতে শুনা যাইবে, ইহা বিচিত্র নহে। কেন না শব্দতরঙ্গ সকল ছড়াইয়া পড়িবে না। বিও নামক বিজ্ঞানবিৎ, পারিসের লৌহ-নির্ম্মিত জলপ্রণালী মুখে কর্ণ রাখিয়া ৩১২০ ফিট হইতে ফ্লুটের গীত শুনিতে পাইয়া-

ছিলেন। ফ্রুট কি, অতি মৃদু কাণে কাণে কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। যদি কেহ আপনার ঘরে খাটে শুইয়া, গৃহান্তরে বন্ধু প্রতিবাসীর সঙ্গে কথোপকথন করিতে চাহেন, তবে দুই গৃহের মধ্যে চোঙ্গা নির্ম্মাণ করিলেই তাহা পারেন।

স্থির জল, চোঙ্গার কাজ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চতায় বায়ু প্রতিহত হইতে পায় না—এজন্য শব্দতরঙ্গ সকল, ভগ্ন হইয়া নানা দিক্ দিগন্তরে বিকীর্ণ হয় না। এই জন্য প্রশস্ত নদীর এ পার হইতে ডাকিলে ও পারে শুনিতে পায়। বিখ্যাত হিমকেন্দ্রানুসারী পর্য্যটক পারির সমভিব্যাহারী লেপ্টেনাণ্ট ফষ্টর লিখেন, যে তিনি পোর্ট বৌয়েনের এ পার হইতে পরপারে স্থিত মনুষ্যের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন।

উভয়ের মধ্যে ১।০ মাইল ব্যবধান। ইহা আশ্চর্য্য বটে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার ডাক্তার ইয়ং কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। তিনি বলেন, যে জিব্রল্টরে দশ মাইল হইতে মনুষ্য কণ্ঠ শুনা গিয়াছে। কথা বিশ্বাসযোগ্য কি?

(জ্যোতিস্তরঙ্গ)

প্রবন্ধান্তরে কথিত হইয়াছে, যে আলোক ইথর নামপ্রাপ্ত বিশ্বব্যাপী জাগতিক তরল পদার্থের আন্দোলনের ফল মাত্র। সূর্য্যালোক, সপ্তবর্ণের সমবায়; সেই সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনু অথবা স্ফাটিক প্রেরিত আলোকে লক্ষিত হয়। প্রত্যেক বর্ণের তরঙ্গ সকল পৃথক্ পৃথক্; তাহাদিগের প্রাকৃতিক সমবায়ের ফলে, শ্বেত রৌদ্র। এই সকল

জ্যোতিস্তরঙ্গ বৈচিত্র্যই জগতের বর্ণবৈচিত্রের কারণ। কোন কোন পদার্থ, কোন কোন বর্ণের তরঙ্গ সকল রুদ্ধ করিয়া, অবশিষ্টগুলি প্রতি-হত করে। আমরা সে সকল দ্রব্যকে প্রতি-হত তরঙ্গের বর্ণ বিশিষ্ট দেখি।

তবে তরঙ্গেরই বা বর্ণবৈষম্য কেন? কোন তরঙ্গ রক্ত, কোন তরঙ্গ পীত, কোন তরঙ্গ নীল কেন? ইহা কেবল তরঙ্গের বে-গের তারতম্য। প্রতি ইঞ্চি স্থান মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার তরঙ্গের উৎপত্তি হইলে, তরঙ্গ রক্তবর্ণ, অন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় তরঙ্গ পীতবর্ণ, ইত্যাদি।

যে জ্যোতিস্তরঙ্গ এক ইঞ্চি মধ্যে ৩৭, ৬৪০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়; এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৪৫,৮০,০০,০০,০০,০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা রক্তবর্ণ। পীত তরঙ্গ, এক ইঞ্চিতে

৪৪০০০, বার, এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৫৩,৫-
-,০০,০০,০০,০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়।
এবং নীল তরঙ্গ প্রতি ইঞ্চিতে ৫১,১১০ বার
এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৬২,২০,০০,০০,০০,০০,০০০
বার প্রক্ষিপ্ত হয়। পরিমাণের রহস্য ইহা
অপেক্ষা আর কি বলিব? এমন অনেক নক্ষত্র
আছে, যে তাহার আলোক পৃথিবীতে পঞ্চাশ
বৎসরেও পৌঁছে না। সেই নক্ষত্র হইতে
যে আলোক রেখা আমাদের নয়নে আসিয়া
লাগে, তাহার তরঙ্গ সকল, কতবার প্রক্ষিপ্ত
হইয়াছে? এবার যখন, রাত্রে আকাশ প্রতি
চাহিবে, তখন এই কথাটি একবার মনে
করিও।

(সমুদ্র তরঙ্গ)

এই অচিন্ত্য বেগবান্ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম,
জ্যোতিস্তরঙ্গের আলোচনার পর, পার্থিব জ-

লের তরঙ্গমালার আলোচনা অবিধেয় নহে। জ্যোতিস্তরঙ্গের বেগের পরে, সমুদ্রের ঢেউকে অচল মনে করিলেও হয়। তথাপি সাগরতরঙ্গের বেগ মন্দ নহে। ফিণ্ড্লে সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে অতি বৃহৎ সাগরোর্ম্মি সকল ঘণ্টায় ২০ মাইল হইতে ২৭॥ মাইল পর্য্যন্ত বেগে ধাবিত হয়। স্কোরেসবি সাহেব গণনা করিয়াছেন যে আটলান্টিক সাগরের তরঙ্গ ঘণ্টায় প্রায় ৩৩ মাইল চলে। এই বেগ ভারতবর্ষীয় বাষ্পীয় রথের বেগের অপেক্ষা ক্ষিপ্রতর।

যাঁহারা বাঙ্গালার নদীবর্গে নৌকারোহণ করিতে ভীত, সাগরোর্ম্মির পরিমাণ সম্বন্ধে তাঁহাদের কিরূপ অনুমান, তাহা বলিতে পারি না। উপকথায় "তালগাছ প্রমাণ ঢেউ" শুনা যায়—কিন্তু কেহ তাহা বিশ্বাস করে না। সমুদ্রে তদপেক্ষা উচ্চতর ঢেউ উঠিয়া থাকে।

ফিণ্ড্‌লে সাহেব লিখেন ১৮৪৩ অব্দে কর্ম্বা-লের নিকট ৩০০ ফিট অর্থাৎ ২০০ হাত উচ্চ ঢেউ উঠিয়াছিল। ১৮২০ সালে নরওয়ে প্রদেশের নিকট ৪০০ ফিট পরিমিত ঢেউ উঠিয়াছিল।

সমুদ্রের ঢেউ অনেক দূর চলে। উত্তমাশা অন্তরীপে উদ্ভূত মগ্ন তরঙ্গ তিন সহস্র মাইল দূরস্থ উপদ্বীপে প্রহত হইয়া থাকে। আচার্য্য বাচ বলেন, যে জাপান দ্বীপাবলীর অন্তর্গত সৈমোদা নামক স্থানে একদা ভূমিকম্প হয়। তাহাতে ঐস্থানসমীপস্থ "পোতাশ্রয়ে" এক বৃহৎ ঊর্ম্মি প্রবেশ করিয়া, সরিয়া আসিলে পোতাশ্রয় জলশূন্য হইয়া পড়ে। সেই ঢেউ প্রশান্ত মহাসাগরের পর পারে, সানফ্রন্‌সিস্কো নগরের উপকূলে প্রহত হয়। সৈমোদা হ-ইতে ঐ নগর ৪৮০০ মাইল তরঙ্গরাজ ১২

ঘণ্টা ১৬ মিনিটে পার হইয়াছিলেন অর্থাৎ মিনিটে ৬॥ মাইল চলিয়াছিলেন ।

সর উইলিয়ম টমসনকৃত জীবসৃষ্টির ব্যাখ্যা।

সকলেই দেখিয়াছেন যে, আকাশ হইতে নক্ষত্র খসিয়া পড়ে। অনেকেই জানেন যে, বাস্তবিক সে সকল নক্ষত্র নহে, নক্ষত্র কখন খসে না। ভূপতিত হইলে পর, দেখা গিয়াছে যে, উহা লৌহ বা প্রস্তর বা তদ্রূপ অন্য কোন পদার্থ। এইরূপ ধাতু বা অন্য দ্রব্যাত্মক অসংখ্য বস্তু আকাশপথে বিচরণ করিতেছে। উহাকে ইংরাজিতে মিটিয়র্ বলে। বাঙ্গালাভাষায় যে সকল নাম প্রচলিত আছে, তাহা ভ্রমাত্মক। কিন্তু উল্কাপিণ্ড নাম ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া তাহা আমরা গ্রহণ করিলাম। ইহা সিদ্ধ হইয়াছে যে, উল্কাপিণ্ড সকল, সূর্য্যাদির মাধ্যাকর্ষণী শক্তি বলে,

গ্রহগণের ন্যায় আকাশমণ্ডলে নিয়মিত বর্ত্মে পরিভ্রমণ করিতেছে। যখন কোন উল্কা-পিণ্ড পৃথিবীর আকর্ষণ পথে পড়ে, তখন তদ্বলে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রপাতকালে পৃথিবীর উপরিস্থ বায়ুস্তরে বেগে প্রহত হওয়ায়, বায়ু এবং উল্কাপিণ্ডের সংঘর্ষণে অগ্ন্যুৎপত্তি হয়। আলো সেই জন্য।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যে উল্কাপিণ্ড সকলকে ক্ষুদ্র২ গ্রহ বলিলেও বলা যায়। উল্কাপিণ্ডের দুইটি মণ্ডল বিশেষ লক্ষিত। ঐ দুই মণ্ডল পৃথিবীর পথপার হইয়াছে। এক মণ্ডলের উপর দিয়া ১০ই ১১ই আগষ্ট তারিখে, অর্থাৎ শ্রাবণের শেষভাগে, পৃথিবীকে চলিতে হয়। আর এক মণ্ডল লঙ্ঘন করিবার সময় ১২ই ১৩ই নবেম্বর অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের শেষ ভাগ। অন্য সময় অপেক্ষা ঐ২

সময়ে উল্কাপিণ্ডের অত্যন্ত আধিক্য দেখা যায়। এই দুই উল্কাপিণ্ডক মণ্ডলের আয়তন অর্থাৎ তদন্তবর্ত্তী উল্কাপিণ্ডের পথ, পণ্ডিতেরা গণনার দ্বারা স্থির করিয়াছেন। একটী ইউরেনস নামক অতি দূরবর্ত্তী গ্রহের পথ হইতেও বিস্তৃত। দ্বিতীয় উল্কাপিণ্ড সমষ্টির পথ আরও ভয়ানক। নেপ্‌চ্যুননামক সৌরজগদন্ত-স্থিত গ্রহের পথ হইতেও বহুদূর। ইহাও সামান্য কথা। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, যে অনেক উল্কাপিণ্ড অন্য সৌর-জগৎ হইতে আগত; অন্য সৌরজগতেও যাইতে পারে।

কেহ২ বলেন যে, এই সকল উল্কাপিণ্ড কোন জগতের বিপ্লবে চূর্ণিত গ্রহগণের ভগ্নাংশ। এ কথার কোন প্রমাণ নাই, এবং অনেকে এক্ষণে একথায় শ্রদ্ধা করেন না।

কিন্তু ভুবনবিখ্যাত বিলাতীয় ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের সভাপতি সর্ উইলিয়ম টম্‌সন তন্মতাবলম্বন করিয়া, এক কৌতুকাবহ তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন।

পৃথিবীতে চিরকাল জীব ছিল না, একথা ভূতত্ত্বের দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। বহুকোটি বৎসর পৃথিবী জীবশূন্য ছিল। পরে জীবের অধিষ্ঠান হইল কি প্রকারে? বহুকাল হইতে ইউরোপে এই তর্ক হইতেছে। দেখা যায় যে, জীব ভিন্ন জীবের জন্ম নাই। অনেকে বলিতেন, অণ্ডাদি ব্যতীতও জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সে সকল ভ্রম দূর হইয়াছে। যে সকল জীব পূর্ব্বে "স্বেদজ" অথবা "মলজ" অথবা "স্বতঃসৃষ্ট" বলিয়া স্থির ছিল, তাহাও অণ্ডজ বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। যদি জীব ভিন্ন

জীবোৎপত্তি নাই, তবে প্রথম জীব জন্মিল কি প্রকারে? পূর্ব্বে জীব ছিল না, পরে জীব আসিল কোথা হইতে?

এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকে বলেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছা।" এই কথা, সকলে উত্তর বলিয়া গ্রাহ্য করেন না। তাঁহারা বলেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছা মানি। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা নিয়মে পরিণত। নিয়ম ভিন্ন ঐশী ক্রিয়া কোথাও দেখা যায় না। জগদীশ্বর, সকল কার্য্যই চিরপ্রচলিত, অলঙ্ঘ্য নিয়মের দ্বারা সম্পন্ন করেন, নিয়মবিরুদ্ধ কোন কার্য্য করেন না। জীব হইতে জীবের জন্ম এই নিয়ম; তবে বিনা জীবে জীব হইল কি প্রকারে?"

উল্কাপিণ্ড যে বিনষ্ট গ্রহের ভগ্নাংশ, এই কথা মনে করিয়া, সর উইলিয়ম টম্‌সন প্রাগুক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। তিনি কহেন

যে, "অনেক উল্কাপিণ্ড বীজবাহী। অন্য গ্রহ হইতে বীজ আনিয়া এই পৃথিবীতে বপন করিয়াছে।"

তিনি বলিয়াছেন, "পৃথিবীতে জীবের সৃষ্টি হইল কি প্রকারে? পৃথিবীর ভূতপূর্ব্ব বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিতে২ প্রকাশ পায় যে, এককালে পৃথিবী অগ্নি-দ্রব, তাপ-লোহিত গোলকমাত্র ছিল, তদুপরি জীবের অধিষ্ঠান সম্ভবে না। অতএব যখন পৃথিবী প্রথমে জীবাধিষ্ঠান-যোগ্য হইল, তখন তদুপরি যে কোন জীব ছিল না, ইহা নিশ্চিত। তখন পর্ব্বত, জল, বায়ু ইত্যাদি ছিল; সূর্য্য তা-বৎকে সন্তপ্ত এবং আলোকোজ্জ্বল করিতেন, তখন পৃথিবী উদ্যানবৎ হইবার উপযুক্ত হই-য়াছিল। তখন কি, কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞা পাইয়া, আপনা হইতে বৃক্ষ, পুষ্প, তৃণাদি,

একবারে পূর্ণ শোভা ধারণ করিয়া উঠিয়াছিল? না, উপ্ত বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষাদি ক্রমে পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়াছিল?”

এই প্রশ্নের উত্তরে সর উইলিয়ম, আগ্নেয় পর্ব্বতের উদাহরণ দিয়া বলিয়াছেন যে, “বিসিউবিয়স বা এট্‌না পর্ব্বত নিঃসৃত অগ্নি-দ্রব পদার্থের স্রোত তৎসানুবাহী হইয়া না-মিলে, অচিরাৎ তাহা শীতল হইয়া জমিয়া যায়। কতিপয় সপ্তাহ বা বৎসর পরে, অন্য স্থান হইতে বায়ু্বাদি-বাহিত ডিম্ব এবং বীজের কারণ, অথবা অন্য স্থান হইতে স্বয়মাগত জীবের প্রসাদে, তাহা বৃক্ষ জীবাদিতে পরি-পূরিত হয়। যখন আমরা দেখি যে, সমুদ্র-মধ্যে অগ্নিবিপ্লবসমুৎপন্ন কোন দ্বীপ কতিপয় বর্ষমধ্যে বৃক্ষাদিতে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, তখন তাহা যে বায়ুবাহিত, বা জলচর জীবাদি দ্বারা

আনীত বীজ হইতে ঐরূপ হইয়াছে, এপ্রকার সিদ্ধান্ত করিতে পরাঙ্মুখ হই না।”

তিনি বলেন যে, পৃথিবীতে সেইরূপ জীব-সর্গ। আকাশে, লক্ষ২ সূর্য্য, গ্রহ, উপ-গ্রহাদি অনবরত বিচরণ করিতেছে। যদি সমুদ্রমধ্যে লক্ষ২ জাহাজ, সহস্র বৎসর বিনা নাবিকে বিচরণ করে, তবে অবশ্য মধ্যে২ জাহাজে২ আঘাত হইবে। আকাশ সমুদ্রেও তদ্রূপ, পৃথিবীতে পৃথিবীতে কখন অবশ্য প্রহত হইবে। হইলে, তৎক্ষণাৎ প্রঘাত-জনিত তাপে প্রহত গ্রহাদির অধিকাংশ দ্রব হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু কোন২ ভাগ দ্রবীভূত না হইয়া উল্কাপিণ্ড ভাবে, আকাশপথে বিচ-রণ করিবে। ভগ্ন গ্রহে যেসকল ডিম্ব, জীব ও বৃক্ষাদি ছিল, তাহার কিছু না কিছু বীজ, গ্রহখণ্ডে অবশ্য থাকিবে। কালে তদ্রূপ

কোন সজীব গ্রহাংশ উল্কাপিণ্ড স্বরূপে পৃথিবীতলে পতিত হইয়া, তদ্বাহিত বীজে পৃথিবীকে প্রথমে উদ্ভিজপূর্ণা, পরে জীবময়ী করিয়াছে।

এই মত, অন্যান্য পণ্ডিতের নিকট অদ্যাপি গ্রাহ্য হয় নাই, এবং তাহার প্রতিবাদ করিবার বিশেষ কারণ আছে। ভাল, ইহার যাথার্থ্য স্বীকার করা যাউক। তাহা হইলে কি হইল? জীবসৃষ্টির ত কিছুই বুঝা গেল না। বুঝিলাম, এই পৃথিবী, অন্য গ্রহপ্রেরিত বীজে, উদ্ভিদ্ ও জীবাদি সৃষ্টিবিশিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সে গ্রহেই বা প্রথম বীজ কোথা হইতে আসিল? আবার বলিবেন, "অন্য গ্রহ হইতে।" আমরাও আবার জিজ্ঞাসা করিব, সেই গ্রহেই বা বীজ আসিল কোথা হইতে? এইরূপ পারম্পর্য্যের আদি নাই।

প্রথম বীজোৎপত্তির কথা যে অন্ধকারে ছিল, সেই অন্ধকারেই রহিল।